সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

নির্বাচিত রচনাবলী
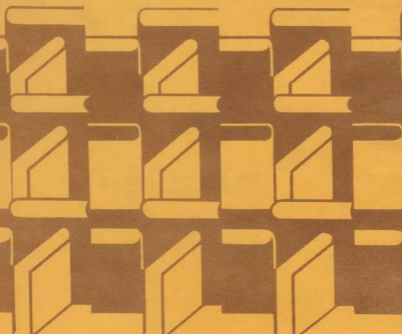
নির্বাচিত রচনাবলী

৩য় খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদঃ মোহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা- চট্টগ্রাম- খুলনা

প্রকাশনায়ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন, ঢাকা- ১১০০
ফোনঃ ২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ১৮০

১ম প্রকাশ
যিলহজ্জ ১৪১২
জৈষ্ঠ ১৩৯৯
মে ১৯৯২

বিনিময়ঃ ১১০.০০ টাকা

মূদ্রনেঃ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تفہیمات এর বাংলা অনুবাদ
NIRBACHITO RACHONABALI By Sayiid Abul A`la Maududi Published by Adhunik prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25, Shiridhdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: Taka 110.00 only

আমাদের কথা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সবাই তাঁর এ পরিচয় জানে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পূনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুমুখী। তবে আমি বলবো, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর লেখা। তাঁর চিন্তার ধারার লিখিত রূপ। তাঁর লিখিত কুরআনের তাফসীর তাফহীমুল কুরআন আজ বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি যুবক যুবতীর দৈনন্দিনকার পাঠ্য বই। বস্তুত, তাঁর সমস্ত লেখাই জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্র ফল্গুধারা। তাঁর লেখা পড়ে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ যুবকের ঘুম উঠে গেছে।

তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম 'তাফহীমাত'। এর অর্থ, বুঝিয়ে দে া বা বুঝে নেয়ার বিষয়। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যুক্তি প্রমাণের নিখাঁদ শৈলীতে লেখা কতিপয় প্রবন্ধ নিবন্ধের সংকলণ তাঁর এ গ্রন্থ। গ্রন্থটি চমৎকার রচনা শৈলীতে মনোজ্ঞ। ভাবের সম্মোহনে গতিমান। যেন জ্ঞানের চৌমোহনা। জ্ঞান পিপাসুর সুশীতল পানীয়। এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়টি নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন, সে বিষয়েই জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা নিবারণ করার মতো করে লিখেছেন। তা পড়ে নেবার পর মন প্রশান্তি লাভ করে।

গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১ম খন্ডটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়ে 'মওদূদী রচনাবলী' নামে প্রকাশ হয়েছিল। অনেকেই এ নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আসলে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা কষ্টকর। তাই, আমরা এখন ভেবেচিন্তে গ্রন্থটির নাম রাখলাম 'নির্বাচিত রচনাবলী'।

গ্রন্থটি দ্বারা চিন্তাশীল মহল উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

ইসলামী আইন প্রণয়নের সীমা ও উৎস

ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র এবং তাতে ইজতিহাদের গুরুত্ব

ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র কতটুকু এবং তাতে ইজতিহাদের কতটা গুরুত্ব আছে তা অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টির সামনে দুটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকারঃ এক, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও দুই, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

ইসলামে সার্বভৌমত্ব নির্ভেজালভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য স্বীকৃত। কুরআন মজীদ তৌহীদের আকীদার যে বিশ্লেষণ করেছে তার আলোকে এক এবং অদ্বিতীয় লা শরীক আল্লাহ কেবল ধর্মীয় অর্থেই মা'বুদ নন, বরং রাজনৈতিক এবং আইনগত অর্থের দিক থেকেও তিনি একচ্ছত্র অধিপতি, আদেশ–নিষেধের অধিকারী এবং আইন প্রণয়নকারী। আল্লাহ তাআলার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) কুরআন এতটা পরিষ্কারভাবে এবং এতটা জোরের সাথে পেশ করে—যতটা জোরের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে তাঁর ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের আকীদা পেশ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র এদুটি মর্যাদা তাঁর উলূহিয়াতের (খোদায়ী) অবশ্যম্ভাবী ফল। এর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এর কোন একটিকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র উলূহিয়াতকে অস্বীকার করা। তাছাড়া ইসলাম এরূপ সন্দেহ করারও কোন অবকাশ রাখেনি যে, খোদায়ী কানুন বলতে হয়ত প্রাকৃতিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে তার সার্বিক দাওয়াতের ভিত্তি যে, মানুষ তার নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আল্লাহ্‌র সেই শরঈ আইন স্বীকার করে নেবে যা তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই শরঈ আইন মেনে নেয়া এবং এর সামনে নিজের স্বাধীন

লেখক এই প্রবন্ধটি ১৯৫৮ সালের ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে পাঠ করেন।

সত্তাকে বিলিয়ে দেয়ার নাম তিনি ইসলাম (Surrender) রেখেছেন এবং যেসব ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সঃ) করে দিয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে মানুষের ফয়সালা করার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُّبِينًا - (الاحزاب - ٣٦)

"আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোন ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন তখন কোন মুমিন পুরুষ বা কোন মুমিন স্ত্রীলোকের নিজেদের সেই ব্যাপারে ভিন্নরূপ সফয়সালা করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হল।"

–(সূরা আহযাবঃ ৩৬)

নবুওয়াতে মুহাম্মাদী

আল্লাহ্র একত্ববাদের মত দ্বিতীয় যে জিনিসটি ইসলামে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী তা হচ্ছে–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী। মূলত এই সেই জিনিস যার বদৌলতে আল্লাহ্র একত্ববাদের আকীদা শুধু কল্পনা বিলাসের পরিবর্তে একটি বাস্তব ব্যবস্থার রূপ লাভ করে এবং এর উপরই ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে। এই আকীদার আলোকে আল্লাহ তাআলার সমস্ত পূর্ববর্তী নবীদের আনীত শিক্ষা অনেক পরিবর্ধন সহকারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া শিক্ষার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এজন্য খোদায়ী হিদায়াত এবং শরীআতের স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য উৎস এখন কেবল এই একটিই এবং ভবিষ্যতেও এমন আর কোন হেদায়াত এবং শরীআতের আগমন ঘটবে না—যে দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন করা জরুরী হতে পারে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন (Supreme Law) যা মহান বিচারক আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিধান আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুই আকারে পেয়েছি। এক, কুরআন মজীদ, যা অক্ষরে অক্ষরে মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র নির্দেশ এবং হেদায়াতের সমষ্টি। দুই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শ অথবা তাঁর সুন্নাত, যা কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আল্লাহ্‌র বাণীর ধারকই ছিলেন না যে, কিতাব পৌঁছে দেয়া ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ ছিল না। তিনি তাঁর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইনদাতা এবং শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল এই যে, তিনি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করবেন, তার সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন, এই উদ্দেশ্য মুতাবিক লোকদের প্রশিক্ষণ দেবেন, অতপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরকে একটি সুসংগঠিত জামায়াতের রূপ দিয়ে সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করবেন, অতপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের রূপ দান করে দেখিয়ে দেবেন যে, ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ সভ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা কিভাবে কায়েম হতে পারে। রসূলুল্লাহ (স) এই গোটা কাজ যা তিনি নিজের তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন—সেই সুন্নাত যা কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে মহান আইন দাতার উচ্চতর আইনকে বাস্তবে রূপদান ও পরিপূর্ণ করে। ইসলামের পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নাম হচ্ছে শরীআত।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র

স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এই মৌলিক সত্যকে শুনার পর ধারণা করতে পারে যে, এই অবস্থায় কোন ইসলামী রাষ্ট্রে মানবীয় আইন প্রণয়ন করার মোটেই কোন সুযোগ নেই। কেননা এখানে তো আইনদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। আর মুসলমানদের কাজ হচ্ছে কেবল নবীর মাধ্যমে দেয়া আল্লাহ্‌র এই আইনের আনুগত্য করে যাওয়া। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, ইসলাম মানুষের আইন প্রণয়নকে চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ করে দেয় না, বরং তাকে আল্লাহ্‌র আইনের প্রাধান্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেয়। এই সর্বোচ্চ আইনের অধীনে এবং তার প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যে মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র কি তা আমি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

আইনের ব্যাখ্যা

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে এক ধরনের বিষয় এমন রয়েছে যে সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নাত কোন সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, অথবা কোন বিশেষ মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন ফকীহ, কোন কাযী (বিচারক) অথবা কোন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা শরীআতের দেয়া নির্দেশ অথবা তার নির্ধারিত

মূলনীতি পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর মধ্যে আইন প্রণয়নের কোন সুযোগই নেই। এসব ব্যাপারে মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র হচ্ছে এই যে, প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হবে আসলে নির্দেশটি কি? অতপর তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন্ অবস্থা ও ঘটনার জন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। অতপর বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উপর এই নির্দেশ প্রয়োগের পন্থা এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশের আনুসংগিক ব্যাখ্যা করতে হবে। সাথে সাথে এও নির্ধারণ করতে হবে যে, ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এসব নির্দেশ ও মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ কোথায় এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত রয়েছে।

কিয়াস

দ্বিতীয় প্রকারের বিষয় হচ্ছে—যে সম্পর্কে শরীআত সরাসরি কোন নির্দেশ দেয়নি, কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীআত একটি নির্দেশ দান করে। এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজ এভাবে হবে যে, নির্দেশের কারণসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষেই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবে সেখানে এই নির্দেশ জারী করতে হবে এবং যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবে না সেগুলোকে এ থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে।

ইস্তিম্বাত (বিধান নির্গতকরণ)

এমন এক প্রকারের বিষয়ও রয়েছে যেখানে শরীআতের নির্দিষ্ট কোন হুকুম নেই, বরং কতিপয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি দান করা হয়েছে। অথবা শরীআতদাতা এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, কোন্ জিনিস পছন্দনীয় যার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন এবং কোন্ জিনিস অপছন্দনীয়—যার বিলুপ্তি হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে এই যে, শরীআতের এই মূলনীতিসমূহ ও শরীআতদাতার এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে হবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য এমন আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে যার ভিত্তি এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শরীআতদাতার উদ্দেশ্যও পূর্ণ করবে।

স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে শরীআত সম্পূর্ণ নীরব, এ সম্পর্কে সরাসরি কোন হুকুমও দেয় না এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীআতে এমন কোন নির্দেশও পাওয়া যায় না যার উপর এটাকে কিয়াস করা যেতে পারে। এই নীরবতা স্বয়ং একথার প্রমাণ বহন করে যে, মহান আইনদাতা আল্লাহ এ ক্ষেত্রে মানুষকে নিজের রায় প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিচ্ছেন। এজন্য এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের কাজ এমনভাবে হতে হবে যেন তা ইসলামের প্রাণশক্তি এবং তার সাধারণ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তার মেজাজ-প্রকৃতি ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতির বিপরীত না হয় এবং তা যেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংস্থাপিত হতে পারে।

ইজতিহাদ (গবেষণা)

আইন প্রণয়নের এসব কাজ—যা ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখে এবং যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে তার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে—এক বিশেষ ইলমী, তাহকীক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ইসলামের পরিভাষায় একে বলে ইজতিহাদ। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "কোন কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।" কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে-"আলোচ্য কোন বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ অথবা তার উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।" কোন কোন লোক ভ্রান্তির শিকার হয়ে 'মতের সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যবহারকে' ইজতিহাদের অর্থের মধ্যে গণ্য করে থাকে। ইসলামী আইনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত এমন কোন ব্যক্তি এই ভুল ধারণায় পতিত হতে পারে না যে, এই ধরনের একটি আইন ব্যবস্থায় স্বাধীন ইজতিহাদের কোন অবকাশ থাকতে পারে। এখানে তো আইনের উৎস হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। মানুষ যে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা অপরিহার্যরূপে—হয় আইনের উৎস থেকে গৃহীত হতে হবে অথবা যে সীমা পর্যন্ত সে স্বাধীন মত প্রয়োগের সুযোগ দেয় তা সেই সীমার মধ্যে প্রণীত হতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে যে ইজতিহাদ করা হবে তা না ইসলামী ইজতিহাদ আর না ইসলামী আইন ব্যবস্থায় তার কোন স্থান আছে।

ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী

ইজতিহাদের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনকে মানব রচিত আইনের দ্বারা পরিবর্তন করা নয়, বরং তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে যুগের গতির সাথে গতিশীল করে তোলা—এজন্য আমাদের আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী বর্তমান না থাকলে কোন সঠিক এবং সুস্থ ইজতিহাদ হতে পারে নাঃ

১. আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআতের উপর ঈমান, তা সত্য হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, তা অনুসরণ করার একনিষ্ঠ সংকল্প, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার খায়েশ না থাকা এবং উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও মূল্যবোধ অন্য কোন উৎস থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআত থেকে গ্রহণ করা।

২. আরবী ভাষা, তার ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কেননা কুরআন এই ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং সুন্নাতকে জানার উপকরণও এই ভাষার মধ্যেই রয়েছে।

৩. কুরআন ও সুন্নাতের (হাদীস) জ্ঞান–যার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু আনুসঙ্গিক নির্দেশ এবং তার প্রয়োগস্থান সম্পর্কেই অবহিত হবে না বরং শরীআতের মূলনীতি এবং তার উদ্দেশ্যসমূহও ভালভাবে হৃদয়ংগম করবে। তাকে একদিকে জানতে হবে যে, মানব জীবনের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য শরীআতের সামগ্রিক পরিকল্পনা কি এবং অন্যদিকে জানতে হবে যে, এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় জীবনের প্রতিটি বিভাগের মর্যাদা কি, শরীআত তার গঠন কোন্ কাঠামোয় করতে চায় এবং তার গঠনে তার সামনে কি কল্যাণ রয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, ইজতিহাদের জন্য কুরআন ও হাদীসের এমন জ্ঞান দরকার যা শরীআতের মূলে পৌছে যায়।

৪. উম্মতের পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ইজতিহাদের প্রশিক্ষণের জন্যই শুধু এর প্রয়োজন নয়, বরং আইনগত বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যও প্রয়োজন। ইজতিহাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় এবং এই হওয়াও উচিত নয় যে, প্রতিটি উত্তরসূরী (generation) পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া নির্মাণ কাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে অথবা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ শুরু করবে।

৫. বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কেননা এগুলোর উপরেই শরীআতের নির্দেশ ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

৬. ইসলামী নৈতিকতার মানদন্ড অনুযায়ী উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে। কেননা তা ছাড়া কারো ইজতিহাদ জনগণের কাছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য গণ্য হতে পারে না। চরিত্রহীন লোকের ইজতিহাদের মাধ্যমে যে আইন রচিত হয় তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হতে পারে না।

এসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রত্যেক ইজতিহাদ-কারীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য কেবল এই কথা প্রকাশ করা যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ যদি সঠিক কাঠামোর উপর হতে হয় তাহলে তা কেবল সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন আইনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আলেম তৈরী করতে পারে। এছাড়া যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা ইসলামী আইন ব্যবস্থার মধ্যে নিজের স্থানও করে নিতে পারবে না এবং মুসলিম সমাজও তা একটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে হজম করতে পারবে না।

ইজতিহাদের সঠিক পন্থা

ইজতিহাদ এবং তার ভিত্তিতে প্রণীতব্য আইন গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি যেভাবে ইজতিহাদকারীর যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল অনুরূপভাবে এই ইজতিহাদ সঠিক পন্থায় হওয়ার উপরও নির্ভরশীল। মুজতাহিদ চাই আইনের ব্যাখ্যা দান করুন অথবা কিয়াস ও ইস্তিম্বাত করুন অবশ্যই তাকে নিজের যুক্তির ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর রাখতে হবে। বরং জায়েয কাজ (মুবাহ)-সমূহের আওতায় স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে গিয়েও তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাত বাস্তবিকপক্ষেই অমুক ব্যাপারে কোন নির্দেশ অথবা মূলনীতি নির্ধারণ করেনি এবং কিয়াসের জন্যও কোন ভিত্তি সরবরাহ করেনি। অতপর কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে প্রমাণ পেশ করা হবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ আলেমদের স্বীকৃত পন্থায় হতে হবে। কুরআন থেকে প্রমাণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন আয়াতের এমন অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন-আরবী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ এবং প্রচলিত ব্যবহারে যেরূপ অর্থ করার সুযোগ রয়েছে। এই অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাক্যের পূর্বাপরের সাথে মিল থাকতে হবে, একই বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে তা সংঘর্ষপূর্ণ হবে না, এবং সুন্নাতের মৌখিক অথবা বাস্তব ব্যাখ্যায় তার সমর্থন বর্তমান থাকতে হবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সুন্নাত এই অর্থের বিরোধী হবে না।

সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভাষা এবং তার ব্যাকরণ ও পূর্বাপরের দিকে লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, যেসব রিওয়ায়াত থেকে কোন বিষয়ের সমর্থন বা প্রমাণ গ্রহণ করা হচ্ছে তা ইলমে উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হতে হবে, এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসও দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং কোন একটি হাদীস থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত বের করা যাবে না যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাতের পরপন্থী হতে পারে।

এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রেখে পছন্দসই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ইজতিহাদ করা হবে, তাকে যদি শক্তিবলে আইনের মর্যাদা দেয়াও হয় তাহলে মুসলমানদের সামগ্রিক বিবেক তা কবুল করতে পারে না। আর তা বাস্তবে ইসলামী আইন ব্যবস্থার অংশও হতে পারে না। যে রাজনৈতিক শক্তি তা কার্যকর করবে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে এই আইনও আবর্জনার পাত্রে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইজতিহাদ কিভাবে আইনের মর্যাদা লাভ করে

কোন ইজতিহাদের আইনের মর্যাদা লাভ করার ব্যাপারে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিভিন্ন পন্থা দেখা যায়ঃ

একঃ এর উপর গোটা উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ইজমা।

দুইঃ কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদ যদি সাধারণে গৃহীত হয়ে যায় এবং লোকেরা নিজে থেকেই তা অনুসরণ করতে শুরু করে। যেমন হানাফী, শাফিঈ, মালিকী এবং হাম্বলী ফিকাহকে মুসলমানদের বিরাট বিরাট জনসমষ্টি ও জনপদ আইন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তিনঃ কোনো ইজতিহাদকে কোনো মুসলিম সরকার নিজের আইন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন তুর্কী উসমানী রাজত্ব এবং ভারতের মোগল রাজত্ব হানাফী ফিকাহকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

চারঃ রাষ্ট্রের অধীনে একটি সংস্থা সাংবিধানিক মর্যাদাবলে আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করল এবং তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন আইন প্রণয়ন করল।

এসব পন্থা ছাড়া বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ আলেম যেসব ইজতিহাদ করে থাকেন তার মর্যাদা ফতোয়ার অধিক নয়। এখন থাকল কাযীদের (ইসলামী রাষ্ট্রের

বিচারক) সিদ্ধান্ত। তা ঐসব বিশেষ মোকদ্দমায় তো অবশ্যই আইন হিসাবে প্রযোজ্য হয় যেসব মামলায় ঐ সিদ্ধান্ত কোন আদালত করেছে। এগুলো কোর্টের নযীর হিসাবেও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সার্বিক অর্থে তা আইন নয়। এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীন কাযী হিসাবে যেসব ফয়সালা করেছেন তাও ইসলামে আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় কাযীদের প্রণীত আইনের (Judge Made Law) কোন ধারণা বর্তমান নেই-(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮)।

জনৈক হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীর অভিযোগ ও তার জবাব

ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদের বিষয় সম্পর্কিত আমার প্রবন্ধের উপর যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, আমি এখানে অতি সংক্ষেপে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।

কুরআনের সাথে সুন্নাতের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, প্রথম প্রশ্ন তার উপর উত্থাপন করা হয়েছে। এর জবাবে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী আমি কয়েকটি কথা বলব যাতে বিষয়টি আপনাদের সামনে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. এটা এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শুধু কুরআন পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং একটি ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতেই একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির এক নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এসব কাজ যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন—তা শেষ পর্যন্ত কি হিসাবে করেছেন? এসব কাজ কি নবীর কাজ হিসাবে সম্পাদিত হয়েছিল যার মধ্যে তিনি আল্লাহুর মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন—যেমনটি কুরআন আল্লাহুর মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করছে? অথবা তাঁর নবুওয়াতী মর্যাদা কি কুরআন শুনিয়ে দেয়ার পর শেষ হয়ে যেত এবং এরপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মত শুধু একজন মুসলমান হিসাবে থেকে যেতেন, যার কথা ও কাজ নিজের মধ্যে কোন আইনের সনদ ও দলীলের মর্যাদা রাখত না? যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয় তাহলে সুন্নাতকে কুরআনের সাথে আইনের সনদ ও দলীল হিসাবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

১৯৫৮ সালের ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পাঠের পর জনৈক মুনকিরে হাদীস (হাদীস প্রত্যাখ্যাকারী) উঠে দাঁড়িয়ে তার উপর কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ঐ মজলিসেই প্রবন্ধকারের পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়।

২. কুরআন সম্পর্কে যতদূর বলা যায় এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল পত্রবাহক ছিলেন না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা পথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন, যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল এবং যাঁর জীবনকে সমগ্র ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নমুনা হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বুদ্ধিবিবেক সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, তা এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, একজন নবী কেবল খোদার কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত তো নবী থাকবেন, কিন্তু এরপর তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র রয়ে যাবেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যতদূর বলা যায় তারা ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে এবং গোটা দুনিয়ায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ, তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে আসছে। এমনকি কোন অমুসলিম পণ্ডিতও এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারে না যে, মুসলমানরা সব সময় তাঁর এই মর্যাদা স্বীকার করে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় সুন্নাতকে কুরআনের সাথে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে।

এখন আমি জানি না, কোনব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদা কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে না বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং একাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে তাঁর নবুওয়াতী মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। অনন্তর সে যদি এরূপ দাবী করেও তাহলে তাকে বলতে হবে, রসূলুল্লাহ (স)-কে এই ধরনের মর্যাদা সে নিজেই দিচ্ছে না কুরআন তাঁকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়েছে? প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে তার কথার কোন সম্পর্ক নেই এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে কুরআন থেকে তার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

৩. সুন্নাতকে স্বয়ং আইনের একটি উৎস হিসাবে মেনে নেয়ার পর এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর জবাবে বলতে চাই, আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই প্রথম বারের মত আমরা এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যে নবুওয়াতের আবির্ভাব হয়েছিল তা কি সুন্নাত রেখে গেছে? দুটি ঐতিহাসিক সত্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

একঃ কুরআনের শিক্ষা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর যে সমাজ ইসলামের সূচনার প্রথম দিন কায়েম হয়েছিল, তা সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিরত জীবন্ত রয়েছে, তার জীবনে একটি দিনেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এবং তার সমস্ত বিভাগ ও সংস্থা এই পুরা সময়ে উপর্যুপরি কাজ করে আসছে। আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, চরিত্র-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইবাদত ও মুআমালাত, জীবন পদ্ধতি এবং জীবন পন্থার দিক থেকে যে গভীর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, যার মধ্যে মতভেদের উপাদানের চাইতে ঐক্যের উপাদান অধিক পরিমাণে বর্তমান রয়েছে, যা তাদেরকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত রাখার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি কারণ--এগুলোই এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, এই সমাজকে কোন একটি সুন্নাতের উপরই কায়েম করা হয়েছিল এবং সেই সুন্নাত শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘতায় অবিরতভাবে জারী রয়েছে। এটা কোন হারানো জিনিস নয় যা অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে।

দুইঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগে মুসলমানরা এটা জানার জন্য অবিরত চেষ্টা করতে থাকে যে, প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুন্নাত কি এবং নতুন কোন জিনিস তাদের জীবন ব্যবস্থায় কোন কৃত্রিম পন্থায় অনুপ্রবেশ করছে কিনা। সুন্নাত যেহেতু তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখত, এর ভিত্তিতে তাদের বিচারালয়সমূহে সিদ্ধান্ত নেয়া হত এবং তাদের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্তকার ব্যবস্থা পরিচালিত হত, এজন্য তারা এর তথ্যানুসন্ধানে বেপরোয়া ও নির্ভীক হতে পারে না। এই অনুসন্ধানের উপায় এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রথম খিলাফতের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছি এবং কোন বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রতিটি জেনারেশনের অবদান সংরক্ষিত আছে।

এই দুটি সত্যকে যদি কোন ব্যক্তি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নেয় এবং সুন্নাতকে জানার উপায় ও মাধ্যমগুলো রীতিমত অধ্যয়ন করে তাহলে সে কখনো এই সন্দেহের শিকার হতে পারে না যে, এটা কোন সমাধানের অযোগ্য ধাঁ ধাঁ তারা যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

৪. সুন্নাতের অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিসন্দেহে অনেক মতবিরোধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু এরূপ মতবিরোধ কুরআনের অসংখ্য নির্দেশ ও বাণীর অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও হয়েছে এবং হতে পারে। এসব মতবিরোধ যদি কুরআনকে পরিত্যাগ করার

জন্য দলীল হতে না পারে তাহলে সুন্নাত পরিত্যাগ করার জন্য এই মতবিরোধকে কিভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এই মূলনীতি পূর্বেও মান্য করা হয়েছে এবং আজো তা না মেনে কোন উপায় নেই যে, যে ব্যক্তিই কোন নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশ অথবা সুন্নাতের নির্দেশ বলে দাবী করবে তাকে নিজের এই কথার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তার কথা যদি বলিষ্ঠ হয় তাহলে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের দ্বারা অথবা অন্ততপক্ষে তাদের কোন বিরাট অংশের দ্বারা নিজের মতকে গ্রহণযোগ্য করিয়ে নেবে। আর যে কথা প্রমাণের দিক থেকে দুর্বল হবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সেই মূলনীতি যার ভিত্তিতে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমান কোন একটি ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাবে সম্মিলিত হয়েছে এবং তাদের বিরাট বিরাট জনবসতি কুরআনী নির্দেশের কোন ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের কোন সমষ্টির উপর নিজেদের সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

আমার প্রবন্ধের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হচ্ছে এই যে, আমার বক্তব্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। অর্থাৎ আমার এ বক্তব্যঃ "কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার কারো নেই।" প্রশ্নকারীর মতে আমার এই বক্তব্য আমার নিম্নোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিকঃ "ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও ঘটনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশসমূহ থেকে সরে গিয়ে কাজ করার অবকাশ এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে তার প্রয়োগস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।" আমি বুঝতে পারছি না এর মধ্যে কি বৈপরিত্য অনুভব করা হয়েছে। একান্ত উপায়ান্তরহীন পরিস্থিতিতে সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দুনিয়ার প্রতিটি আইনে রয়েছে। কুরআনেও এধরনের অনুমতির অনেক দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে। এই দৃষ্টান্তসমূহ থেকে ফিকাহবিদগণ সেই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যাকে অনুমতির সীমা ও তার প্রয়োগস্থান নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমনঃ

الضرورات تبیح المحظورات اور المشقۃ تجلب التیسیر-

তৃতীয় প্রশ্ন সেই সব লোকদের সম্পর্কে করা হয়েছে যারা এখানে নিজেদের প্রবন্ধসমূহে ইজতিহাদের কতিপয় শর্ত বর্ণনা করেছেন। আমিও যেহেতু তাদের মধ্যে একজন, তাই এর জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমারও রয়েছে। আমি আবেদন করব, অনুগ্রহপূর্বক আর একবার আমার বর্ণনাকৃত শর্তগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। অতপর বলুন, আপনি এর মধ্যকার কোন্ শর্তটি বাদ

দিতে চান। এই শর্তটি কি, ইজতিহাদকারীদের মধ্যে শরীআতকে অনুসরণ করায় একনিষ্ঠ ইচ্ছা থাকতে হবে এবং তারা এর সীমা লংঘন করার খাহেশমান্দ হবেন না? অথবা এই শর্তটি কি, তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা অর্থাৎ আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে? অথবা এই শর্তটি, তাদেরকে অন্তত কুরআন ও সুন্নাত এই পরিমাণ অধ্যয়ন করতে হবে যাতে তারা শরীআতের ব্যবস্থা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়? অথবা পূর্বেকার মুজতাহিদদের কৃত কাজের উপরও তাদের দৃষ্টি থাকতে হবে? অথবা তাদের দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে? অথবা তারা দুশ্চরিত্র এবং ইসলামের নৈতিক মানদণ্ড থেকে নীচে অবস্থান করবেন না?

এসব শর্তের মধ্যে যেটিকে আপনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তা চিহ্নিত করে দিন। একথা বলা যে, গোটা ইসলামী দুনিয়ায় দশ–বারজনের অধিক এমন লোক পাওয়া যাবে না, যারা এই শর্তের মানদণ্ডে উৎরে যেতে পারে—আমার মতে দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের সম্পর্কে এটা অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য। খুব সম্ভব আজ পর্যন্ত আমাদের বিরোধীরাও আমাদেরকে এতটা পতিত মনে করেনি যে, চল্লিশ–পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা দশ বারজনের অধিক হবে না। তদুপরি আপনি যদি ইজতিহাদের দরজা পণ্ডিত–মূর্খ নির্বিশেষে সবার জন্য খুলে দিতে চান তাহলে আনন্দের সাথে খুলে দিন। কিন্তু আমাকে বলুন দুশ্চরিত্র, জ্ঞানহীন এবং সংশয়পূর্ণ উদ্দেশ্যনিষ্ঠ সম্পন্ন লোকেরা যে ইজতিহাদ করবে তাকে আপনি কিভাবে মুসলিম জনতার কণ্ঠনালীর নীচে নামাবেন?

(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮)

ইজতিহাদ প্রসংগে কতিপয় সন্দেহ

[১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়ই ছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়াকালীন সময়ে এবং তার পরে এসব ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে অনবরত মেলামেশা করতে থাকেন এবং একে অপরকে নিজের দৃষ্টিভংগী ও কর্মপন্থা বুঝতে এবং বুঝাতে চেষ্টা করেন। এই সময় অনেক বিদেশী চিন্তাবিদ প্রবন্ধকারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সময় সময় তাঁর দফতরে এসে হাযির হতেন। উইলফার্ড ক্যান্টওয়েল স্মীথ তাদের অন্যতম। তার নাম এবং অবদান সম্পর্কে আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ ভালভাবেই অবহিত। তিনি প্রথমে আলীগড় কলেজে ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অতপর লাহোর এফ. সি. কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। বর্তমানে তিনি কানাডার সুবিখ্যাত ম্যাকগীল (Mcgill) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের প্রধান। নিম্নের পত্রটি প্রবন্ধকারের সাথে স্মীথ সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের স্মরণিকা। মূল পত্রটি ইংরেজীতে ছিল। এখানে তার অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।]

স্মীথ সাহেবের চিঠি

মাখদূমী,

তাসলীম ও আদাব। এটা কেবল আপনার অনুগ্রহ যে, গত সপ্তায় আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি এই পূর্ণাংগ আলোচনা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা উঠিয়েছি। আপনার সাথে স্বশরীরে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—এজন্য আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দিত। এই সুযোগে আমি অতি নিকট থেকে আপনার চিন্তার ধরন ও যুক্তিপদ্ধতি হৃদয়ংগম করতে পেরেছি। আপনার লিখিত বই-পুস্তক পাঠ করে হয়ত এতটা ফায়দা অর্জন করা সম্ভব হত না।

আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে আপনি যেহেতু ওয়াদা করেছিলেন যে, আপনি আমাকে ইসলাম এবং এ সম্পর্কে আপনার পেশকৃত ব্যাখ্যা হৃদয়ংগম করতে সাহায্য করবেন, এজন্য আপনার কাছে কয়েকটি অনুগ্রহ দাবী করার দুঃসাহস দেখাচ্ছি। যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে ইজতিহাদ সম্পর্কে সম্মেলনে পেশকৃত আপনার প্রবন্ধের উর্দূ ও আরবী অনুবাদ অনুগহপূর্বক আমাকে পাঠাবেন। আমি এর ইংরেজী অনুবাদটি গভীর দৃষ্টি সহকারে অধ্যয়ন করেছি। আপনি যে পন্থায় আল্লাহর বিধানের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণ করেছেন এবং ইসলামকে এই আইনের সামনে অবনত-মস্তক হিসাবে পেশ করেছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এর দ্বারা আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি। এই দৃষ্টিভংগী এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার অন্তরে এখন স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যে, যেসব আরবী পরিভাষার মধ্যে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করব। প্রবন্ধের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কেও একই কথা। যদি আপনার কাছে এই প্রবন্ধের অতিরিক্ত আরবী ও উর্দূ কপি থেকে থাকে তাহলে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তা অধ্যয়ন করব।

এই প্রসংগে আরো একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। প্রবন্ধের ইংরেজী লিপিতে আপনি আল্লাহর বিধান মান্য এবং তার সামনে স্বাধীন কর্তৃত্বকে বিসর্জন দেয়ার নাম ইসলাম বলেছেন। এর আগে ইসলামের অর্থ নেয়া হয়েছে আল্লাহর সামনে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়া। কিন্তু আপনার মতে এ দুটি জিনিস একই এবং এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমিনারে আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম, তাতে আমি এটাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হিসাবে পেশ করেছি। আমার প্রবন্ধের উর্দূ এবং আরবী অনুবাদকগণ যেহেতু আমার দৃষ্টিভংগী ভালভাবে বুঝতে পারেননি, তাই আমি যা কিছু আরজ করেছি তা কেবল ইংরেজী প্রবন্ধের ভিত্তিতে বলছি। আশা করি এই আলোচনা আমার মনের জটিলতা দূর করে দেবে যা আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় প্রকাশ করেছিলাম। এবং এ ব্যাপারে আমি আরজ করেছিলাম, আমার মতে জামায়াতে ইসলামী লোকদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করানোর পরিবর্তে শুধু ধর্মের বাহ্যিক দিকের প্রতি বেশী জোর দেয়। আপনি এর যে জবাব দিয়েছেন তা আমাকে চিন্তা করার মালমসলা সরবরাহ করেছে এবং চিন্তাভাবনা ও তথ্যানুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে। উপরি আপনি আপনার ছাপানো প্রবন্ধে যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা থেকে পুনরায় এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়—মুসলমানদের ধর্মের আসল প্রাণসত্তা কি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের (অবনত হওয়াঃ ইসলাম) চেয়ে শরীআতের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট?

এখান থেকে আরো একটি প্রশ্ন সামনে এসে যায়। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের সঠিক ধরনটা কেমন হবে? আমার চিন্তার জগতে আপনার এই বক্তব্য শুনে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যে, একজন খৃষ্টানের কাছে শূকরের গোশত খাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার—যার কোন গুরুত্ব নেই। আমি এর তাৎপর্য উত্তমরূপে বুঝতে অক্ষম। আমি একজন খৃষ্টান হিসাবে বিশ্বাস রাখি যে, আমি যদি শূকরের গোশত খেতে চাই তাহলে এ ব্যাপারে আমি স্বাধীন। আমার এ পথে কোন জিনিসই প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি আমি তাই করি তাহলে আমার এই কার্যকলাপের দরুন একজন মুসলমান হিসাবে আপনি কষ্ট পাবেন। কেননা আপনার দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী শরীআত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সামগ্রিক এবং সর্বব্যাপক আইন-বিধান। আল্লাহর আইনের আনুগত্য কি সবার উপর বাধ্যতামূলক নয়? যদিও কেবল মুসলমানরাই তা পূর্ণরূপে সমর্থন করে। যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার এ কাজ আপনার কাছে অমনোপূত ঠেকবে। এমন কোন নৈতিক বিধান আছে কি যা গোটা মানব জাতির উপর কার্যকর হয়? আর এ ছাড়া এমন কিছু মৌলনীতি ও আইন-কানুন আছে কি যার আনুগত্য কেবল মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক?

আমি ধূমপান এবং মদপানে অভ্যস্ত নই। আমার এই কর্মনীতির জন্য আমার মুসলিম বন্ধুরা খুবই আনন্দিত হয় যে, আমি তাদের ধর্মের এ দুটি মূলনীতি মেনে চলি। যদিও আমি তা আমার ব্যক্তিগত আকীদা অনুযায়ী করে থাকি। আমি জীবনভর কখনো ধূমপানও করিনি, আর কখনো শরাব পান করিনি। আমি অনুভব করি যে, খুবই ভাল হত (এবং এটা আল্লাহ্ তাআলারও অধিক প্রিয়) যদি মানুষ শরাব পান না করত। আর এই কথা একজন মুসলমানের জন্য এতটা সঠিক, যতটা খৃষ্টান, হিন্দু অথবা নাস্তিকের জন্য সঠিক। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে অন্য একটি দিকও রয়েছে। একজন শরাবখোর মুসলমান এ কাজের মাধ্যমে কেবল নিজের স্বার্থকেই ধ্বংস করে না, বরং সে নিজের মধ্যে একটি অপরাধী মনোবৃত্তি লালন করে। কেননা সে মদ পান করে এমন একটি অশোভনীয় কাজ করে, যাকে সে নিজের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে হারাম মনে করে।

এখন আপনার কাছে যে সমাধান আশা করছি তা হচ্ছে এই যে, আমি এবং আমার মত অন্যান্য অমুসলিমরা যদি শরীআতের আইনের আনুগত্য করি তাহলে মুসলমান হিসাবে আপনারা কি খুশী হবেন না? যদিও আমি এটা স্বীকার করি যে, অমুসলিম হওয়ার কারণে আমরা শরীআতের আনুগত্য করার

সার্বিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারি না। এ ব্যাপারে আপনার জবাব এই হবে যে, একজন খৃষ্টান হিসাবে আমি খৃষ্টবাদের পেশকৃত আইন-বিধান অনুসরণ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন হিন্দু অথবা একজন নাস্তিক এ ব্যাপারে কি ধরনের কর্মনীতি গ্রহণ করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে কিন্তু বিশ্বস্ত নয়—তার তুলনায় একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার নাস্তিক কি অধিক ভাল (এবং এ কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক পছন্দনীয়) নয়?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনাকে অযথা কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু আমি এই দুঃসাহস কেবল এজন্যই করেছি যে, আমি নিজের গোটা জীবনটাই এই সমস্যাগুলো অনুধাবন করার জন্য ব্যয় করেছি, বিশেষ করে যেসব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে জাতিসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

আপনার অনুগত
ওয়েলফার্ড কেন্টওয়েল স্মীথ

লেখকের জবাব

মুহতারাম মিষ্টার স্মীথ

আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন এজন্য কৃতজ্ঞ। আপনার দাবী মোতাবেক প্রবন্ধের উর্দূ এবং আরবী কপি পাঠালাম। মূল প্রবন্ধ উর্দূ ভাষায় লেখা হয়েছিল, আরবী এবং ইংরেজী কপি তারই তরজমা। আপনি যেহেতু উর্দূ বোঝেন, তাই উর্দূ প্রবন্ধের উপর নির্ভর করাই আপনার জন্য উত্তম। এর সাথে আমি সেইসব নোটও পাঠাচ্ছি যেগুলো আমার প্রবন্ধের সমালোচনার জবাবে সম্মেলনে পেশ করেছিলাম।

ইসলাম ও শরীআতের পারস্পরিক সম্পর্ক

আমার প্রবন্ধ দেখে আপনার মনে ইসলাম সম্পর্কে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে তার জবাব হচ্ছে--ইসলামের অর্থ তো নিশ্চিতই " আল্লাহর আনুগত্য।" কিন্তু এই আনুগত্যের অবশ্যম্ভাবী দাবী হচ্ছে— আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কেননা আল্লাহকে মানা এবং তাঁর আইন-বিধান না মানা—এই বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী (Incompatible)। আমি যে পারম্পর্য অনুযায়ী এই ব্যাপারটির বিশ্লেষণ করেছি আপনি সেই পারম্পর্য অনুযায়ী এই বিষয়টির উপর চিন্তা-ভাবনা করলে সঠিক অবস্থা আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্রমিক ধারা নিম্নরূপঃ

১. কুরআন মজীদ আল্লাহকে কেবল মা'বুদ হিসাবেই স্বীকৃতি দেয় না, বরং আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়।

২. আল্লাহর খোদায়িত্বের এই দুটি অপরিহার্য উপাদান তৌহীদের ধারণার দিক থেকে এতটা অবিভাজ্য যে, এর কোন একটিকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে তা অনিবার্যরূপে আল্লাহর অস্বীকৃতির নামান্তর।

৩. এই আকীদার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তা'আলার যে বিধানের আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে—তা প্রাকৃতিক আইন বিধান নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলদের মাধ্যমে যে আইন-বিধান দান করেছেন তা। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগী এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের রীতিনীতির সংশোধন করা।

৪. কুরআন মজীদের দাওয়াতের ভিত্তিই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা নবীদের মাধ্যমে যে হেদায়াত ও আইন-বিধান নাযিল করেছেন মানুষ তার সামনে মাথা নত করে দেবে এবং নিজের স্বাধীন কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। কুরআনের ভাষায় এই জিনিসেরই নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। অন্য কথায়, যদি কোন ব্যক্তি বলে, 'আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, কিন্তু সে আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের দেয়া হেদায়াত এবং তাদের পৌঁছে দেয়া নির্দেশসমূহের সামনে আত্মসমর্পণ না করে এবং তার সামনে নিজের স্বাধীন কর্তৃত্বের দাবী থেকে হাত গুটিয়ে না নেয় তাহলে কুরআন তাকে 'মুসলিম' বলে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়)।

এই ক্রমিকতা অনুসরণ করে আপনি বিষয়টি হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করুন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন (Does the heart of a Muslim's faith not lie in his relation (Submission, Islam) to God rather than to his relation to the Shariah)[১] —তা মূলত সৃষ্টি হত না। কেননা আল্লাহর কাছে মুসলমানদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি সরাসরি আল্লাহর আইন বিধানের (শরীআত) কাছে আত্মসমর্পণের আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর এটা তার এমন একটি বাস্তবিক দাবী যে, আল্লাহর বিধানের সাথে যদি ইসলামের (আত্মসমর্পণ) সম্পর্ক অটুট না থাকে তাহলে আল্লাহর সাথে ইসলামের (আত্মসমর্পণ) সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকার কোন অর্থই হয় না।

১. মুসলমানদের ধর্মের আসল প্রাণশক্তি আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের তুলনায় শরীআতের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে নিহিত নয় কি?

ইসলামের প্রাণশক্তি সংরক্ষণের জন্য ইসলামের কাঠামোকে সংরক্ষণ করার গুরুত্ব

খৃষ্টানদের শূকরের গোশত ব্যবহার করা সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছিলাম তা ছিল মূলত ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। আমি আপনাদের এটা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, মুসলমানদের জন্য ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে ইসলামের কাঠামোর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন এই কাঠামোকে উপেক্ষা করা বা তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি এই হয়ে থাকে যে, একজন মুসলমান অতপর ইসলামের প্রাণসত্তার সাথেও অপরিচিত হয়ে পড়ে। এই কথাটিকে আমি অনেকগুলো উদাহরণের সাহায্যে আপনাদের বুঝিয়েছিলাম। যেমন কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি নামায আদায় করা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অপরিহার্য পরিণতি এই হবে যে, তার উপর আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে যেসব দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু মুসলমান হওয়ার কারণে তার উপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা হচ্ছে নামায। এজন্য এই ফরযকে জানা এবং মেনে নেয়ার পর যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে তার কাছে কোন অধিকারবোধ বা কর্তব্যবোধ আশা করা যায় না। অনুরূপভাবে ইসলামে যেসব জিনিসকে হারাম এবং কঠিন গুনাহের কাজ ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হারাম এবং গুনাহ বলে জানা সত্ত্বেও যে মুসলমান তাতে লিপ্ত হবে তার কাছ থেকে আপনি কখনো এটা আশা করতে পারেন না যে, সে কোন নৈতিক সীমা লংঘন করবে না অথবা কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এই প্রসংগে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনারা নামায পরিত্যাগকারী অথবা শূকরের গোশত খাওয়া মুসলমানদের নিজেদের উপর অনুমান করে থাকেন এবং এই ধরনের মুসলমানরা আপনাদের কাছাকাছি এসে গেছে বলে তাদের স্বাগত জানিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনারা এই মূল্যায়ন করছেন না যে, তারা কেমন সীমা ছিন্ন করে এবং যেসব মূল্যবোধ (Sanctities) লংঘন করে আপনাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে—তা লংঘন করার ফলে আপনাদের নৈতিক স্তর থেকেও অনেক নীচে পতিত হয়ে গেছে। আপনাদের মতে নামায মূলতই ফরয নয় এবং শূকরের গোশত খাওয়া আপনাদের কাছে একটি মামুলি ব্যাপার। এজন্য আপনারা নামায পরিত্যাগ এবং শুকরের গোশত খাওয়া সত্ত্বেও আপনাদের এখানে স্বীকৃত নৈতিক সীমা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু যে মুসলমান এই কাজ করে সে এতটা সীমা লংঘন করে এবং এতটা পবিত্র মূল্যবোধকে পদদলিত করে আপনাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে

যায়, তার জন্য অতপর দুনিয়াতে অতি কষ্টে খুব কম জিনিসেরই পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকতে পারে যাকে সে নিজের কুপ্রবৃত্তির লালসা অথবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পদদলিত করতে কোনরূপ সংকোচ বোধ করতে পারে। এজন্য আমি আপনার কাছে আরজ করেছিলাম, আপনারা ইসলামী শরীআতের বিরোধীতাকারীদের শক্তি বৃদ্ধি করা পরিত্যাগ করবেন। কেননা মুসলিম সমাজে এটা চরম নৈতিক পতনের প্রদর্শনী এবং কোন মানব সমাজের নৈতিক পতন মূলত সেই সমাজেরই ক্ষতি নয়, বরং গোটা মানব জাতির ক্ষতি।

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস বাধ্যতামূলক করতে পারে

আপনার একথা একান্তই সত্য যে, আমাদের মতে যেহেতু প্রতিটি গুনাহ স্বয়ং একটি পাপকর্ম, তাই আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত যে জিনিসকেই গুনাহ সাব্যস্ত করেছে, কোন মানুষের জীবনেই তার অস্তিত্বকে পছন্দ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ এইরূপ। আমরা আল্লাহ্‌র সামগ্রিক বিধানকে সমগ্র মানবতার জন্য প্রযোজ্য বলে স্বীকার করি এবং যে লোকই তার বিরোধিতা করে আমরা তার জন্য দুঃখ-বেদনা অনুভব করি। তার কাছে গুনাহ একটি সাধারণ ব্যাপার হোক না কেন, কিন্তু আমাদের কাছে তা কোন সাধারণ কথা নয়। অবশ্য যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম নাগরিক থেকে থাকে তাহলে আমরা ইসলামের কোন নির্দেশ মানার জন্য তাদের বাধ্য করার চেষ্টা করব এবং কোন কোন ব্যাপারে তাদের স্বাধীন ছেড়ে দেব। যেমন, আমাদের কাছে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ হচ্ছে শিরক। কিন্তু তাদের আকীদা-বিশ্বাসে যদি শিরকই সঠিক হয় তাহলে আমরা তার প্রতিরোধ করব না। অনুরূপভাবে আমাদের মতে শূকরের গোশত ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু তারা যদি এটাকে হালাল মনে করে তাহলে আমরা তাদেরকে এটা খেতে নিষেধ করব না। পক্ষান্তরে আমরা চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, আত্মসাৎ, জালিয়াতি ইত্যাদি থেকে তাদেরকে অবশ্যই বিরত রাখব। কেননা এগুলো গোটা মানব জাতির ঐক্যমত অনুযায়ী খারাপ কাজ এবং এর মাধ্যমে জমিনের বুকে বিপর্যয় ও বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

আমি আপনার একথার সাথেও একমত যে, যে ব্যক্তিই নৈতিক সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয় গুণাবলীর দিক থেকে আমাদের যত কাছাকাছি হবে-তার জন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের নিকৃষ্টতা নিজ স্থানে যথার্থ, কিন্তু বদকার এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তির তুলনায় উত্তম

চরিত্রের সরল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অবশ্যই ভাল এবং তার ব্যাপারে আমরা আশা করতে পারি যে, কোন এক সময় সে নিজের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাসের নিকৃষ্টতা অনুভব করতে পেরে সঠিক আকীদা–বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারবে।

বিনীত
আবুল আ'লা মওদূদী
জুমাদাল উলা ১৩৭৭/ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

ইজতিহাদ ও তার দাবী

ইজতিহাদের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে যে বিতর্ক চলছে সেই প্রসংগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেঃ "ইজতিহাদের যে দরজা শত শত বছর পূর্বে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আজ তা খুলে দেয়ার কঠিন প্রয়োজন দেখা দেয়নি কি? আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে ইজতিহাদের যেসব মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল তাকে কি আজকের বিশ শতকের সমস্যাবলীর উপর কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে? যেখানে প্রতিটি মাযহাবের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের ইমামদের ইজতিহাদী আইন-কানুন পরিবর্তন করার বিপক্ষে এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে আজকের সমস্যার জন্যও এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে সেখানে এই অবস্থাকে সরকার কিভাবে কাটিয়ে উঠবে? যদি প্রতিটি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের আলেমগণকে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সমষ্টিগতভাবে 'ইজমার' জন্য নিয়োগ করা হয় তাহলে এভাবে যে ইজতিহাদ করা হবে তা কি সমস্ত মুসলমানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে? লোকদেরকে এর উপর আমল করতে বাধ্য করার জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে কি? বিরোধিতা, মতবৈষম্য ও সমালোচনা কতদূর পর্যন্ত সহ্য করা যেতে পারে? হযরত আলী (রা), জা'ফর সাদেক (রহ) এবং শীআইমামদের যেসব ইজতিহাদ ও আইন-কানুন খুবই যুক্তিযুক্ত—তা কি কোন ইসলামী সরকার সমস্ত মুসলমানদের উপর কার্যকর করতে পারে?" এই প্রশ্ন অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নের সমষ্টি। আমি এর প্রতিটি অংশের জবাব ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দান করব।

১. ইজতিহাদের দরজা কোন্ লোকদের জন্য উন্মুক্ত

ইজতিহাদের দরজা খোলাটা এমন কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন না যিনি যুগের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি ইসলামী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ভালভাবে হৃদয়ংগম করতে পারেন। কিন্তু ইজতিহাদের দরজা খোলা যতটা প্রয়োজনীয় ততোটাই সতর্কতা অবলম্বনেরও দাবী রাখে। ইজতিহাদ করা এমন লোকদের কাজ নয়

যারা অনুবাদের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে (ইজতিহাদ করনা উন লুগু কা কাম নেহি হ্যায় জু তরজমুকী মদদ সে কুরআন পড়তে হৌ) এবং যারা হাদীসের গোটা ভান্ডার সম্পর্কে কেবল অনবহিতই নয়, বরং এটাকে অর্থহীন দফতর মনে করে প্রত্যাখ্যান করে, পেছনের তেরশত বছরে মুসলিম ফিকাহবিদগণ ইসলামী আইনের উপর যত কাজ করেছেন সে সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞানও রাখে না এবং এটাকেও অনর্থক ও বাজে জিনিস মনে করে ছুড়ে ফেলে দেয়; উপরন্তু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে তার আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে দেয়। এই ধরনের লোকেরা যদি ইজতিহাদ করে তাহলে ইসলামকে কদাকার করে ছাড়বে এবং মুসলমানদের মধ্যে যতক্ষণ সামান্য পরিমাণও ইসলামী চেতনা বর্তমান থাকবে, এই ধরনের লোকদের ইজতিহাদকে তারা কখনো নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করবে না। এই ধরনের ইজতিহাদের সাহায্যে যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা কেবল লাঠির জোরেই জাতির উপর কার্যকর করা যেতে পারে এবং লাঠির বিদায়ের সাথে সাথে তাও বিদায় নেবে। জাতির বিবেক তাকে এমনভাবে উদগীরণ করে ফেলে দেবে যেভাবে মানুষের পাকস্থলী গিলে ফেলা মাছিকে বমন করে ফেলে দেয়। মুসলমানরা যদি নিশ্চিত মনে কারো ইজতিহাদকে কবুল করতে পারে তা কেবল এমন লোকদের ইজতিহাদ যাদের দীনী জ্ঞান, খোদাভীরুতা ও সচেতনতার উপর তাদের বিশ্বাস ও ভরসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে তারা জানে যে, এইসব লোক অনৈসলামী মতাদর্শ ও দৃষ্টিভংগিকে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবে না।

২. ইজতিহাদের মূলনীতি ও তার গুরুত্ব

আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে ইজতিহাদের যে মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল তা কেবল এইজন্য প্রত্যাখ্যান করা যায় না যে, তা হাজার বছরের পুরাতন। যুক্তিসংগতভাবে মূল্যায়ন করে দেখুন এগুলো কি ধরনের মূলনীতি ছিল এবং এই বিশ শতকে এ ছাড়া অন্য কোন মূলনীতিও হতে পারে কিনা?

প্রথম মূলনীতি এই ছিল যে, কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে—সেই ভাষা, তার ব্যাকরণ, বাকরীতি এবং সাহিত্যিক মাধুর্যের উপর ইজতিহাদকারীর দক্ষতা থাকতে হবে। বলুন, এই মূলনীতি কি ভুল? ইংরেজী ভাষায় আইনের যেসব বই-পুস্তক লেখা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করার অধিকারী কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেয়া যেতে পারে—ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে যার এতটা অভিজ্ঞতা নেই? এখানে তো একটি যতিচিহ্নের (comma) এদিক

ওদিক হয়ে গেলে অর্থের বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনকি একটি যতিচিহ্নের পরিবর্তনের জন্য সংসদকে একটি আইন (Act) পাশ করতে হয়। কিন্তু এখা ন দাবী তোলা হচ্ছে যে, যারা অনুবাদের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে তারাই কুরআনের ব্যাখ্যা করবে। আবার অনুবাদটিও ইংরেজী ভাষায়।

দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, কুরআন মজীদ এবং তা যে পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে-এর উপর ইজতিহাদকারীর ব্যাপক এবং গভীর অধ্যয়ন থাকতে হবে। এই মূলনীতির মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কি? বর্তমান আইনের ব্যাখ্যার অধিকার কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেয়া যেতে পারে, যে আইনের বই-পুস্তক কেবল ভাসাভাসা অধ্যয়ন করেছে অথবা কেবল তার অনুবাদ পড়ে নিয়েছে?

তৃতীয় মূলনীতি এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামী আইনের উপর যে কাজ হয়েছে—সে সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। এ কথা পরিষ্কার যে, কুরআন মজীদ শুন্যলোকে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সরাসরি আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি। একজন নবী এটাকে আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন। তিনি এর ভিত্তিতে লোকদের তৈরী করেছিলেন, সমাজ গঠন করেছিলেন, একটি রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন, হাজার হাজার লোককে তা শিখিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এই সমস্ত জিনিসকে শেষপর্যন্ত কিভাবে উপেক্ষা করা যেতে পারে? এর যে রেকর্ড বর্তমান রয়েছে তা থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু কুরআন থেকে আইনের ভাষা বের করে নেয়া কিভাবে সঠিক হতে পারে?

চতুর্থ মূলনীতি এই যে, ইজতিহাদকারীকে ইসলামী আইনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। তার জানা থাকতে হবে যে, এই আইন ব্যবস্থা কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করে আজ আমাদের পর্যন্ত পৌছে গেছে। গত তেরশত বছরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর উপর কি কাজ হয়েছে এবং বিভিন্ন যুগে সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ব্যাপক ভিত্তিতে কি আইন প্রণয়ন করা হচ্ছিল? এই ইতিহাস এবং এই কাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়া ছাড়া আমরা ইজতিহাদ করে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ধারাকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে অব্যাহত রাখতে পারি? এক বংশধর যদি কৃত সমস্ত কাজকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ইমারত তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমাদের উত্তরসূরীরাও এই ধরনের

আহাযকী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন বুদ্ধিমান জাতি নিজেদের পূর্বসূরীদের অবদানকে ধ্বংস করতে পারে না, বরং তারা যা কিছু করেছে সেগুলোকে সাথে নিয়ে প্রথমে সেই কাজ করে যা তারা করেনি। আর এভাবেই উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে পারে।

পঞ্চম মূলনীতি এই যে, ইজতিহাদকারী ঈমানদারীর সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তা পদ্ধতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশসমূহের নির্ভুলতায় বিশ্বাসী হবে এবং পথনির্দেশ লাভ করার জন্য ইসলামের বাইরে তাকাবে না, বরং ইসলামের মধ্য থেকেই পথনির্দেশ লাভ করবে। এটা এমন একটা শর্ত যা দুনিয়ার প্রতিটি আইনব্যবস্থা নিজস্ব গন্ডির মধ্যে ইজতিহাদ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করবে। মূলত ইজতিহাদের এই পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দলীল–প্রমাণের সাহায্যে এই বিশ শতকের জন্য আরো কোনো মূলনীতির প্রস্তাব করতে পারে তাহলে আমরা তার কাছে ঋণস্বীকার করব।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে ফিকাহ ভিত্তিক বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি

মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো ফিরকাগত বিরোধ রয়েছে সে সম্পর্কে প্রথমেই এদেশের আলেম সমাজ এই ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, ব্যক্তিগত আইন (personal law) সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজ নিজ উপদলের কাছে স্বীকৃত নির্দেশই তাদের উপর কার্যকর হবে। আর রাষ্ট্রীয় আইন অধিকাংশের কাছে স্বীকৃত মত অনুযায়ী হবে। অতএব যেসব সমস্যার উল্লেখ করা হয়ে থাকে— এই সিদ্ধান্তের পরও কি তা অবশিষ্ট থাকে? আইন পরিষদে আমাদের প্রতিনিধিগণ যদি সাবধানতা সহকারে এই মূলনীতির উপর আমল করেন তাহলে ফিরকাগত বিরোধসমূহ ক্রমান্বয়ে কমে যেতে থাকবে এবং উত্তমরূপে আমাদের আইন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ হতে থাকবে।

৪. শীআ ফিকাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইন হতে পারে না

যে দেশের অধিকাংশ লোক শীআসম্প্রদায়ভুক্ত কেবল সেখানেই জাফরী ফিকাহ এবং শীআ আলেমদের ইজতিহাদ কার্যকর হতে পারে। সুতরাং ইরানে তা কার্যকর রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে তা কেবল শীআদের ব্যক্তিগত আইন হিসাবেই থাকতে পারে। যে দেশের অধিকাংশ নাগরিক সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের উপর এই ফিকাহ কার্যকর করার চেষ্টা কিভাবে করা যেতে পারে?

[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬১]

ইজতেহাদের ক্ষেত্রে পরিভাষা ও তার প্রাণসত্তার গুরুত্ব

আরো এক ব্যক্তি এই প্রসংগে লিখেছেন

"যে ইজতেহাদ করা হবে তা কুরআন, হাদীস এবং পূর্বেকার ইজতেহাদী আইন-কানুন যা খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কার্যকর ছিল এর পরিভাষা-গুলোকেই সামনে রেখে কি করা হবে, না কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের সঠিক স্পীরিট সামনে রেখে করা হবে–অর্থাৎ কেন, কখন এবং কোন্ অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং ঝোঁকপ্রবণতার অধীনে সেই আইন-কানুন জারী করা হয়েছিল? বর্তমান আইনের ধারাসমূহ ও শব্দের গাঁথুনি (Wording of the sections) যতটা গুরুত্বের অধিকারী, আইনের প্রস্তাবনা ও মুখবন্ধ (Preamble) তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর আলোকে আইন-কানুনের ধারাসমূহ পর্যন্ত প্রায় রহিত সাব্যস্ত করা হয়। মনে করুন, যেমন একজন মুসলমান ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখে। কিন্তু নামায-রোযার ক্ষেত্রে দুই মেরুতে (Pollars) বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য সময় কিরূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে–যেখানে রাত এবং দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে? আরো মনে করুন, কোন এলাকায় কোরবানীর জন্য গরু, উট, ভেড়া, ছাগল, মেষ ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে কেবল শূকর, খরগোশ, মাছ, গণ্ডার, হাতী, কুকুর ইত্যাদি পাওয়া যায়, অথবা কিছুই পাওয়া যায় না–সেখানে কিভাবে কোরবানী করা হবে? যদি কোরবানীর সঠিক স্পীরিট এবং আবেগের অধীনে পশুর আনুমানিক মূল্য সমসাময়িক সরকারের বাইতুল মালে জমা দেয়া হয় অথবা জাতির কল্যাণে খরচ করা হয় তাহলে শরীআত এটাকে যথেষ্ট মনে করবে কি?"

গ্রন্থকারের বক্তব্য

ইজতেহাদের জন্য শব্দের বিন্যাস ও স্পীরিট উভয়টিই বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কিন্তু স্পীরিটের প্রসংগটি বিশেষ জটিল। স্পীরিট বলতে যদি সামগ্রিকভাবে কুরআনের শিক্ষা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কার্যপ্রণালী, খোলাফায়ে রাশেদার কার্যাবলী এবং সামগ্রিকভাবে উম্মাতের ফিকাহবিদদের প্রজ্ঞা থেকে প্রকাশিত স্পীরিট বুঝানো হয়, তাহলে নিসন্দেহে এই স্পীরিট বিবেচনার যোগ্য এবং তা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু শব্দগুলো যদি কুরআন ও সুন্নাত থেকে নেয়া হয় এবং স্পীরিট যদি অন্য কোথাও থেকে নেয়া হয় তাহলে এটা অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাপার। এ ধরনের স্পীরিটের দিকে লক্ষ্য রাখার অর্থ হচ্ছে- আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চাই।

মেরু অঞ্চলে নামায এবং রোযা সম্পর্কে আমাদের দেখতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে আসল উদ্দেশ্য কি আল্লাহর ইবাদত করা, না এই ইবাদত দুটিকে তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা যার নিদর্শনসমূহ কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণনা করা হয়েছে? গোটা দুনিয়ার স্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে এই যে, কোন নির্দেশের মধ্যে যে আসল উদ্দেশ্য রয়েছে তা অধিক গুরুত্বের দাবীদার। যদি এই নির্দেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে এমন কোন একটি বিষয় এসে যায় যা পালন করতে গেলে নির্দেশের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায় না—তাহলে উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন মজীদ এবং সুন্নাতের দৃষ্টিকোণ থেকে নামায আদায় করা এবং রোয়া রাখা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। এসব ইবাদতের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা পৃথিবীর সর্বাধিক এলাকার জনগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃথিবীর জনবসতির সর্বাধিক অংশ সেই এলাকায় বসবাস করে যেখানে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে রাত-দিনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই এলাকার প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সব সময় ঘড়ি থাকা যেহেতু সম্ভব নয় তাই তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ইবাদতের সময়ের জন্য আকাশে অথবা দিকচক্রবালে উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে—যাতে প্রতিটি ব্যক্তি অতি সহজে নিজের ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় সহজে জেনে নিতে পারে। মানবগোষ্ঠীর একটা অতি ক্ষুদ্র অংশই মেরু অঞ্চলে বসবাস করে। তাদেরকে নামায-রোযার আহকামের উপর আমল করার জন্য নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত সংশোধন করে নিতে হবে। কেননা এখানে একই সংগে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের অনুসরণ এবং ইবাদতসমূহ আদায় করা সম্ভব নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, ইবাদতের নির্দেশকে ওয়াক্তের নির্দেশের কাছে কো'বান্দী করা যেতে পারে না।

কোরবানীর নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে মাত্র দুটি মূলনীতি দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এক, এমন পশু হতে হবে–ইসলামে যা হারাম করা হয়নি। দুই, এমন পশু হতে হবে যা কোন জনবসতিতে গৃহপালিত জন্তু (Cattle) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে গোটা দুনিয়ায় কোরবানীর নির্দেশের উপর আমল করা যেতে পারে। কোরবানী অবশ্যই পশুর মাধ্যমে হতে হবে। কোন আর্থিক খরচ তার বিকল্প হতে পারে না। আমি আমার "কোরবানী" পুস্তকে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬১]

আইন প্রণয়ন, শূরা (পরামর্শ পরিষদ) ও ইজমা (ঐক্যমত)

পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করা হচ্ছে। এই প্রসংগে এক বন্ধু নিজের মনের জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে লিখেছেনঃ

"ইসলামে আইন প্রণয়নের যথার্থতা ও প্রকৃতি এবং তার কর্মপরিসর নির্ধারণে অনেক বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। একদিকে বলা হচ্ছে যে, ইসলামে আইন প্রণয়নের মূলত কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা এবং তা কার্যকর করা। অপরদিকে কতিপয় লোকের মতে বর্তমানে আইন প্রণয়নের পরিসর এতটা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত বিস্তারিত নিয়ম–কানুনে পরিবর্তন ও সংকোচন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা নামায এবং রোযার বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে সংকোচন ও সংযোজন করতে পারেন।

অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিতভাবে বলে দিন যে, ইসলামে আইন প্রণয়নের সীমা এবং তার বিভিন্ন পর্যায় কি কি? অনন্তর একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে, খোলাফায়ে রাশেদার ব্যক্তিগত এবং শূরাভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও ফিকাহের ইমাম ও মুজতাহিদদের রায়ের আইনগত মর্যাদা কি? এই সাথে যদি শূরা (পরামর্শ পরিষদ) এবং ইজমার (ঐক্যমত) তাৎপর্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয় তাহলে ভালই হয়।"

আইন প্রণয়নের বুনিয়াদী মূলনীতি

ইসলামে ইবাদতের পরিমণ্ডলে চূড়ান্তভাবেই আইন প্রণয়নের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য ইবাদত ছাড়া মুআমালাতের (কার্যাবলী) ক্ষেত্রে কেবল সেখানেই আইন প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাত নীরবতা

অবলম্বন করেছে। ইসলামে আইন প্রণয়নের ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতি যে, "ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবল সেই কাজ কর যা বলে দেয়া হয়েছে এবং নিজের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার কর না। আর মুআ-মালাতের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য কর, যা থেকে বিরত রাখা হয়েছে—তা করা থেকে বিরত থাক এবং যে জিনিস সম্পর্কে শরীআত প্রণেতা (আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল) নীরব থেকেছেন সে ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের সঠিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন।" ইমাম শাতিবী (রহঃ) তাঁর 'আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে উল্লেখিত মূলনীতিটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"ইবাদতের নির্দেশ অভ্যাসের নির্দেশ থেকে ভিন্নতর। অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যে জিনিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে—তাতে যেন নিজের সঠিক দৃষ্টিকোণের উপর কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন কোন কথা ইস্তেম্বাতের (কারণ দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মাধ্যমে বের করা যায় না যার মূল শরীআতে বর্তমান নেই। কেননা ইবাদতের কাঠামো পরিষ্কার নির্দেশ এবং পরিষ্কার অনুমতির সম্পর্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে তদ্রুপ নয়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে আমাদের জ্ঞান সঠিক পথ জেনে নিতে পারে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের জ্ঞানের সাহায্যে এটা জানতে পারি না যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথ কোনটি"-(২য় খন্ড, পৃ. ১১৫)।

আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ

মুআমালাত বা আদান-প্রদান ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ রয়েছেঃ

১. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীআত প্রণেতা আদেশ অথবা নিষেধের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে নসের (কুরআনের আয়াত) অর্থ অথবা তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

২. কিয়াস ঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীআত প্রণেতার সরাসরি কোন নির্দেশ বর্তমান নেই, কিন্তু যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারের নির্দেশ বর্তমান আছে। এর মধ্যে নির্দেশের কারণ নির্ধারণ করে এই নির্দেশকে এই ভিত্তির উপর জারি করা যে, এখানেও ঐ একই কারণ পাওয়া যায়— যার ভিত্তিতে ঐ নির্দেশ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছিল।

৪

৩. ইস্তেম্বাত ও ইজতেহাদঃ অর্থাৎ শরীআতের বর্ণিত ব্যাপক মূলনীতিকে প্রাসংগিক মাসয়ালা ও বিষয়ের অনুকূল করা এবং নসসমূহের ইংগিত, লক্ষণ ও দাবীকে উপলব্দি করে বুঝে নেয়া যে, শরীআত প্রণেতা আমাদের জীবনের ব্যাপারসমূহকে কোন আকারে ঢেলে সাজাতে চান।

৪. যেসব ব্যাপারে শরীআত প্রণেতা কোন পথনির্দেশ দেননি সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও সার্বিক সার্থ সামনে রেখে এমন আইন প্রণয়ন করা—যা প্রয়োজনও পূরণ করবে এবং সাথে সাথে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রাণসত্তা ও মেজাজ-প্রকৃতির পরিপন্থীও হবে না। ফিকাহবিদগণ এই জিনিসকে 'মাসালেহে মুরসালা' ও 'ইস্তেহসান' ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। মাসালেহে মুরসালার অর্থ হচ্ছে, সেই সার্বিক কল্যাণকর জিনিস যা আমাদের সঠিক দৃষ্টিভংগীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর ইস্তেহসানের অর্থ হচ্ছে কোন একটি ব্যাপারে কিয়াস প্রকাশ্যত একটি হুকুম আরোপ করে, কিন্তু দীনের মহান স্বার্থে অন্যরূপ নির্দেশের দাবী করে। এজন্য প্রথম নির্দেশের পরিবর্তে দ্বিতীয় নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা কার্যকর করা হয়।

মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তেহসান

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কিয়াস ও ইস্তেম্বাতের জন্য তো অধিক আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তেহসানের উপর আরো কিছু আলোকপাত করব। ইমাম শাতিবী (রহঃ) তাঁর 'আল-ই'তেসাম' গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এসম্পর্কে এত মূল্যবান আলোচনা করেছেন যে, এর চেয়ে ভাল আলোচনা উসূলে ফিকহের কোন কিতাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এতে তিনি বিস্তারিত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মাসালিহে মুরসালার অর্থ আইন প্রণয়নের অবাধ অনুমতি নয়, যেমন কতিপয় লোক মনে করে থাকে, বরং এর জন্য তিনটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছেঃ

একঃ এই পন্থায় যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা শরীআতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, তার পরিপন্থী হতে পারবে না।

দুইঃ যখন তা জনগণের সামনে পেশ করা হবে, সাধারণ জ্ঞানের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

তিনঃ তা কোন প্রকৃত প্রয়োজন পুরণ করার জন্য অথবা কোন প্রকৃত অসুবিধা দূর করার জন্য হতে হবে— (আল-ই'তেসাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১১০-১১৪)।

অতপর তিনি ইস্তেহসান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, প্রকাশ্যত কোন দলীলের ভিত্তিতে যদি কিয়াসের দাবী এই হয় যে, একটি ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন, কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিতে এই নির্দেশ সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী, অথবা এর দ্বারা এমন কোন ক্ষতি বা ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করার যোগ্য, অথবা তা উরফের (প্রচলিত রীতি) পরিপন্থী—তখন এটাকে পরিত্যাগ করে ভিন্নতর নির্দেশ দান হচ্ছে ইহসান। অবশ্য ইস্তেহসানের জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করে কিয়াসের পরিপন্থী নির্দেশ দানের জন্য কোন শক্তিশালী কারণ বর্তমান থাকতে হবে যাকে যুক্তিসংগত দলীল সহকারে বিবেচনাযোগ্য প্রমাণ করা যেতে পারে —(আল-ই'তেসাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৮-১৯)।

আদালতের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যেকার পার্থক্য

এই চারটি বিভাগ সম্পর্কে কোন মুজতাহিদ অথবা ইমামের ব্যক্তিগত রায় এবং পর্যালোচনা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ রায় এবং পর্যালোচনা তো হতে পারে– যার ওজন রায়দাতার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বের ওজন অনুযায়ী-ই হবে। কিন্তু তথাপি তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে-ইসলামী রাষ্ট্রের আরবাবে হল ওয়াল আকদের (সিদ্ধান্ত এবং সমাধান পেশ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের) পরামর্শ পরিষদ থাকবে এবং তারা নিজেদের ইজমা অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে একটি ব্যাখ্যা, একটি কিয়াস, একটি ইস্তেম্বাত ও ইজতেহাদ অথবা একটি ইস্তেহসান ও মুসলিহাতে মুরসালাকে গ্রহণ করে তাকে আইনের রূপ দেবেন। খেলাফতে রাশেদার আমলে আইন প্রণয়নের জন্য এই ব্যবস্থাই ছিল। আমি আমার "ইসলামী দস্তুর কী তাদবীন" (ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন) পুস্তিকায় এর ব্যাখ্যা করেছি। অতএব এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।[1] এখানে আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করব। তা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, খেলাফতে রাশেদার যুগে জাতীয় প্রয়োজন দেখা দিলে কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হত এবং সেই যুগে আইন ও আদালতের ফয়সালাসমূহের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল।

---

১. অনুগ্রহপূর্বক এই পুস্তকের ২৬-২৮, ৩৫-৩৮, ৪০-৫১ এবং ৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।

কতিপয় দৃষ্টান্ত

১. মদ সম্পর্কে কুরআন মজীদের কেবল হারাম হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই অপরাধের জন্য শাস্তির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এজন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তিনি যাকে যেরূপ শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মনে করতেন তা দিতেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও উমর (রা) নিজেদের যুগে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করেন, কিন্তু এজন্য রীতিমত কোন আইন প্রণয়ন করেননি। হযরত উসমান (রা)-র যুগে যখন শরাব পানের অভিযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন তিনি সাহাবাদের পরামর্শ পরিষদে বিষয়টি উথাপন করেন। হযরত আলী (রা) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রস্তাব দিলেন যে, এজন্য আশি বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক। পরামর্শ পরিষদ তাঁর সাথে একমত হলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ইজমা সহকারে এই আইন প্রণয়ন করেন।

(আল-ই'তেসাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১)

২. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই আইনও প্রণয়ন করা হল যে, কারিগর বা শিল্পীদের যদি কোন জিনিস তৈরী করতে দেয়া হয় (সেলাই করার জন্য কাপড়, অথবা অলংকার বানানোর জন্য সোনা) এবং তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে এর মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তও হযরত আলী (রাঃ)-র নিম্নোক্ত ভাষণের ভিত্তিতে হয়েছে যে, কারিগরদের যদিও এই অবস্থায় বাহ্যত দোষী সাব্যস্ত করা যায় না-যখন তা তার অবহেলার কারণে ধ্বংস না হয়ে থাকে, কিন্তু যদি এরূপ না করা হয় তাহলে জিনিসপত্রের হেফাজতের ক্ষেত্রে শিল্পীদের অবহেলা প্রদর্শনের আশংকা রয়েছে। এজন্য সামগ্রিক স্বার্থের দাবী হচ্ছে এই যে, তাদেরকে এই জিনিসের জামানতদার সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তও ইজমার সাহায্যে হয়েছে। -(ইতেসাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২)।

৩. হযরত উমার (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে যদি একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে তাহলে সবার উপর কিসাসের দণ্ড কার্যকর হবে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন, কিন্তু এটাকে আইন হিসাবে মেনে নেয়া হয়নি। কেননা এটা একটা আদালতী ফয়সালা ছিল, পরামর্শ পরিষদে ইজমার মাধ্যমে অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে আইন হিসাবে বানানো হয়নি-(ইতেসাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭)।

৪. নিখোজ ব্যক্তির স্ত্রী যদি আদালতের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয়, অতপর তার পূর্বতন স্বামী ফিরে আসে —তাহলে তাকে কি প্রথম স্বামী

পাবে না সে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে থাকবে? এই প্রসংগে খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্নরূপ ফয়সালা করেন। কিন্তু কোন ফয়সালাই আইনের মর্যাদা লাভ করেনি। কেননা এই প্রসংগটিকে পরামর্শ পরিষদে পেশ করে ইজমা অথবা অধিকাংশের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোন ফয়সালায় পরিণত করা হয়নি।

–(ইতেসাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৬)।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজী আইনে আদালতের সিদ্ধান্তের যে মর্যাদা রয়েছে, ইসলামে আদালতের সিদ্ধান্তের সেই মর্যাদা নেই। ইংরেজী আইনে বিচারকদের সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তসমূহ আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে কিন্তু ইসলামে যদিও কোন বিচারকের ফয়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে–যা তিনি কোন মামলায় নসের একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, অথবা নিজের কিয়াস অথবা ইজতেহাদের ভিত্তিতে করে থাকবেন– কিন্তু তা একটি স্বতন্ত্র আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং একই বিচারক একটি মামলায় একটি ফয়সালা দেয়ার পর সব সময়ের জন্য নিজের এই ফয়সালা অনুসরণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এরপরও তিনি উল্লেখিত মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য মামলায় ভিন্নরূপ ফয়সালা করতে পারেন–যদি তার সামনে পূর্বেকার ফয়সালার ত্রুটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

খেলাফতে রাশেদার পর যখন পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যায়, তখন মুজতাহিদ ইমামগণ ফিক্‌হের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন–তা আধা–আইনের মর্যাদা এজন্য লাভ করে যে, কোন এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক সংখ্যক লোক কোন এক ইমামের ফিকাহ গ্রহণ করে নেয়। যেমন ইরাক ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ, স্পেনে ইমাম মালেকের ফিকাহ, মিসরে ইমাম শাফিঈর ফিকাহ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ব্যাপক গ্রহণ কোথাও কোন ফিকাহকে সঠিক অর্থে আইনে পরিণত করেনি। যেখানেই তা আইনে পরিণত হয় তা এই ভিত্তিতে যে, দেশের সরকার তাকে আইন হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে।

ইজমার সংজ্ঞা

ইজমার সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রহ)–এর মতে, "কোন মাসআলার ক্ষেত্রে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের ঐক্যমত এবং এর পরিপন্থী কোন মত বর্তমান না থাকলে তাকে

ইজমা বলে।" ইবনে জারীর তাবারী (রহ) এবং আবু বাক্র আল–রাযী (রহ)–এর পরিভাষায় অধিকাংশের মতকেও ইজমা বলে। ইমাম আহমাদ (রহ) যখন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে এই কথা বলেন যে, "আমাদের জানামতে এর পরিপন্থী কোন মত নেই," তখন এর এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তাঁর মতে এই মাসআলার উপর ইজমা হয়েছে।

ইজমা হুজ্জাত হওয়ার মর্যাদাটি সবার কাছে স্বীকৃত। অর্থাৎ নসের যে ব্যাখ্যার উপর, অথবা যে কিয়াস ও ইজতেহাদের উপর অথবা সামগ্রিক কল্যাণ সম্বলিত যে আইনের উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। ইজমার হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই, কিন্তু ইজমার প্রমাণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সম্পর্কে বলা যায়, এ যুগে যেহেতু ইসলামী সংগঠন ব্যবস্থা যথারীতি কায়েম ছিল এবং পরামর্শ পরিষদের অধীনে তা পরিচালিত ছিল, তাই সে সময়কার ইজমা ও অধিকাংশের ফয়সালা জ্ঞাত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে গেল এবং পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে গেল তখন এটা জ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় অবশিষ্ট থাকল না যে, বাস্তবিকপক্ষে কোন্ জিনিসের উপর ইজমা আছে আর কোন্ জিনিসের উপর নেই। এর কারণে খেলাফতে রাশেদার যুগের ইজমা তো স্বীকৃত এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন লোক যখন দাবী করে যে, অমুক মাসআলার উপর ইজমা হয়েছে, তখন বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে আমাদের মতে, কোন্‌টির উপর ইজমা হয়েছে আর কোন্‌টির উপর হয়নি তা জানার জন্য ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং ইমাম আহমাদ (রহ) আদৌ ইজমার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন না বলে যে কথা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, অথবা অন্য কোন ইমাম ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—এসব কিছু উপরে উল্লেখিত কথা না বুঝার কারণেই হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যখন কোন মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, সে যা কিছু বলছে তার উপর ইজমা রয়েছে–কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোন প্রমাণ বর্তমান থাকত না– তখন এই লোকেরা উল্লেখিত দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর 'জিমাউল ইলম' গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা করে বলেছেন যে, ইসলামী বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত

হওয়া ও বিভিন্ন এলাকায় বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যাবার পর এখন কোন আংশিক বা আনুসংগিক মাসআলার ব্যাপারে আলেমদের মতামত কি তা জানাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য আনুসংগিক মাসআলার ক্ষেত্রে ইজমার দাবী করাটা মূলত ভুল। অবশ্য ইসলামের মূলনীতিসমূহ, তার রুকনসমূহ এবং বড় বড় মাসআলা সম্পর্কে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, এর উপর ইজমা রয়েছে। যেমন নামাযের ওয়াক্ত পাঁচটি, অথবা রোযার সীমারেখা এই ইত্যাদি। এ কথাটিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) এভাবে বলেছেনঃ

"ইজমার অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন মাসআলার উপর উম্মাতের সমস্ত আলেমের একমত হয়ে যাওয়া। আর যখন কোন মাসআলার উপর গোটা উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কোন ব্যক্তির তা থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার থাকে না। কেননা গোটা উম্মাত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হতে পারে না। কিন্তু এমন অনেক মাসআলাও রয়েছে, যে সম্পর্কে কোন কোন লোকের ধারণা হচ্ছে এই যে, তার উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু মূলত তা হয়নি, বরং কখনো কখনো ভিন্নমত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।"

–(ফতোওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৬)

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন মাসআলার ক্ষেত্রে শরীআতের নসের কোন ব্যাখ্যার উপর, অথবা কোন কিয়াস বা ইস্তেম্বাতের উপর, অথবা কোন মাসালিহে মুরসালার উপর আজো যদি প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণের ইজমা হয়ে যায়, অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হুজ্জাতের মর্যাদা লাভ করবে এবং আইনে পরিণত হবে। যদি গোটা বিশ্বের মুসলিম মনীষিগণ এই ধরনের মাসয়ালায় ঐক্যমত হয়ে যান, তাহলে সেটা গোটা দুনিয়ার জন্য আইনে পরিণত হবে। আর যদি কোন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত হন, তাহলে অন্তুতপক্ষে ঐ রাষ্ট্রের জন্য তা আইনে পরিণত হবে।

–[তরজমানুল কুরআন, শা'বান ১৩৭৪; মে ১৯৫৫]

ইসলামী ব্যবস্থায় বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পন্থা

তাফহীমুল কুরআনের পাঠকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে নিজের একটি জটিলতার কথা বর্ণনা করে লিখেছেনঃ

কুরআন মজীদের আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদারগণ। আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর তাঁর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যেকার কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।"—(সূরা-নিসাঃ ৫৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনি তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন, "আলোচ্য আয়াতে যে কথা স্থায়ী এবং চূড়ান্ত মূলনীতির আকারে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা এই যে, ইসলামী ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রসূলের তরীকা মৌলিক আইন এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদের মর্যাদা রাখে। মুসলমানদের মাঝে অথবা সরকার ও জনগণের মাঝে যে বিষয়কে নিয়েই বিতর্ক সৃষ্টি হবে—সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর এখানে যে ফয়সালা পাওয়া যাবে তার সামনে সবাই আত্মসমর্পণ করবে। এভাবে জীবনের যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাতকে সনদ, প্রত্যাবর্তনস্থল এবং সর্বশেষ কথা হিসাবে মেনে নেয়া ইসলামী সমাজের এমন একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে দেয়।[১]

---

১. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খন্ড, সূরা নিসা, পৃঃ ৩৬৫।

"আপনার এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায় যে, যাবতীয় বিতর্কিত বিষয়ে সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকারী জিনিস হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ। এই প্রসংগে একটি জটিলতা হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এটা তো সম্পূর্ণই সম্ভব ছিল যে, যখনই কোন মতবৈষম্য দেখা দিয়েছে সাথে সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে বর্তমান নেই, বরং শুধু তাঁর শিক্ষাই আমাদের সামনে উপস্থিত আছে, এ সময় যদি ইসলামের কোন নির্দেশের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে একটি ইসলামী ব্যবস্থায় কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থা এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার লাভ করবে যে, এ ব্যাপারে শরীআতের লক্ষ্য কি? আশা করি আপনি এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে বাধিত করবেন।"

বিরোধ দূরীকরণে কুরআনের তিনটি মৌলিক হেদায়াত

এই প্রশ্নে যে জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর করার জন্য কুরআন, সুন্নাত, সাহাবাদের যুগের কার্যাবলী—একত্র হয়ে আমাদের সাহায্য করে। সর্বপ্রথম কুরআনকে দেখুন। তা এ ব্যাপারে তিনটি মৌলিক হেদায়াত দান করেঃ

প্রথম হেদায়াত ঃ আহলে যিকিরের কাছে প্রত্যাবর্তন

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"এই যিকিরওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি তোমরা নিজেরা না জান।" –(সূরা নহলঃ ৪৩; সূরা আম্বিয়াঃ ৭)

এ আয়াতে "আহলুয-যিক্‌র" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মজীদের পরিভাষায় 'যিকির' শব্দটি বিশেষভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোন জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন—তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর যে লোকদের এই শিক্ষা দেয়া হয় তাদের বলা হয় 'আহলুয-যিক্‌র'। এই শব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান (knowledge) লওয়া যেতে পারে না। বরং এর অর্থ অপরিহার্যরূপে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানই হতে পারে। অতএব এই আয়াত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, সমাজে প্রত্যাবর্তন স্থলের অধিকারী কেবল এমন লোকদের হওয়া উচিৎ, যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান রাখেন এবং যে পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌র রসূল শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্পর্কে যারা অবহিত।

দ্বিতীয় হেদায়াত ঃ উলিল আমরের কাছে প্রত্যাবর্তন

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ -

"আর যখনই তাদের সামনে শান্তিপূর্ণ অথবা ভীতিপ্রদ কোন ব্যাপার এসে যায়, তখন এটাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এটাকে রসূল এবং নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের পর্যন্ত পৌছে দিত, তাহলে যেসব লোক এর সঠিক ফলাফল বের করতে সক্ষম তারা এটা জানার সুযোগ পেত।"-(সূরা নিসাঃ ৮৩)

এ থেকে জানা গেল যে, সমাজ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে— চাই তা শান্তিপূর্ণ অবস্থার সাথেই সম্পর্কিত হোক, অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থার সাথে, ভয়ংকর ধরনের হোক অথবা সাধারণ প্রকৃতির--তাতে কেবল মুসলমানদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরাই হতে পারেন প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ যাদের উপর সমাজের সামগ্রিক পরিচালনভার অর্পণ করা হয় এবং যারা ইস্তেম্বাত করার যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ আগত সমস্যার প্রকৃতিও অনুধাবন করতে পারেন এবং আল্লাহ্র কিতাব ও আল্লাহ্র রসূলের তরীকার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারেন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ। এই আয়াত সমষ্টিগত সমস্যা এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে সাধারণ আহলে যিকিরদের পরিবর্তে কর্তৃত্বশীল লোকদের প্রত্যাবর্তনস্থল ঘোষণা করে। কিন্তু তাদেরকেও অবশ্যই আহলে যিকিরদের মধ্যেকার ব্যক্তিই হতে হবে। কেননা তাদের সামনে যে সমস্যা এসেছে তাতে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া মৌখিক এবং কর্মগত হেদায়াতকে দৃষ্টির সামনে রেখে তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

তৃতীয় হেদায়াত ঃ শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন

أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।" -(সূরা শূরাঃ ৩৮)

এই আয়াত বলছে যে, মুসলমানদের সমষ্টিগত ব্যাপারসমূহের সর্বশেষ ফয়সালা কিভাবে হওয়া উচিৎ।

এই তিনটি মূলনীতিকে যদি একত্র করে দেখা যায় তাহলে সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে "ফারুদ্দূহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি–"র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার বাস্তব পন্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের জীবনে সাধারণত যেসব সমস্যা এসে থাকে তা তারা আহলুয–যিকিরদের কাছে রুজু করবে এবং তারা তাদের বলে দেবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কি নির্দেশ রয়েছে। যেসব বিষয় সরকার ও সমাজের দিক থেকে গুরুত্বের দাবীদার, তা আহলুল হল্লে ওয়াল আকদ–এর সামনে পেশ করতে হবে। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন যে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাতের আলোকে কোন্ জিনিস হক ও সত্যের অধিক কাছাকাছি।

নববী যুগে উল্লেখিত মূলনীতিসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

এখন দেখা যাক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে এবং তাঁর পরে খেলাফতে রাশেদার যুগের কার্যপ্রণালী কিরূপ ছিল। রসূলুল্লাহ (স)–এর পবিত্র জীবদ্দশায় যেসব বিষয় সরাসরি তাঁর কাছে পৌছত, সেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী এবং তদনুযায়ী বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালাকারী ছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা জনবসতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হত তার সবই সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করা হত না এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত অর্জন করা হতনা। এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা লোকদের আল্লাহর দীনের শিক্ষা দান করতেন। সাধারণ লোকেরা নিজেদের দৈনন্দিন ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে জেনে নিত যে, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ কি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কোন্ তরীকা শিখিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিটি এলাকায় গভর্নর, কার্যনির্বাহী অফিসার এবং বিচারক নিযুক্ত থাকত। তারা নিজ নিজ কর্মপরিসরে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করত। এই লোকদের জন্য 'ফারুদ্দূহু ইলাল্লাহি ওয়ার–রসূলি'–এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য রসূলুল্লাহ (স) নিজে যে পন্থা পছন্দ করেছেন তা হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث معاذاً الى اليمن فقال

كيف تقضى، قال اقضى بما فى كتاب الله، قال فان لم يكن فى كتاب

الله قال فبسنة رسول الله، قال فان لم يكن في سنة رسول الله،

قال اجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (ص)

لما يرضي رسول الله (ص) (ترمذي ابواب الاحكام، ابوداؤد، كتاب الاقضية)

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল (রা)–কে ইয়ামনের কাযী করে পাঠালেন তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে? তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যে হেদায়াত রয়েছে তদনুযায়ী। তিনি বললেনঃ যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি আরজ করলেন, তাহলে রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তিনি আরজ করলেন, আমি আমার রায়ের মাধ্যমে (সত্য পর্যন্ত পৌঁছার) পূর্ণ চেষ্টা করব। এর উপর তিনি বললেনঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আল্লাহর রসূলের দূতকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দিয়েছেন যা আল্লাহ্‌র রসূলের পছন্দনীয়।"

–(তিরমিযীঃ আবওয়াবুল আহকাম, আবু দাউদঃকিতাবুল আকদিয়া)

রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কল্যাণময় যুগে পরামর্শ পরিষদ (শূরা) ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এমন প্রতিটি ব্যাপারে যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি কোন বিশেষ নির্দেশ পাননি—সমাজের রায় প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত –এই যে, নামাযের ওয়াক্তসমূহে লোকদের একত্র করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন তা। আর এর ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত তিনি আযানের পন্থা নির্ধারণ করেন।

খেলাফতেরাশেদার যুগে উল্লেখিত মূলনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ

রিসালত যুগের পর খেলাফতে রাশেদার যুগেও প্রায় এই কর্মপন্থাই কার্যকর ছিল। শুধু এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, রিসালাত যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) বর্তমান ছিলেন। এজন্য যাবতীয় বিষয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করা যেত। পরবর্তীকালে তাঁর সত্তা আর প্রত্যাবর্তনস্থল (মারজা) রইল না, বরং তাঁর রেখে যাওয়া প্রথাই হয়ে গেল মারজা, যা তাঁর সুন্নাতের আকারে লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। এই যুগে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এগুলো নিজ নিজ স্থান ও

অবস্থানের দিক থেকে "ফারুদ্দুহ ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি"-র উদ্দেশ্য পূর্ণ করত।

১. সাধারণ আলেম সমাজ যারা কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়সালাসমূহ, অথবা তাঁর কর্মপন্থা, অথবা তাঁর অনুমোদন[১] সম্পর্কিত কোন জ্ঞান বর্তমান ছিল।

কেবল সাধারণ লোকেরাই তাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে এদের কাছ থেকে ফতোয়া জানতেন না, বরং খোলাফায়ে রাশেদীনেরও যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এটা জানার প্রয়োজন দেখা দিত যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা—তখন এই লোকদের কাছে রুজু করতেন। কখনো কখনো এরূপও হত যে, সমসাময়িক খলীফা অজ্ঞতা বশত কোন ব্যাপারে নিজের রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিতেন, অতপর যখন জানা যেত যে, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ভিন্নতর সিদ্ধান্ত বর্তমান রয়েছে, তখন নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই আলেম সমাজের বর্তমানতা শুধু এতটুকু উপকারীই ছিল না যে, ব্যক্তিগতভাবে তারা জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীন লোকদের (উলিল-আমর) জন্য ইলমের একটি মাধ্যমের কাজ দিত, বরং এর চেয়েও বড় ফায়দা এই ছিল যে, তারা সামগ্রিকভাবে এ দায়িত্বও পালন করেন যে, কোন আদালত, কোন সরকার এবং কোন মজলিশে শূরা যেন আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। তাদের সুদৃঢ় রায় সাধারণ ইসলামী ব্যবস্থার আশ্রয়াধীন ছিল। প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনার জন্য তাদের সজাগ-সতর্ক থাকাটা ইসলামী ব্যবস্থার সঠিকভাবে চলার জন্য জামিন ছিল। কোন বিষয়ে তাদের ঐক্যমত প্রমাণ করত যে, এই বিশেষ ব্যাপারে দীনের রাস্তা সুনির্ধারিত। এ থেকে বিচ্যুত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। আবার তাদের মতবিরোধের অর্থ ছিল যে, এ ব্যাপারে দুই অথবা ততোধিক মত পোষণের সুযোগ রয়েছে, যদিও সিদ্ধান্ত একটির উপরই হয়েছে। তাদের বর্তমান থাকার কারণে উম্মাতের মধ্যে সাধারণভাবে কোন বিদয়াত গৃহীত হওয়া অসম্ভব ছিল। কেননা সর্বত্র দীনের জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য বর্তমান ছিল।

২. কাযা অর্থাৎ বিচার বিভাগ। কাযী শূরাই-এর নামে লিখিত হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি নির্দেশনামায় এর ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছেঃ

---

১. অনুমোদন (তাকরীর) বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কোন কাজ করা হয়েছিল এবং তিনি তা বহাল রেখেছেন।

اقض بما في كتاب الله، فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فان لم يكن في
كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقض به الصالحون فان شئت
فتقدم وان شئت فتأخر ولا ارى التأخر الا خيرا لك والسلام عليكم -

(النسائي، كتاب آداب القضاة)

"আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা কর। যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা কর। যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাতে না থাকে, তাহলে সালেহীনগণ যে ফয়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা কর। কিন্তু যদি কোন ব্যাপারের নির্দেশ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাতে পাওয়া না যায় এবং সালেহীনদের ফয়সালার নজীরও না পাওয়া যায় তাহলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তুমি পদক্ষেপ নিতে পার, অথবা অপেক্ষাও করতে পার। তবে আমার মতে অপেক্ষা করাটাই তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর।" [২] –(নাসাঈ, কিতাবু আদাবিল কুদাত)

এই পন্থাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ

قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم ان الله عز وجل
قدر علينا ان بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض
بما في كتاب الله فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به
نبيه صلى الله عليه وسلم فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به
نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فان جاء امر ليس
في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون

---

২. অপেক্ষা করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, অন্য কোন আদালত অনুরূপ কোন ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন নজীর স্থাপন করে কিনা। দুই, বিচারক নিজে ফয়সালা করার পরিবর্তে বিষয়টি পূর্বোল্লেখিত তৃতীয় সংস্থার কাছে রুজু করবে।

فليجتهد برأيه ولا يقول انى اخاف وانى اخاف فان الحلال
بيّن والحرام بيّن وبين ذالك امور مشتبهات فدع مايريبك الى
مالا يريبك - (النسائى- كتاب مذكور)

"এমন এক জমানা অতীত হয়েছে যখন আমরা ফয়সালা করতাম না, এবং ফয়সালা করার মর্যাদাও আমাদের ছিল না (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ)। এখন তাকদীরে ইলাহির কারণে আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অতএব এখন তোমাদের সামনে ফয়সালার জন্য কোন বিষয় উত্থাপিত হলে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে। যদি এমন কোন বিষয় এসে যায় যার হুকুম আল্লাহর কিতাবে বর্তমান নেই, তাহলে এর ফয়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়সালা অনুযায়ী করবে। কিন্তু যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয় যার হুকুম আল্লাহ্র কিতাবেও বর্তমান নেই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপ বিষয়ের ফয়সালা করেননি তাহলে সালেহীনগণ যে ফয়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করবে। যদি এমন কোন বিষয় সামনে এসে যায় যার হুকুম আল্লাহ্র কিতাবেও বর্তমান নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্তমান নেই এবং সালেহীনদের থেকেও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্তমান নেই, তাহলে সে বিষয়ে ইজতেহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্ণ চেষ্টা করবে। কিন্তু একথা বলবে না, আমি ভয় করছি, আমি ভয় পাচ্ছি। কেননা হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুটি জিনিসের মাঝখানে কতগুলো সংশয়পূর্ণ জিনিস রয়েছে। অতএব সংশয়পূর্ণ জিনিসের ক্ষেত্রে এমন ফয়সালা করতে হবে যা ব্যক্তির মনকে দোদুল্যমান না করতে পারে। আর দোদুল্যমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে ব্যক্তিকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।"-(নাসায়ীঈ, কিতাবু আদাবিল কুদাত)

এই বিচার বিভাগ কেবল জনসাধারণের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করারই অধিকারী ছিল না, বরং তা সরকারী প্রশাসনের (Executive) বিরুদ্ধেও জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করত এবং তার ফয়সালা দান করত। এই আদালতের সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারে কোন গভর্নরও আইনের উর্ধ্বে ছিল না এবং সমসাময়িক খলীফাও নয়। এভাবে প্রশাসনের বড় থেকে বৃহত্তর ব্যক্তি, এমনকি সমসাময়িক খলীফাও এবং স্বয়ং সরকারকেও-যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বা সরকারী অভিযোগ থাকত তাহলে-

আদালতের সাহায্য নিতে হত এবং আদালতই সিদ্ধান্ত করত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিধানের আলোকে এর সঠিক ফয়সালা কি হতে পারে।

৩. উলিল-আমর, অর্থাৎ খলীফা এবং তাঁর মজলিশে শূরা। এটা ছিল সর্বশেষ কর্তৃত্বশালী সংস্থা যা কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে—সেসব ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতে কি হুকুম প্রমাণিত রয়েছে। এবং যদি কোন ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতের ফয়সালা বর্তমান না থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মপন্থা দীনের মূলনীতি ও তার প্রাণসত্তা এবং মুসলিম সমাজের সার্বিক স্বার্থের দিক থেকে সত্যের অধিকতর কাছাকাছি। এই সংস্থার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত হাদীস এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফয়সালা গ্রহণ করাকালীন সময়ে শূরার বৈঠকে সাহাবাদের মধ্যে যে আলোচনা—পর্যালোচনা হয়েছিল তাও সংকলিত হয়েছে। তার মূল্যায়ন করলে জানা যায়, এই সংস্থা পূর্ণ কঠোরতার সাথে যে মূলনীতির অনুসরণ করত তা ছিল এই যে, প্রতিটি বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার কিতাবের দিকে রুজু করতে হবে। অতপর জানতে হবে যে, এই ধরনের কোন্ বিষয় রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে উদ্ভূত হলে তিনি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অতপর যদি এ দুটি উৎস থেকে কোন পথনির্দেশ না পাওয়া যায় তাহলে কেবল তখনই নিজের নির্ভুল চিন্তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্র কিতাবের কোন আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে কোন নযীর পাওয়া গেলে তারা তা থেকে সরে গিয়ে ভিন্নতর কোন ফয়সালা করতেন না। সাহাবাদের গোটা যুগে এই মূলনীতি বিরোধী একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। যদিও রাষ্ট্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার কার্যত উলিল-আমরের হাতেই ছিল, কিন্তু আইনত কুরআন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী সনদ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। মুসলিম সমাজও এই ভরসার ভিত্তিতে তাদের কর্তৃত্বের আনুগত্য করত যে, তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের [illegible] ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে না। তাদের কারো মন-মগজে এই ধারণা-অনুমান পর্যন্ত ছিল না যে, তারা কুরআনের নসের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন অথবা নির্দেশ দেয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে তাদের কারো মনে এরূপ দূরতম ধারণাও ছিল না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের নির্দেশদাতা ছিলেন, এবং আমরা আমাদের যুগের নির্দেশদাতা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর

শাসনকালে যে ফয়সালা দিয়েছেন তার নজীর অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই। তাঁর ইন্তেকালের পর যেদিন খেলাফত নামক সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করল, সেদিনই প্রথম খলীফা তাঁর ভাষণে ঘোষণা করলেনঃ

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ـ

"আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করব তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।"

উপরোক্ত ঘোষণা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, খেলাফতের সংস্থা কেবল এই উদ্দেশ্যেই কায়েম হয়েছিল যে, খলীফা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবেন এবং উম্মাত খলীফার আনুগত্য করবে। অন্য কথায় জনগণের জন্য খলীফার আনুগত্য ছিল শর্তসাপেক্ষ আর তা হচ্ছে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করবেন। এই শর্ত বিলীয়মান হয়ে গেলেই উম্মাতের উপর থেকে খলীফার আনুগত্য করার কর্তব্য আপনা আপনি অকেজো হয়ে যায়।

বিতর্কের সমাধানে সাধারণ জ্ঞানের দাবী

অতপর সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সামান্য চেষ্টা করে দেখুন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং তার দাবী কার্যত কিভাবে পূর্ণ হতে পারে। এই আয়াত গোটা মুসলিম সমাজকে সম্বোধন করে তাকে ক্রমিক পর্যায়ে তিনটি জিনিসের আনুগত্য করতে বাধ্য করে। প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য, অতপর তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং সমাজের মধ্য থেকে নির্বাচিত উলিল-আমরের আনুগত্য। বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে— এর ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু কর। এ থেকে আয়াতের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ পায় তা হচ্ছে—আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। আর উলিল-আমরের আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের অধীন। মতবিরোধ কেবল জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জনসাধারণ এবং উলিল-আমরের মধ্যেও মতবিরোধ হতে পারে। মতবিরোধের যাবতীয় ক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ উলিল-আমর নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল। তাঁদের যে নির্দেশ পাওয়া যাবে তার সামনে জনসাধারণকেও এবং উলিল-আমরকেও মাথা নত করতে হবে।

এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করার তাৎপর্য কি? একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ স্বয়ং সামনে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর সামনে মোকদ্দমা পেশ করে সিদ্ধান্ত হাসিল করা হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে জানতে হবে বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কি। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার তাৎপর্যও এই হতে পারে না যে, রসূলের সত্তার কাছ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত লাভ করতে হবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর কথা ও কাজ থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে হবে। এটাতো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায়ও সম্ভব ছিল না যে, এডেন থেকে তাবুক পর্যন্ত এবং বাহরাইন থেকে জেদ্দা পর্যন্ত গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নিজের প্রতিটি ব্যাপারের সিদ্ধান্ত সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করবে। এ যুগেও রসূলের সুন্নাতই নির্দেশের উৎস হয়ে থাকবে।

অতপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাত থেকে ফয়সালা হাসিল করার পন্থা কি হতে পারে? পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত মানুষই দেবে, কিতাব ও সুন্নাত নিজে তো আর বলবে না। কিন্তু অবশ্যই তাকে কিতাব ও সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আর কিতাব ও সুন্নাতের ভিত্তিতে ফয়সালাকারী অবশ্যই মতভেদে লিপ্ত পক্ষদ্বয় হতে পারে না, তাদের ছাড়া এমন কোন তৃতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থা হতে হবে, যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। কোন্ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে ফয়সালা দেয়ার জন্য কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হবে—তা বিতর্কের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। এক ধরনের মতবিরোধ এমন রয়েছে যার মীমাংসা যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি করতে পারে। অন্য এক ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হবে। আবার কতিপয় বিবাদের ধরন এমনও হতে পারে যার চূড়ান্ত ফয়সালা উলিল–আমর ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই ফয়সালার উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাত।

এই সেই কথা যা সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আয়াতের শব্দগুলোর উপর চিন্তা করে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে তার মন–মগজে কোনরূপ বক্রতা থাকবে না। এখন এটাও এক নজর দেখা যাক যে, এই আয়াতের পেশকৃত ব্যবস্থা এবং তার কার্যকর পন্থা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রসিদ্ধ পন্থা আমাদের কি সাহায্য করে। দুনিয়াতে আজ আইনের

রাজত্বের (Rule of Law) খুব চর্চা চলছে এবং বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সার্বভৌমত্ব (بالاتری) একান্ত অপরিহার্য। এর সামনে বড়-ছোট সবাই সমান বিবেচিত হবে এবং জনসাধারণ, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বয়ং সরকারের উপর নিরপেক্ষ পন্থায় কার্যকর হবে। একটি সংসদেরই এই আইন প্রণয়ন করা উচিৎ। কিন্তু যখন তা আইনে পরিণত হয়ে যাবে তখন এটা বলবৎ থাকা পর্যন্ত স্বয়ং সংসদকেও তার অনুসরণ করতে হবে। আইনের সার্বভৌমত্বের এই মতবাদকে যেখানেই বাস্তবরূপ দান করা হয়েছে, সেখানেই চারটি জিনিসের উপস্থিতি অপরিহার্য মনে করা হয়েছেঃ

১. এমন একটি সমাজ যা আইনের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল এবং তার আনুগত্য করার প্রকৃতই ইচ্ছা রাখে।

২. সমাজে এমন অনেক লোক থাকতে হবে যারা আইন সম্পর্কে অবগত, তারা জনগণকে আইনের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। এবং তাদের সামগ্রিক জ্ঞান ও প্রভাবের দরুন সমাজও আইনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারবে না এবং সরকারী কর্তৃপক্ষও আইনকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না।

৩. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ—যা জনসাধারণ, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মধ্যেকার বিবাদে আইন অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত দান করবে।

৪. একটি অতীব শক্তিশালী সংস্থা—যা সমাজে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সর্বশেষ সমাধান পেশ করবে এবং তা আইন হিসাবে সমাজে কার্যকর হবে।

এসব বিষয় সামনে রেখে যখন আপনি চিন্তা করবেন তখন জানতে পারবেন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত মূলত ইসলামী সমাজে আইনের নির্দেশ কায়েম করে এবং তাকে কার্যকর করার জন্য উল্লেখিত চারটি জিনিসের প্রয়োজন। যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, কুরআন যে আইনের নির্দেশ কায়েম করে সে মূলতই তার অধিকারী। আর দুনিয়াতে যে আইনের সার্বভৌমত্ব কায়েম করা হচ্ছে তা তার অধিকারী নয়। কুরআন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আইনকে সার্বভৌম আইন হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যার সামনে সবাইকে মাথা নত করে দিতে হবে এবং যার অধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সবাই সমান। তা এমন একটি সমাজকে সম্বোধন করে যা এই আইনের উপর ঈমান রাখে এবং নিজেদের বিবেকের দাবীতে তার আনুগত্য

করে। এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে—সমাজে আহলুয-যিক্‌রের এক ব্যাপক সংখ্যক লোক বর্তমান থাকবে, যাদের সাহায্যে সমাজের সদস্যগণ নিজেদের জীবনের ব্যাপারসমূহে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি মুহূর্তে এই সার্বভৌম আইন থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে থাকবে এবং যাদের মাধ্যমে জনমত এই ব্যবস্থার হেফাজতের জন্য সব সময় সজাগ থাকবে। এর আরো দাবী হচ্ছে এই যে, একটি বিচার ব্যবস্থা বর্তমান থাকতে হবে, যা শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয়, বরং জনসাধারণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাঝেও এই সার্বভৌম আইন মোতাবেক ফয়সালা করবে। তা উলিল-আমরের এমন একটি সংস্থারও দাবী করে, যে নিজেও এই সার্বভৌম আইনের অধীন হবে এবং সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এর অধীনে ইজতেহাদ করার সর্বশেষ এখতিয়ারও ব্যবহার করবে।

–(তরজমানুল কুরআন, রজব ১৩৭৭ এপ্রিল ১৯৫৮)

আইনের উৎস হিসাবে রসূলুল্লাহ(স)-এর সুন্নাত

[এই প্রবন্ধে জাষ্টিস এস. এ. রহমান সাহেবের একটি পত্রের উপর লেখকের পর্যালোচনা পেশ করা হচ্ছে। তরজ-মানুল কুরআনে পত্রলেখক ও প্রফেসর আবদুল হামীদ সিদ্দিকী সাহেবের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল এই চিঠি মূলতঃ তার একটি অংশ। এখানে সেই আলোচনা টেনে আনার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, এই প্রসংগে সুন্নাত (হাদীসে রসূল) সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় এসে গেছে তা থেকে সাধারণ পাঠকগণ যেন উপকৃত হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখকের মূল চিঠি এখানে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা এর সংশ্লিষ্ট অংশ আমাদের আলোচনায় এসে গেছে।]

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক নিজের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী যে ইংগিত দিয়েছেন তার মধ্যে তিন নং ধারাটি কিছুটা আলোচনার দাবী রাখে। কেননা নিজের বর্তমান সংক্ষিপ্ত আকারে তা অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য আমি এ সম্পর্কে কিছু কথা এই আশায় তার খেদমতে পেশ করতে চাচ্ছি যে, তিনি এর উপর গভীরভাবে চিন্তা করবেন।

সিদ্দিকী সাহেব মত প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগের ইমামদের রচিত ফিকহের উপর যদি পুনর্বার দৃষ্টিপাত করতে হয় তাহলে এর ভিত্তি শুধু এই হবে যে, তাদের কোন ইজতেহাদ ও ইস্তেম্বাত কুরআন ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক এ সম্পর্কে বলেনঃ

"কুরআনে হাকীম সম্পর্কে বলা যায়, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অধিকার অক্ষুন্ন রেখে প্রতিটি ব্যক্তি তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করবে, কিন্তু আপনি যেমন জানেন, সুন্নাতের ব্যাপারটি বিতর্কিত।"

উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এ ধারণা করা যায় যে, পত্রলেখকের মতে কুরআন তো অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ জানার জন্য প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র এবং

সনদ, কিন্তু সুন্নাতকে এই মর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে তার সংশয় রয়েছে। কেননা সুন্নাতের ব্যাপারটি বিতর্কিত। এখন তার কথায় এটা পরিষ্কার হচ্ছে না যে, এক্ষেত্রে কোন্ জিনিসটি বিতর্কিত?

সুন্নাতের আইনের উৎস হওয়াটা কি মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কিত ব্যাপার?

যদি তার কথার অর্থ এই হয় যে, সুন্নাতের (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও আদেশ-নিষেধ) সরাসরি আইনের উৎস এবং নির্দেশের কেন্দ্রস্থল হওয়াটাই বিতর্কিত, তাহলে আমি আরজ করব- এটা বাস্তবতার পরিপন্থী কথা। যেদিন থেকে মুসলিম উম্মাহ অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারটি কখনো মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কিত ছিল না। গোটা উম্মাত একথা মেনে নিয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তি, তাঁর নির্দেশের আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। যে পথে চলার জন্য তিনি নিজের কথা, কাজ ও অনুমোদনের[১] সাহায্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তার অনুবর্তন করতে আমরা আদিষ্ট এবং জীবনের যে ব্যাপারেই তিনি ফায়সালা দিয়েছেন সেখানে আমরা ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী নই। আমাদের জানা নেই যে, ইসলামের ইতিহাসের বিগত ১৩৮১ বছরে কে এবং কখন এ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছে। অদ্ভুত কথাবার্তা রচনা করার জন্য কিছু সংখ্যক উন্মাদ তো দুনিয়ার সর্বদা সব জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই ধরনের ব্যক্তিরা যদি কখনো জাতির স্বীকৃত নীতিসমূহের পরিপন্থী কোন কথা বলে দেয় তাহলে তার ভিত্তিতে একথা বলা ঠিক নয় যে, একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে, অতএব তা আর স্বীকৃত মূলনীতি থাকল না। এ ধরনের উন্মাদদের আক্রমণ থেকে তো কুরআন মজীদও রক্ষা পায়নি। তারা তো কুরআন বিকৃত হয়ে গেছে বলে দাবী করে বসেছে। এখন আমরা কি তাদের কারণে আল্লাহর কালামের মারজা এবং সনদ হওয়াটাকেও বিতর্কিত বলে মেনে নেব?

---

১. তাকরীর বা অনুমোদন বলতে বুঝায়—সমসাময়িক প্রচলিত কোন পন্থা বা পদ্ধতিকে বহাল রাখা, আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে দেখে নিষেধ না করা।

মতবিরোধের অবকাশ থাকাটা কি সুন্নাতের আইনের উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে?

কিন্তু বিতর্কিত সুন্নাত যদি স্বয়ং মারজা ও সনদ না হতে পারে, বরং যা কিছু মতভেদ হয়ে থাকে এবং হয়েছে তা এই বিষয়ে যে, কোন বিশেষ মাসআলার ক্ষেত্রে যে জিনিসের সুন্নাত হওয়ার দাবী করা হয়েছে তা মূলত প্রমাণিত সুন্নাত কিনা-তাহলে এরূপ মতভেদ তো কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রেও হয়েছে। প্রত্যেক আলেম ব্যক্তি এ বিতর্ক তুলতে পারে যে, কোন ব্যাপারে কুরআন থেকে যে নির্দেশ বের করা হচ্ছে তা মূলত এর থেকে বের হয় কিনা। পত্রলেখক নিজেই কুরআন মজীদের তাফসীর এবং তাবীরের ক্ষেত্রে মতবিরোধের উল্লেখ করেছেন। আর এই মতভেদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেও কুরআনকে মারজা এবং সনদ বলে স্বীকার করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, অনুরূপভাবে পৃথক মাসআলা সম্পর্কে সুন্নাতসমূহের প্রমাণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং 'সুন্নাতকে' মারজা এবং সনদ বলে স্বীকার করে নিতে তার দ্বিধা কেন?

একথা পত্রলেখকের মত একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের অজানা থাকতে পারে না যে, কুরআনের কোন নির্দেশের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে-যে ব্যক্তি, সংস্থা অথবা বিচারালয় তাফসীর ও তাবীলের প্রসিদ্ধ ও যুক্তিসংগত পন্থা ব্যবহার করার পর শেষে যে তাবীরকে নির্দেশের মূল লক্ষ্য সাব্যস্ত করবে, তার জ্ঞান ও কর্মপরিসর পর্যন্ত তা আল্লাহরই নির্দেশ, যদিও এ দাবী করা যায় না যে, বাস্তবেও তা আল্লাহর নির্দেশ। সম্পূর্ণ এইভাবে সুন্নাতের পর্যালোচনার ইলমী উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একজন ফকীহ অথবা গবেষক অথবা আদালতের কাছে যে সুন্নাতই প্রমাণিত হবে—তা তার জন্য রসূলের নির্দেশ গণ্য হবে। যদিও চূড়ান্তভাবে এটা বলা যেতে পারে না যে, বাস্তবিকপক্ষে রসূলের নির্দেশও তাই। এই উভয় অবস্থায়ই এটা তো অবশ্যই বিতর্কিত রয়ে যায় যে, আমার নিকট আল্লাহ অথবা রসূলের নির্দেশ কি এবং আপনার নিকট কি। কিন্তু যতক্ষণ আমি এবং আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সর্বশেষ সনদ (Final Authority) মানছি, আমাদের মাঝে এটা বিতর্কিত ব্যাপার হতে পারে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ সরাসরি আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধান। অতএব আমি জনাব এস. এ. রহমান সাহেবের একথা বুঝতে অপারগ যে, ফিকহের বিধান সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি কুরআনকে তো স্বউদ্দেশ্য নির্ধারণের বেলায় মতভেদ হতে পারে এবং হওয়া সত্ত্বেও মারজা এবং সনদ বলে স্বীকার করছেন, কিন্তু সুন্নাতকে এই মর্যাদা

দিতে তিনি এজন্য সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন যে, আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সুন্নাতসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং হতে পারে।

মওজু হাদীসের উপস্থিতি কি সত্যিই দুশ্চিন্তার কারণ?

সামনে অগ্রসর হয়ে পত্রলেখক সুন্নাতকে আইনের উৎস বলে স্বীকার না করার কারণ বর্ণনা করেছেনঃ "অসংখ্য মওজু হাদীস প্রচলিত হাদীস ভান্ডারের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।" সাথে সাথে তিনি আরো বলেন, "এই মওজু হাদীসের উপর প্রকান্ড বই-পুস্তকও রচিত হয়েছে।" প্রকাশ্যত এই কথার দ্বারা তিনি এই দাবী করছেন বলে ধারণা করা যায় যে, সুন্নাত একটি সংশয়পূর্ণ জিনিস। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের কারণেও এই সংশয় সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তার দাবী এটা নাও হতে পারে। কিন্তু তার দাবী যদি এই হয়ে থাকে তাহলে আমি আরজ করব, তিনি যেন এ ব্যাপারে আরো চিন্তা-ভাবনা করেন। ইনশাআল্লাহ তিনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন যে, তিনি যে জিনিসকে সুন্নাতের সংশয়পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ মনে করছেন তা মূলত সুন্নাতের সংরক্ষিত থাকার আস্থাই সৃষ্টি করে। আমি সামান্য সময়ের জন্য এ প্রশ্ন ছেড়ে দিচ্ছি যে, তা প্রচলিত হাদীসের কোন্ ভান্ডার যার সাথে মওজু হাদীস মিশ্রিত হয়ে গেছে। যদিও বিভিন্ন হাদীসবেত্তা যেসব সংকলনই তৈরী করেছেন, তাতে যথাসাধ্য যাচাই-বাছাই করে তাঁরা নির্ভরযোগ্য হাদীসই একত্র করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে সিহাহ সিত্তা ও ইমাম মালেকের মুয়াত্তার মর্যাদা যে কত উন্নত তা আলেম সমাজের কাছে গোপন নয়। তথাপি কিছু সময়ের জন্য আমরা যদি এটা মেনেও নেই যে, সব সংকলনের মধ্যেই কিছু না কিছু মওজু হাদীস ঢুকে পড়েছে, তাহলে একথা তো চিন্তা করার দাবী রাখে যে, পত্রলেখক যেসব বড় বড় কিতাবের উল্লেখ করেছেন তা শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়বস্তুর উপর রচিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, কোন্ সব হাদীস মওজু, কোন্ কোন্ রাবী মিথ্যুক এবং উদ্ভট হাদীস রচনাকারী, কোথায় কোথায় মওজু হাদীস ঢুকে পড়েছে, কোন্ কিতাবের কোন্ কোন্ হাদীস পরিত্যাগযোগ্য, কোন্ রাবীদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি এবং কাদের উপর নির্ভর করতে পারি না, মওজু হাদীসকে সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করার পন্থা কি, রিওয়ায়াতের নির্ভুলতা, দুর্বলতা, কারণ ইত্যাদির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে করা যায়। এই বিরাট গ্রন্থসমূহ

সম্পর্কে অবহিত হয়ে তো আমাদের এতটা আশ্বস্ত হওয়ার কথা নিম্নোক্ত খবর শুনে অ ন্না যতটা আশ্বস্ত হতে পারি যে, চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বড় বড় জেলখানায় ঢুকানো হয়েছে, চুরি যাওয়া অনেক মাল উদ্ধার করা হয়েছে এবং অনুসন্ধানের জন্য রীতিমত একটা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে—যার মাধ্যমে ভবিষ্যতেও চোরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। কিন্তু কারো জন্য যদি এই খবর উল্টা দুশ্চিন্তার কারণ হয় এবং সে এটাকে নিরাপত্তাহীনতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে থাকে তাহলে তা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হবে। চুরিই যদি কখনো সংঘটিত না হত তাহলে নিঃসন্দেহে এটা নিরাপত্তার পরিবেশের পক্ষে একটি বিরাট দৃষ্টান্ত হত। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে নিঃসন্দেহে কিছু না কিছু নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এখানে যার দাবী করছি, জীবনের কোন ব্যাপারে আমরা কি তদ্রূপ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারছি? যে অবস্থা ও পরিবেশের উপর আমরা দুনিয়ার জীবনে সাধারণতঃ আশ্বস্ত থাকি, তার জন্য এতটুকু নিরাপত্তাই যথেষ্ট যে, অধিকাংশ চোরকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হবে এবং যে সামান্য সংখ্যক চোর মুক্ত থাকবে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য যুক্তিসংগত ব্যবস্থা বর্তমান থাকবে। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত বিচারক সাহেব কি সুন্নাতের ব্যাপারে এতটা নিরাপত্তার উপর তুষ্ট হতে পারেন না? তিনি কি পরিপূর্ণ নিরাপত্তার চেয়ে কম কোন জিনিসের উপর সম্মত নন, যেখানে মূলতই চুরি সংঘটিত হওয়ার নাম–নিশানাই পাওয়া না যায়?

রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের মূলনীতি

সবশেষে পত্রলেখক বলেনঃ আমি "এ ব্যাপারেও চরম পন্থার (ইফরাত তাফরীত) প্রবক্তা নই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রীতিনীতি যার সম্পর্ক ইবাদতের পদ্ধতি—যেমন, নামায অথবা হজ্জের নিয়ম–কানুন ইত্যাদির সাথে রয়েছে–তার মর্যাদা নিরাপদ ও সুরক্ষিত। কিন্তু হাদীসের অবশিষ্ট ভান্ডারকে হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে রিওয়ায়াত দিরায়াতের মূলনীতির উপর পরখ করতে হবে। আমি ঐতিহাসিক সমালোচনার প্রবক্তা।"

এটা একটা সীমা পর্যন্ত সঠিক দৃষ্টিভংগী। কিন্তু এর মধ্যে কতিপয় বিষয় এমন রয়েছে যার উপর আরো অধিক চিন্তা–ভাবনা করার জন্য আমি পত্রলেখককে আহবান করব। তিনি যে ঐতিহাসিক সমালোচনার প্রবক্তা– হাদীস শাস্ত্র তো সেই সমালোচনারই দ্বিতীয় নাম, প্রথম হিজরী শতক থেকে আজ পর্যন্ত এই শাস্ত্রের এই সমালোচনাই চলছে। কোন ফিকাহবিদ অথবা মুহাদ্দিসই একথার প্রবক্তা ছিলেন না যে, ইবাদত হউক অথবা মুআমালাত

(আচার ব্যবহার ও লেনদেন) কোন মামলার ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগসূত্র স্থাপনকারী কোন রিওয়ায়াতকে ঐতিহাসিক সমালোচনা ছাড়াই হুজ্জাত হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। এই হাদীস শাস্ত্র বাস্তবে এই সমালোচনারই সর্বোত্তম নমুনা এবং বর্তমান যুগের উন্নত থেকে উন্নততর ঐতিহাসিক সমালোচনাকে অতি কষ্টেই এর উপর কোন সংযোজন অথবা উন্নতি (Improvement) বলা যেতে পারে। বরং আমি এটা বলতে পারি যে, মুহাদ্দিসদের সমালোচনার মূলনীতিসমূহ নিজের মধ্যে এতটা মাধুর্য ও সূক্ষ্মতা রাখে যে পর্যন্ত বর্তমান যুগের ইতিহাসের সমালোচকদের বুদ্ধিবৃত্তি এখনো পৌঁছেনি। এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে আমি প্রতিবাদের আশংকামুক্ত হয়েই বলব যে, দুনিয়াতে শুধু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও সীরাত (জীবন চরিত) এবং তাঁর যুগের ইতিহাসের রেকর্ডই এমন যা মুহাদ্দিসের গৃহীত এই কড়া সমালোচনার মানদণ্ডের পরীক্ষা সহ্য করতে পারে। অন্যথায় আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষ এবং কোন যুগের ইতিহাসও এমন উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকেনি যে, এই কঠোর মানদণ্ডের সামনে টিকে থাকতে পারে এবং তাকে সমর্থনযোগ্য ঐতিহাসিক রেকর্ড বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের আধুনিক যুগের শিক্ষিত সমাজ এই শাস্ত্রের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাধর্মী অধ্যয়ন করে না এবং প্রাচীনপন্থী আলেম সমাজ, যাদের এ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে—তারা এটাকে বর্তমান যুগের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে পেশ করতে অক্ষম। এ কারণে বাইরের লোক তো দূরের কথা, স্বয়ং আমাদের নিজেদের ঘরের লোকেরা আজ এর মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পারছে না। অন্যথায় বাস্তবিক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইলমে হাদীসের মধ্য থেকে কেবল হাদীসের ইল্লাত শাস্ত্রের ব্যাপক বিবরণ সামনে রেখে দিলেই দুনিয়া জানতে পারবে যে, ঐতিহাসিক সমালোচনা কি জিনিস।

তবুও আমি বলব যে, আরো অধিক সংশোধন ও উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। কোন ব্যক্তি এ দাবী করতে পারে না যে, রিওয়ায়াতসমূহ যাচাই-বাছাই করার যে মূলনীতি হাদীসবেত্তাগণ গ্রহণ করেছেন তাই সর্বশেষ কথা। আজ যদি কোন ব্যক্তি তাদের মূলনীতির উপর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তার মধ্যে কোন কমতি অথবা স্থবিরতা নির্ণয় করে এবং আরো অধিক সন্তোষজনক সমালোচনার জন্য যুক্তিসংগত প্রমাণের ভিত্তিতে আরো কতিপয় মূলনীতি সামনে নিয়ে আসে তাহলে নিশ্চিতই এটাকে স্বাগত জানানো হবে। আমাদের মধ্যে অবশেষে কে এটা চায় না যে, কোন জিনিসকে রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সাব্যস্ত করার পূর্বে তার প্রমাণিত সুন্নাত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে এবং কোন কাচাপাকা কথা যেন তার সাথে সংযুক্ত না হতে পারে।

রিওয়ায়াতের তাৎপর্য

হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই করার ব্যাপারে রিওয়ায়াতের সাথে দিরায়াতের (বিবেক-বুদ্ধি) ব্যবহারও একটি সর্বজন স্বীকৃত জিনিস। পত্রলেখকও দিরায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও দিরায়াতের অর্থ, মূলনীতি এবং সীমার ক্ষেত্রে ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই একমত এবং সাহাবাদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তার ব্যবহার হয়ে আসছে। অবশ্য এ প্রসংগে যে কথা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে—এবং আমি আশা করি পত্রলেখকেরও এ ব্যাপারে ভিন্নমত থাকবে না—তা হচ্ছে, কেবল এমন লোকদের দিরায়াত নির্ভরযোগ্য হতে পারে যাঁরা কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ফিকহের অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিজেদের জীবনের যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন, যাদের মধ্যে এক যুগের অনুশীলন একটি অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের মত অর্ন্তদৃষ্টি সৃষ্টি করে দিয়ে থাকবে এবং বিশেষ করে যাদের জ্ঞানবুদ্ধি ইসলামের চিন্তা ও কর্মব্যবস্থার চৌহদ্দির বাইরের মতবাদ, মূলনীতি এবং মূল্যবোধ নিয়ে ইসলামী রীতিনীতিকে তাদের মানদন্ডে যাচাই-বাছাই করার ঝোঁক প্রবণতা রাখে না। নিঃসন্দেহে আমরা জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যবহারের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারি না এবং কোন বক্তার জিহবাকেও টেনে ধরতে পারি না। কিন্তু যাই হোক একথা একান্ত সত্য যে, ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ লোক যদি আনাড়ীর মত কোন হাদীস নিজের মনপূত হলে কবুল করবে, আর কোন হাদীসকে নিজের মর্জির বিরোধী পেয়ে প্রত্যাখ্যান করতে থাকবে। অথবা ইসলামের পরিপন্থী অন্য কোন চিন্তা ও কর্মব্যবস্থার অধীনে প্রতিপালিত ব্যক্তিগণ হঠাৎ উত্থিত হয়ে আজগুবি মানদন্ডের আলোকে হাদীস ভান্ডারকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যবস্থা বিস্তৃত করে দেবে- মুসলিম মিল্লাতে তাদের দিরায়াত গৃহীতও হতে পারে না, এবং মিল্লাতের সামগ্রিক বিবেক এ ধরনের স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ফয়সালার উপর কখনো আশ্বস্ত হতে পারে না। ইসলামী পরিবেশের সীমার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান এবং ইসলামের মেজাজ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানই সঠিক কাজ করতে পারে। অদ্ভুত রং ও মেজাজের জ্ঞান অথবা প্রশিক্ষণহীন জ্ঞান বিভেদ-বিশৃংখলা ছড়ানো ব্যতীত কোন গঠনমূলক খেদমত এই পরিসরে আঞ্জাম দিতে পারে না।

সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ

মুহতারাম পত্রলেখক সুন্নাতের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, অর্থাৎ 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুন্নাত— যার সম্পর্ক ইবাদতের পন্থার সাথে এবং 'অবশিষ্ট সুন্নাত',–এর মধ্যে প্রথমোক্তগুলোকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ এবং শেষোক্তগুলোকে সমালোচনার মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করেছেন—এর সাথে একমত হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। বাস্তুত এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল রয়েছে তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদত সম্পর্কে যে পন্থা শিখিয়েছিলেন তা তো কার্যত উম্মাতের মধ্যে গতিশীল হয়ে রয়েছে এবং বংশ পরম্পরায় তার অনুসরণ করতে থেকেছে, এজন্য এই 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুন্নাত' সংরক্ষিত রয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকল জীবনের অন্যান্য ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স)–এর হেদায়াত কার্যতও জারি হয়নি, তার উপর কোন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও কাজ করেনি, তা হাটবাজারেও বলবৎ হয়নি এবং বিচারালয়েও তদনুযায়ী বিচার–ফয়সালা হয়নি। এজন্য তা বিভিন্ন লোকের সিনায় সিনায় রিওয়ায়াত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এগুলো এমন ভাণ্ডার যে, আজ অনেক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য জিনিস খুঁজে বের করতে হবে। সম্মানিত পত্রলেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি এছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব—যদি তিনি আমার ভুল ধারণা দূর করে দেন। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গী যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে আমি আরজ করব, তা সুন্নাতের ইতিহাসের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আসল সত্য এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতী যুগে মুসলমানদের জন্য কেবল একজন পীর ও মুরশিদ এবং বক্তা ছিলেন না, বরং কার্যত তাদের জামাআতের নেতা, পথপ্রদর্শক, রাষ্ট্রনায়ক, বিচারক, আইন প্রণেতা, মুরব্বি, শিক্ষক সব কিছুই ছিলেন এবং আকীদা–বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা থেকে নিয়ে বাস্তব জীবনের সর্বদিক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের গঠন তাঁরই বাতানো, শেখানো এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে হয়েছিল। অতএব এরূপ কখনো হয়নি যে, তিনি নামায, রোযা এবং হজ্জের নিয়ম–কানুনের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা মুসলমানদের মধ্যে গতিশীল হয়ে আছে, আর অবশিষ্ট ক্ষেত্রে মুসলমানরা ওয়াজ–নসীহত শুনেই থেকে যেত। বরং বাস্তবিকপক্ষে যা হয়েছে তা এই যে, তাঁর শেখানো নামায যেভাবে তৎক্ষণাৎ মসজিদে কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং তখন থেকে এর জামাআত কায়েম হতে থাকে, ঠিক

অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদী, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে তিনি যে বিধান নির্ধারণ করেন তদনুযায়ী মুসলিম পরিবারগুলোতে কাজ শুরু হয়ে যায়। লেনদেনের যে নিয়ম-কানুন তিনি নির্দিষ্ট করে দেন তা হাটবাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুসৃত হতে থাকে। তিনি মামলা-মোকদ্দমায় যে ফয়সালা করেছেন তা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের সাথে এবং যুদ্ধ জয়ের পর বিজিত এলাকার অধিবাসীদের সাথে তিনি যে ব্যবহার করেছেন তাই মুসলিম রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তিনি যে সুন্নাতের প্রচলন করেছিলেন অথবা প্রচলিত রীতিনীতির যে অংশকে তিনি বহাল রেখে ইসলামী নীতির অংশে পরিণত করে নিয়েছিলেন, ইসলামী সমাজ ও তার জীবন সার্বিকভাবে তার উপর কায়েম হয়েছিল। এ ছিল জ্ঞাত ও সুপরিচিত সুন্নাত, যার ভিত্তিতে মসজিদ থেকে নিয়ে পরিবার, বংশ, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, সরকারী প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের যাবতীয় সংস্থা রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই কার্য পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীকালে খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক সংস্থার কাঠামো তার উপর ভিত্তিশীল রয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতায় এক দিনের জন্যও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এরপর যদি কোন বিচ্ছিন্নতা এসে থাকে তাহলে সেটা কেবল সরকার ও বিচার ব্যবস্থা এবং জন আইনের সংস্থাসমূহের কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কারণেই হয়েছে। আপনি যদি "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুন্নাতের" সংরক্ষিত থাকার প্রবক্তা হয়ে থাকেন তাহলে ইবাদত ও মুআমালাত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। এ ব্যাপারে একদিকে হাদীসের সনদ পরম্পরায় বিশস্ত বর্ণনা এবং অপরদিকে উম্মাতের ধারাবাহিক আমল উভয়ই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। মুসলমানদের পথভ্রষ্টতার কারণে এর মধ্যে কখনো যে মিশ্রণ ঘটেছে, উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজ নিজ যুগে সময় মত তাকে 'বিদআত' হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের প্রায় প্রতিটি বিদআতের ইতিহাস বর্তমান রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন্ যুগ থেকে এর প্রচলন শুরু হয়েছে। প্রসিদ্ধ সুন্নাত থেকে এসব বিদআতকে পৃথক করা মুসলমানদের জন্য কখনো কষ্টকর ছিল না।

খবরে ওয়াহেদের মর্যাদা

এসব জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস ছাড়াও এমন এক প্রকারের হাদীস রয়েছে যা রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি এবং সাধারণ প্রচলন লাভ করতে পারেনি। এগুলো বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সিদ্ধান্ত, তাঁর বাণী, আদেশ-নিষেধ, আলোচনা ও অনুমতি অথবা আমলকে দেখে অথবা শুনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানে সঞ্চিত ছিল এবং সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি। এসব সুন্নাত ইবাদত ও মুআমালাত উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল। এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, এর সম্পর্ক কেবল মুআমালাতের সাথেই ছিল। এই সুন্নাতের জ্ঞান ভান্ডার যা বিভিন্ন লোকের কাছে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে উম্মাত তা সংগ্রহ করার কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দেয়। কেননা খলীফাগণ, প্রশাসক, বিচারক, মুফতী এবং জনগণ সবাই নিজ নিজ কর্মসীমার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে নিজের রায় বা ইজতেহাদের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা গ্রহণ করার পূর্বে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন পথনির্দেশ বর্তমান আছে কিনা তা অবগত হওয়া জরুরী মনে করতেন। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রতিটি লোকের অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল যার কাছে সুন্নাতের কোন জ্ঞান বর্তমান আছে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে এ ধরনের জ্ঞান বর্তমান ছিল তা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া নিজের জন্য ফরজ মনে করত। হাদীসের রিওয়ায়াতের এটাই সূচনাবিন্দু এবং ১১ হিজরী থেকে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত সুন্নাতগুলো একত্র করার কাজ অব্যাহত থাকে। জাল হাদীস (মওদুআত) রচনাকারী এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানোর যতই চেষ্টা করেছে তা প্রায় সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা যে সুন্নাতের সাহায্যে কোন অধিকার (হক) প্রতিষ্ঠা অথবা প্রত্যাখ্যাত হত, যার ভিত্তিতে কোন জিনিস হালাল অথবা হারাম সাব্যস্ত হত, যার দ্বারা কোন ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য প্রমাণিত হত অথবা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পেতে পারত, মোটকথা যেসব সুন্নাত আইন-কানুনের উৎস ছিল-সে সম্পর্কে কোন রাষ্ট্র সরকার, বিচার বিভাগ এবং ফতোয়া বিভাগ এতটা বেপরোয়া হতে পারত না যে, কোন ব্যক্তি এমনি উঠে দাঁড়িয়েই বলে দেবে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন", এবং কোন প্রশাসক, অথবা বিচারক অথবা মুফতী তা মেনে নিয়ে এর ভিত্তিতে কোন নির্দেশ জারী করবে। এজন্য আইন-কানুনের সাথে যেসব সুন্নাতের সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে পূর্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সমালোচনার ধারালো ছুরি দিয়ে তার অস্ত্রপচার করা

হয়েছে, রিওয়ায়াতের মূলনীতির উপরও তা পরখ করা হয়েছে এবং দিরায়াতের (বুদ্ধি-বিবেক) মূলনীতির উপরও। এবং যার ভিত্তিতে কোন রিওয়ায়াতকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেসব রিওয়ায়াতও জমা করে রেখে দেয়া হয়েছে—যাতে পরবর্তীকালেও যে কোন ব্যক্তি তা গ্রহণ বা প্রত্যাখান সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধানী রায় কায়েম করতে পারে। এই সুন্নাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পর্কে ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি অংশের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু লোক একটি জিনিসকে সুন্নাত হিসাবে মেনে নিয়েছেন এবং কিছু লোক মেনে নেননি। কিন্তু এ ধরনের যাবতীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। প্রতিটি দৃষ্টিকোণের প্রমাণ এবং যার উপর এই প্রমাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে হাদীস ও ফিকাহের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। কোন জিনিসের সুন্নাত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধানী মত প্রতিষ্ঠা করা আজো কোন বিশেষজ্ঞ আলেমের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এ কারণে আমার বুঝেই আসে না যে, সুন্নাতের নামে কারো আতংকিত হওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে। অবশ্য যেসব লোক হাদীসের এ বিভাগের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয় এবং শুধু দূর থেকে হাদীসের মধ্যেকার বিরোধের কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

আইন-বিধান সম্বলিত হাদীসের বিশেষ মর্যাদা

এ প্রসংগে এ কথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, হাদীস ভান্ডারের যে অংশ আইন-কানুনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং যার ধরন কেবল ঐতিহাসিক, অথবা যা ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মর্মস্পর্শী ঘটনা, মর্যাদা, গুণবৈশিষ্ট্য এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এতটা কঠোর পন্থা অবলম্বন করা হয়নি যা আইন-কানুন সম্বলিত হাদীসের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। এজন্য মওজু রিওয়ায়াত যদি ঢুকে পড়েই থাকে তাহলে উল্লেখিত অনুচ্ছেদসমূহে ঢুকতে পারে। আইন-কানুন সম্বলিত হাদীসসমূহকে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা রিওয়ায়াত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট রিওয়ায়াতের মধ্যে দুর্বল হাদীস তো অবশ্যই বর্তমান রয়েছে, কিন্তু অতি কষ্টেই এর মধ্যে মওজু হাদীস পাওয়া যেতে পারে। ফিকহের কোন মাযহাব দুর্বল হাদীসসমূহের মধ্য থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করে থাকলে তা কেবল এজন্য যে, তাদের মতে সেটা

কুরআনের সাথে, প্রসিদ্ধ সুন্নাতের সুপরিচিত ব্যবস্থার সাথে এবং শরীআতের সামগ্রিক মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ রিওয়ায়াতের দিক থেকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দিরায়াতের দিক থেকে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বর্তমান রয়েছে।

মুহতারাম পত্রলেখকের কয়েকটি ছত্রের উপর আমি এই বিস্তারিত আলোচনা এজন্যই করেছি যে, এই পংক্তিগুলো কোন সাধারণ মানুষের কলম থেকে বের হয়নি, বরং এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির কলম থেকে বের হয়েছে যিনি আমাদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির উচ্চ মর্যাদায় আসীন। সুন্নাতের শরঈ এবং আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখিত পদে আসীন ব্যক্তিত্বের রায়ের মধ্যে যদি কোন সামান্যতম দুর্বল দিক থেকে যায়, তাহলে তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী পরিণাম সৃষ্টি করতে পারে। নিকট অতীতে সুন্নাত সম্পর্কে বিচার বিভাগের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্যও সামনে এসেছে, যা সঠিক ইলমী দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্যে আমি চাই যে, আমি এই পর্যালোচনায় যে কথা পেশ করেছি তা কেবল সম্মানিত পত্রলেখকই নন, আমাদের বিচার বিভাগের অন্যান্য বিচারকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা অধ্যয়ন করবেন। আমাদের বিচার বিভাগের কাছে আমি এটাই আশা করি।

—(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮)

দীন ইসলামে প্রজ্ঞার ভূমিকা

ইসলামে প্রয়োজনীয়, সুবিধাজনক ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ এবং তার মূলনীতি

কর্মকৌশল সম্পর্কে
লেখকের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ

লেখকের বিগত একটি প্রবন্ধ "জামায়াতের ভূমিকা এবং কর্মপন্থা" শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি লিখেছেনঃ

"আপনি ১৩৭৬ হিজরীর রবিউস-সানী (ডিসেম্বর ১৯৫৬) মাসের তরজমানুল কুরআনে কোন এক ব্যক্তির দু'টি পত্রের জবাব দিয়েছেন। তাতে আপনি লিখেছেন, "আমরা আমাদের আন্দোলন শুন্যলোকে চালাচ্ছি না, বরং বাস্তব জগতেই পরিচালনা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য যদি কেবল হকের ঘোষণাই হত তাহলে শুধু নিরপেক্ষভাবে হক কথা বলাকেই যথেষ্ট মনে করতাম। কিন্তু আমাদেরকে যেহেতু হকের প্রতিষ্ঠার জন্যও চেষ্টা করতে হবে তাই এই বাস্তবতার জগতেই রাস্তা বের করতে হবে, এজন্য আমাদের আদর্শবাদ (Idealism) এবং কর্মকৌশলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে অগ্রসর হতে হয়।" ... "কর্মকৌশলই সিদ্ধান্ত নেয় যে, উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার জন্য রাস্তার কোন জিনিসকে সামনে অগ্রসর হওয়ার উপায় বানানো উচিৎ, কোন কোন সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, কোন কোন প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করাটাকে উদ্দেশ্যসম গুরুত্ব দেয়া উচিৎ এবং নিজেদের মূলনীতিসমূহের মধ্যে কোনটির ক্ষেত্রে অনমনীয় হওয়া উচিৎ এবং কোনটির ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক সার্থের খাতিরে প্রয়োজন মোতাবেক নমনীয়তায় সুযোগ বের করা উচিৎ।"

আদর্শবাদ এবং কর্মকৌশলের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কোন কোন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক কল্যাণের জন্য অথবা দীনী উদ্দেশ্যের

১. রাসায়েল- মাসায়েল, ৪র্থ খন্ড, 'ইসলামী আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র।

খাতিরে কতিপয় মূলনীতিতে নমনীয়তা সৃষ্টি করার উদাহরণ আপনি সুন্নাতে নববী থেকে পেশ করেছেনঃ "ইসলামী ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি ছিল এই যে, সমস্ত বংশগত ও গোত্রগত স্বাতন্ত্র্য খতম করে দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল হওয়া সব লোকদের সমান অধিকার দেয়া হবে.....কিন্তু যখন গোটা রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্ন আসলো, তখন রসূলুল্লাহ (স) পথনির্দেশ দিলেন "আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন"-"নেতা হবে কোরাইশদের মধ্য থেকে।" আপনি এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "এ সময় আরবের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোন অনারব ব্যক্তি তো দূরের কথা-কোন অকুরাইশী খলীফার খেলাফতও কার্যত ফলপ্রসূ হতে পারত না। এজন্য রসূলুল্লাহ (স) খেলাফতের ব্যাপারে সমতার এই সাধারণ মূলনীতির উপর আমল করা থেকে সাহাবাদের বিরত রাখলেন। কেননা রসূলুল্লাহ (স)-এর পরে যদি আরবেই ইসলামী ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে পড়ত তাহলে দুনিয়ায় ইকামতে দীনের দায়িত্ব কে পালন করত? এটা একথারই পরিষ্কার দৃষ্টান্ত যে, একটি মূলনীতি কায়েম করার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা যার ফলে দীনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে-তা শুধু কর্মকৌশলেরই নয়, হিকমতে দীনেরও পরিপন্থী।" এরপর আপনি লিখেছেন, "কিন্তু এই ব্যাপারটি ইসলামের মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক নয়। যেসব মূলনীতির উপর দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যেমন তৌহীদ, রিসালাত ইত্যাদি, তার মধ্যে কর্মগত সতর্কতার দিক থেকে নমনীয়তা সৃষ্টি করার কোন দৃষ্টান্ত রসূলুল্লাহ (স)- এর কর্মজীবনে পাওয়া যায় না, আর এর কল্পনাও করা যায় না।"

কতিপয় লোক আপনার এ ধরনের বক্তব্য নকল করে তা থেকে বিভিন্ন তাৎপর্য বের করে আপনার উপর বিভিন্ন রকম অভিযোগ আরোপ করেছে। যেমন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইকামতে দীনের নামে যে চিন্তা ও দর্শনকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে তার মূল্যায়ন করলে ঘটনা এই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার আন্দোলন চালিয়েছেন এবং এর কতিপয় মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কতিপয় মূলনীতি হচ্ছে-যা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, রিসালাতের উপর ঈমান ইত্যাদি....রসূলুল্লাহ -এর গোটা জীবনে এমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না যার মাধ্যমে নব মূলনীতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং ব্যতিক্রমের প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু এর সাথেই রসূলুল্লাহ (স) অন্য প্রকারের কতিপয় মূলনীতিও পেশ করেছেন। যেমন আমি

যে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করব তাতে প্রত্যেক সাদা-কালো এবং আরব-অনারব সবাই সমান মর্যাদা পাবে, সবাইকে জানমাল এবং ইজ্জত-আবরু হেফাজতের স্বাধীনতা দেয়া হবে ইত্যাদি....লোকেরা এসব মূলনীতিকে উপকারী মনে করল এবং ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য নিজেদের খেদমত পেশ করল....অবশেষে সেই সময় আসল যখন ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হল। এই স্তরে আন্দোলনের নেতা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন-তা ছিল এই যে, তিনি তাঁর আন্দোলনের প্রারম্ভে জনগণের সামনে যে আদর্শ পেশ করেছিলেন-তার প্রথমোক্ত শ্রেণীর (ঈমানিয়াত) মূলনীতি থেকে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলনীতি (যেমন সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, জান-মালের নিরাপত্তা ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনি ফয়সালা করে দিলেন যে, তার মধ্যেকার যে মূলনীতি কর্মকৌশলের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, অর্থাৎ যার উপর আমল করলে ইকামতে দীনের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে-তার মধ্যে ব্যতিক্রম এবং নমনীয়তা সৃষ্টি করে নিতে হবে।"

আরো অধিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে আপনার অভিমত এই সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, মনে হয় আপনি এই মূলনীতিকে দর্শন এবং আকীদা হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন যে, দাওয়াত এবং প্রচার যুগে ইসলামী ব্যবস্থার যে মূলনীতি বর্ণনা করা হবে এবং যার উপর লোকদের একত্র করা হবে, যখন ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার সময় আসবে তখন এই আন্দোলনের নেতার এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি তৌহীদ ও রিসালাতের মত বুনিয়াদী মূলনীতিসমূহ ব্যতীত আন্দোলনের স্বার্থে অন্য যে কোন মূলনীতিতে প্রয়োজনবোধে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে নেবে, এর উপর আমল করা থেকে নিজের দলকে বিরত রাখবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলন জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মধ্যে যে অংশকে তিনি আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করবেন তা পরিত্যাগ করবেন।"

আপনার এই মত নির্ধারণ করার পর ঐসব পত্র থেকে আপনার অপর একটি উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে, যাতে আপনি বলেছেনঃ "আমরা ইসলামের উদ্ভাবক তো নই যে, নিজেদের মর্জিমত কর্মসূচী প্রণয়ন করব এবং যে পন্থায় ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থ দেখতে পাব তা গ্রহণ করব।" এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, আপনার বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং আপনার দৃষ্টিভংগী একটি হেঁয়ালিতে পরিণত হয়েছে। পুনরায় এসব লোক এই হেঁয়ালির সমাধান করতে এবং এর পটভূমিকায় আপনার

মন-মানসিকতার গভীরতাকে অধ্যয়ন করতেও চেষ্টা করছে। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, আপনি পূর্বে কখনো ইসলামের সাথে একনিষ্ঠ ব্যবহার করে থাকলে তো করেছেন, কিন্তু পাকিস্তানী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার পর আপনি নিজের ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামকে কোরবানী দিয়েছেন। সুতরাং একদিকে আপনি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংবিধানের দাবীর সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ, কিন্তু অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আকাংখী। এজন্য উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ বহাল রাখার জন্য আপনি "যে রাষ্ট্রের সংবিধান এরূপ নয় তাতে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে না"-নিজের মূলনীতির মধ্যে নমনীয়তা সৃষ্টি করার তত্ত্ব পেশ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আপনার স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করার কারণ এই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় আপনার এবং আপনার সংগঠনের কোন ভবিষ্যত নেই। এ কারণে আপনি ইসলামের মৌলনীতির আশ্রয়নিচ্ছেন।

সম্প্রতি যেসব লোক জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের পৃথক হয়ে যাবার আসল ভিত্তিও এই বর্ণনা করা হয়েছিল যে, তাদের ধারণা মতেও বর্তমানে আপনার সামনে কেবল ক্ষমতা দখল করার প্রসংগ রয়েছে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনি যখন যে নীতি উপযুক্ত মনে করেন তাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যান, চাই তা ইসলামের মূলনীতির যতই পরিপন্থী হোক। এমনকি প্রয়োজনবোধে আপনি ইসলামের মূলনীতিসমূহের যেনতেন ব্যাখ্যা প্রদান করতেও পশ্চাৎপদ হবেন না। এই লোকদের বক্তব্য অনুযায়ী আপনার ইসলামী আন্দোলন এবং ভাগ্যান্বেষী রাজনীতিবিদদের আন্দোলনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যারা ক্ষমতা লাভের পূর্বে অত্যন্ত পূতপবিত্র মূলনীতি বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতা দখল করে নেয় তখন তারাও এসব ওয়াদা ও মূলনীতির পরিপন্থী কাজ করে এবং সাময়িক স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে নিজেদের সুবিবেচনা অনুযায়ী ইসলামের মূলনীতিসমূহের সংশোধন ও রহিতকরণ জায়েয মনে করে।

যাই হোক, এই ধরনের বিতর্ক ও অভিযোগ যেহেতু সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এর ফলে অসংখ্য লোক বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে তাই এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং জরুরী যে, আপনি একবার ভাল করে ব্যাখ্যা প্রদান করুন যে, আপনার আলোচ্য প্রবন্ধের সঠিক উদ্দেশ্য কি এবং জামায়াতের পলিসির বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ছড়ানো হয়েছে তার আসল রহস্য কি?"

লেখকের জবাব

আমার উল্লেখিত লেখাসমূহের যে সমালোচনা করা হয়েছে তা আমার নজরে আছে। কিন্তু আমি এর উপর তেমনি ধৈর্য ধারণ করেছি যেভাবে ইতিপূর্বে অনেক লোকের ফতোয়া, প্রচারপত্র ও পুস্তিকার সমালোচনার উপর ধৈর্য ধারণ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে সামান্য জীবন, লেখনিশক্তি ও আলোচনাশক্তি দান করেছেন তা আমি কল্যাণকর কোন কাজে ব্যয় করতে চাই। তাহলে দুনিয়াতে এর দ্বারা আল্লাহর দীনের কিছুটা খেদমতও হবে এবং আখেরাতে তা আমার গুনাহের কাফফারাও হয়ে যাবে। আমার জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার যে, এ সামান্য সময় এবং সামান্য শক্তি এমন সব বিতর্ক-বাহাসে ধ্বংস করব যার ফল হিসাবে দুনিয়াতে দীন ও দীনদার লোকদের অপমান এবং আখেরাতে অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছে না। আমার লেখাসমূহের উপর যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে তার জবাব দেয়ার চিন্তা এখনো আমার নেই। বরং শুধু নিজের দাবী পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, যাতে আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে তার মনের খটকা দূর হয়ে যাবে।

ঐসব বাক্যে আমার যা কিছু দাবী ছিল তা বুঝার জন্য একটি বাক্যই যথেষ্ট যা তাদের উদ্ধৃত বাক্যগুলোর মধ্যেই বর্তমান রয়েছেঃ "একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এতটা জেদ ধরা-যার ফলে ঐ মূলনীতির তুলনায় অধিক বেশী গুরুত্বপূর্ণ দীনী উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়-শুধু কর্মকৌশলেরই নয়, দীনের কৌশলেরও পরিপন্থী।"

যে ব্যক্তিই পক্ষপাতিত্ব ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করবে সে আমার উদ্দেশ্য অনুধাবনে ভুল করতে পারে না। আমি যা কিছু বলতে চাই তা এই যে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো প্রতিটি সঠিক মূলনীতি কায়েম করার এবং প্রতিটি ভ্রান্ত জিনিস পরিহার ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে ভাল-মন্দের সংঘাতে মানুষকে অনেক জায়গায় এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়-যেখানে একটি ক্ষুদ্র ভাল জিনিসের জন্য বাড়াবাড়ি করার ফলে একটি বৃহত্তর কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা একটি ছোট খারাপ জিনিস পরিহার করার ফলে একটি বড় অকল্যাণের সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বুদ্ধি-বিবেকের দাবীও হচ্ছে এই যে, একটি কম মূল্যবান জিনিসের জন্য একটি বহু মূল্যবান জিনিসকে উৎসর্গ করা যায় না। আল্লাহর শরীআতে যে কৌশল নির্ভরযোগ্য তার দাবীও এই যে, বৃহত্তর অকল্যাণ থেকে

বাঁচার জন্য ক্ষুদ্রতর অকল্যাণ সহ্য করা যেতে পারে এবং ক্ষুদ্রতর কল্যাণের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া যেতে পারে না।

এই ব্যাপারে আমি কেবল বুদ্ধিজ্ঞানকেই মানদন্ড বানানোর পক্ষপাতি নই যে, মানুষ যখনই চাইবে বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসলামের যে কোন মূলনীতি ও নির্দেশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বরং আমার উল্লেখিত বক্তব্যে একথা পরিষ্কার যে, আমি সেই কৌশলের সমর্থক–যা স্বয়ং ইসলামের দেয়া মানদন্ডে যাচাই করে দেখে যে, কোন্ জিনিসের জন্য কোন্ জিনিসকে কোথায় এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

এখন দেখুন, এটা কি আমার কোন মনগড়া কথা অথবা বাস্তবিকপক্ষে শরীআতী ব্যবস্থার মধ্যে তার নিজের শেখানো মূলনীতি, কায়দা–কানুন এবং আইন–বিধানের মধ্যে মূল্য ও মর্যাদার পার্থক্য আছে এবং এমন কোন মূলনীতি পাওয়া যায় কি যার বিচারে কম মূল্যবান জিনিসকে অধিক মূল্যবান জিনিসের জন্য কোরবানী করা জায়েয? কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের কার্যক্রম এবং ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসদের বক্তব্যের মধ্যে যদি এর দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা হয় তবে তার সংখ্যা অগণিত। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করব।

উদাহরণসমূহের আলোকে উল্লেখিত আলোচনা

১. ইসলামে একত্ববাদের স্বীকৃতির যে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে তা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গোপন নয়। এটা হক পরস্তিরও সর্বপ্রথম দাবী এবং প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির কাছে দীনেরও সর্বপ্রথম দাবী। তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবেই কোনরূপ নমনীয়তার অবকাশ থাকা উচিৎ নয়। একজন মুমিন ব্যক্তির কাজ এই যে, তার গলায় ছুরিই ধরা হোক, তার কন্ঠনালীই কেটে দেয়া হোক– সে তৌহীদের স্বীকৃতি ও তার ঘোষণা থেকে কখনও বিরত হবে না। কিন্তু যখন অত্যাচারী– স্বৈরাচারীদের যুলুমের শিকার হয়ে কোন ব্যক্তির জীবনের আশংকা হয়, অথবা তাকে অসহনীয় নির্যাতন করা হয়–কুরআন এই অবস্থায় কুফরী কলেমা বলে জীবন বাঁচানোর অনুমতি দেয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তার অন্তরে তখনো তৌহীদের আকীদা বদ্ধমূল থাকতে হবে–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ ـ النحل، ركوع ١٤)

'যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে (তবে কোন দোষ নেই)।"–(সূরা নহলঃ ১০৬)

এটা আযীমাতের (সংকল্পের) পর্যায় না হলেও অবশ্যই রুখসাতের (অনুমতির) পর্যায়। আর এই রুখসাত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, শরীআতের দৃষ্টিতে মুসলমানের প্রাণের মূল্য তৌহীদের প্রকাশ্য স্বীকৃতির তুলনায় অধিক। এমনকি যদি এই দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে কোরবানী করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে শরীআত তৌহীদের স্বীকৃতির কোরবানীকে বরদাশত করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জীবন বাঁচানোর জন্য কি কুফরের প্রচারও করা যেতে পারে? অপর কোন মুসলমানকে হত্যাও করা যেতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তিও করা যেতে পারে? এর উত্তর অপরিহার্যরূপেই নেতিবাচক। কেননা তা নিজের জীবনকে কোরবানী দেয়ার তুলনায় অনেক মূল্যবান জিনিসের কোরবানী হবে। কোন অবস্থায়ই এর অনুমতি দেয়া যায় না।

২. ইসলামে শরাব, শূকর, মৃতজীব, রক্ত এবং যেসব হালাল জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়–ঠিক তেমনি হারাম করা হয়েছে, যেমন হারাম করা হয়েছে যেনা, চুরি, ডাকাতি এবং নরহত্যাকে। কিন্তু কঠিন সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলে জীবন রক্ষার জন্য প্রথমোক্ত হারামের ক্ষেত্রে শরীআত রুখসাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। কেননা এ হারামগুলোর মূল্য জীবনের তুলনায় কম। কিন্তু কোন ব্যক্তির গলায় ছুরি ধরাই হোক না কেন, কোন স্ত্রীলোকের মান–সম্ভ্রম ও সতীত্বের উপর হাত দেয়া, অথবা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি শরীআত তাকে কখনো দান করে না। অনুরূপভাবে যত বড় সংকটাপন্ন অবস্থাই সামনে আসুক, শরীআত অন্যের ধনসম্পদ চুরি করে, লুন্ঠন করে বা ডাকাতি করে উদরপূর্তি করার রুখসাত (অনুমতি) দেয় না। কেননা এসব দুষ্কৃতি নিজের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার চাইতেও ভয়ংকর।

৩. সত্যনিষ্ঠা ও সারল্য ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তার দৃষ্টিতে মিথ্যাচার একটি ঘৃণ্যতম জিনিস। কিন্তু বাস্তব জীবনের এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় ব্যাপার রয়েছে, যার জন্য মিথ্যা বলার শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি, বরং কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা বলা অপরিহার্য বলে ফতোয়া পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, ঝগড়া–

বিবাদের নিষ্পত্তিকরণ এবং দাম্পত্য সম্পর্কের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য যদি কেবল সত্যকে গোপন করেই কাজ সমাধা না হয়, তাহলে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার পরিষ্কার অনুমতিও শরীআত দান করেছে। বরং যদি কোন সৈনিক শত্রুবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে যায় এবং তারা যদি তার কাছ থেকে মুসলিম বাহিনীর গোপন তথ্য জানতে চায় তখন আসল তথ্য বলা গুনাহ, বরং শত্রুর কাছে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে নিজের বাহিনীকে রক্ষা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যদি কোন স্বৈরাচারী যালেম কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় এবং সেই বেচারা কোথাও আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে সত্য কথা বলে তার গোপন অবস্থান বলে দেয়া গুনাহ এবং মিথ্যা বলে তার জান বাঁচানো ওয়াজিব। এ ব্যাপারে শরীআতের নির্দেশ নিম্নরূপঃ

عن ام كلثوم بنت عقبة بن معيط قالت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس
ويقول خيرا أفينمى خيرا (متفق عليه) وفى رواية مسلم زيادة
قالت ولم اسمعه يرخص فى شئ مما يقوله الناس الا فى ثلث
يعنى الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته
وحديث المرأة زوجها-

"উকবা ইবনে মুঈতের কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেয় এবং এ উদ্দেশ্যে কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং ভাল কথা বলে সে মিথ্যুক নয়।"

মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, রাবী বলেন, "মানুষের কথোপকথনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে শুনিনি, কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে, মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনে এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথনে ও স্বামীর কাছে স্ত্রীর কথনে" -(বুখারীঃ কিতাবুস সুলহি, মুসলিমঃ কিতাবুল বিররি, আবু দাউদঃ কিতাবুল আদাব, তিরমিযীঃ কিতাবুল বিররি)।

عن اسماء بنت يزيد عن النبى صلى الله عليه وسلم

لا يحل الكذب الا في ثلاث تحدث الرجل امرأته ليرضيها
والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس -

ইয়াযীদ কণ্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "মিথ্যা বলা জায়েয নয়, কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে অনুমতি আছে। স্ত্রীকে খুশী করার জন্য স্বামীর বক্তব্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বলা এবং লোকদের মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া"–(আবু দাউদ, তিরমিযী)।

এর বাস্তব উদাহরণও হাদীসে বর্তমান রয়েছে। ইহুদী নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার জন্য রসূলুল্লাহ (স) যখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নিয়োগ করলেন, তখন তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন, যদি কিছু মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হয়–নিতে পারব কি? রসূলুল্লাহ (স) পরিষ্কার বাক্যেই তাকে এর অনুমতি দেন–(বুখারীঃ বাবুল কিযবি ফিল হারবি এবং বাবুল ফিতকি বি–আহলিল হারব)।

খয়বরের যুদ্ধকালীন সময়ে হাজ্জাজ ইবনে ইলাত (রা) মক্কাবাসীদের কজা থেকে নিজের মালপত্র বের করে নিয়ে আসার জন্য রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাকেও অনুমতি দিলেন–(মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)।

এসব নযীরের ভিত্তিতে ফিকাহবিদগণ ও হাদীসবেত্তাগণ যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন– তাও দেখে নেয়া প্রয়োজন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন,

اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم
قتل رجل وهو مختف عنده فله ان ينفي كونه عنده ويحلف
على ذلك ولا يأثم - (فتح الباري - ج ٥ - ص ١٩٠)

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, কঠিন প্রয়োজন দেখা দিলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয। যেমন কোন স্বৈরাচারী যালেম যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় এবং সেই দুর্বল ও নির্যাতিত ব্যক্তি কারো কাছে আত্মগোপন করে থাকে– তাহলে আশ্রয়দাতার এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার কাছে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতির কথা অস্বীকার করবে। প্রয়োজনবোধে সে মিথ্যা শপথও করতে পারবে। এজন্য সে গুনাহগার হবে না।"–(ফাতহুল বারী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৯০)

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহ) হাজ্জাজ ইবনে ইলাত সুলামী (রা)-র ঘটনা বর্ণনা করার পর তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেনঃ

ومنها جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره اذا لم
يتضمن ضرر ذالك الغير اذا كان يتوصل بالكذب الى حقه -
(زاد المعاد، ج ٢- ص ٢٠٣)

"এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি তার নিজের অথবা অন্যের জন্য মিথ্যা বলতে পারে যদি তার ফলে অপর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং এই মিথ্যার সাহায্যে সে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে।"

–(যাদুল মাআদ, ২য় খন্ড, পৃ ২০৩)।

আল্লামা ইমাম নববী (রহ) তাঁর 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে হাদীসসমূহ থেকে যুক্তিপ্রমাণ গ্রহণ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত মূলনীতি বর্ণনা করেনঃ

كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم
الكذب فيه وان لم يمكن تحصيله الا بالكذب جاز الكذب ثم ان
كان تحصيل ذالك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وان كان
واجبا كان الكذب واجبا - (باب تحريم الكذب)

"যে কোন সৎ উদ্দেশ্য যা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়াই লাভ করা সম্ভব–তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলা হারাম। কিন্তু তা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয় তাহলে মিথ্যা বলা জায়েয। আর এই উদ্দেশ্য যদি মুবাহ পর্যায়ের হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য মিথ্যা বলাও মুবাহ। আর তা অর্জন করা যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য মিথ্যা কথা বলাও অত্যাবশ্যক।" –(অনুচ্ছেদঃ মিথ্যা বলা হারাম)

গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে এখানেও সেই একই মূলনীতি কার্যকর দেখা যায় যে, সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা পরিহার করার একটি নৈতিক মূল্য রয়েছে। এর চেয়েও অধিক মূল্যবান জিনিসের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তুলনামূলকভাবে কম মূল্যবান জিনিসের ক্ষতি স্বীকার করা যেতে পারে, এবং কোন কোন অবস্থায় ক্ষতি স্বীকার করা উচিৎ।

৪. ইসলামে গীবতকে (পরচর্চা) যে কত কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায়ঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে।"–(সূরা হুজুরাতঃ ১২)

কিন্তু কে না জানে, হাদীসবেত্তাগণ হাদীসের যথার্থতা নিরূপণের জন্য হাজার হাজার রাবীর সমালোচনা করেছেন। আর এইসব কাজগুলো ছিল সম্পূর্ণরূপে গীবত। তা জায়েয হওয়ার সমর্থনে এ ছাড়া কি আর কোন দলীল পেশ করা যাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভ্রান্ত কথা সম্পৃক্ত করা এবং দীনের মধ্যে তাঁর বরাত দিয়ে এমন কথার প্রচলন করা যা তিনি বলেননি–গীবতের তুলনায় অনেক বড় দুষ্কৃতি ছিল, তাই এই বড় দুষ্কৃতি থেকে বাঁচার জন্য এই ছোট দুষ্কর্মকে গ্রহণ করা শুধু জায়েযই ছিল না, বরং ওয়াজিব ছিল। অনুরূপভাবে কোন ভদ্র ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে নিজের কন্যার বিবাহ দিতে যাচ্ছে, অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে যাচ্ছে, আর আপনার জানা আছে যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তি চরিত্রহীন এবং তার লেনদেন সন্তোষজনক নয়, তখন তার কুখ্যাতির কথা বলে দেয়া শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা একটি নিরিহ মেয়ের জীবন নষ্ট হওয়া এবং এক ভদ্র ব্যক্তির এক বেঈমানের ফাঁদে আটকে যাওয়াটা গীবতের ধ্বংসকারিতার তুলনায় অধিক বড় ধ্বংসাত্মক ব্যাপার।

৫. অ–মুহ্‌রিম কোন মহিলাকে উলংগ করা ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকে চূড়ান্তভাবেই হারাম। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রা) যে স্ত্রীলোকটির মাধ্যমে মক্কাবাসীদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাকে হযরত আলী (রা) পথিমধ্যে গ্রেপ্তার করেন এবং চিঠি উদ্ধারের জন্য তাকে উলংগ করার হুমকি দেন। ইবনে কাইয়েম (রহ) এই ঘটনা থেকে যে সিদ্ধান্ত বের করেন তা এই যে, "ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার খাতিরে অনুসন্ধানকার্য চালানোর প্রয়োজন দেখা দিলে স্ত্রীলোককে অনাবৃত করা যেতে পারে" (যাদুল মাআদ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৯)।

৬. ইসলামে নামাযের যে কি পরিমাণ গুরুত্ব রয়েছে তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের একটি বিবাদের মীমাংসা করানোর জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে যান। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। এদিকে রসূলুল্লাহ (স) বিবাদ নিষ্পত্তির কাজে ব্যস্ত থাকলেন।

অবশেষে হযরত আবু বাকর (রা)-র ইমামতিতে লোকেরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (স) পরে এসে জামাআতে শরীক হন (মুসলিম)।

৭. দুষ্কৃতির প্রত্যাখ্যান ইসলামী শরীআতের নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের জোরালো নির্দেশসমূহ কারো অজানা নয়। কিন্তু এ জিনিস (প্রত্যাখ্যান) যদি একটি সাধারণ দুষ্কর্মের স্থলে একটি মারাত্মক দুষ্কর্মের সূত্রপাত ঘটাতে পারে বলে দৃষ্টিগোচর হয় তবে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই করণে ফাসেক- ফাজের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন এবং হুকুম দিয়েছেনঃ

من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته -

"কোন ব্যক্তি যদি তার আমীরের (রাষ্ট্রনেতা) দ্বারা এমন কাজ হতে দেখে যা সে পছন্দ করে না, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং তার আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে না নেয়।"

৮. হদ (শাস্তির দণ্ড) কায়েম করার জন্য ইসলামে যেরূপ কঠোর তাগিদপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে তা কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি না জানে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে চোরদের হাত কাটতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ) এবং হযরত উমার (রা) তাঁর খেলাফতকালে অধ্যাদেশ জারি করেন যে, যখন কোন বাহিনী শত্রু এলাকায় যুদ্ধরত থাকে, তখন সেখানে কোন মুসলমানের হদ কার্যকর করা যাবে না। কেননা এতে আশংকা ছিল যে, কোন ব্যক্তির উপর জাহিলী যুগের শত্রুতা প্রবল হয়ে না যায় এবং সে গিয়ে শত্রুবাহিনীর সাথে মিলিত না হয় (ইলামুল মুকিঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১-৩৩)।

এই ব্যাপারটি যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফকের (আয়েশার (রা)-র উপর মিথ্যা অপবাদ রটানোর) ঘটনায় তিনজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের উপর কযফের শাস্তি কার্যকর করেন, কিন্তু মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ছেড়ে দেন। ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, "রসূলুল্লাহ (স) তার উপর হদ জারি করা থেকে এমন একটি সামগ্রিক স্বার্থের খাতিরে বিরত থেকেছেন যা হদ কার্যকর করার তুলনায় অধিকতর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা ছিল সেই সামগ্রিক স্বার্থ, যার ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (স) ইতিপূর্বেও-তার নিফাক পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ার পর এবং

তার অনেক হত্যার উপযোগী কথাবার্তা শুনা সত্ত্বেও–তাকে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। সেই স্বার্থ এই ছিল যে, এই ব্যক্তি নিজের গোত্রে খুবই প্রভাবশালী ছিল, তারা তার কথা মান্য করত। তার উপর হদ কার্যকর করলে বিবাদ-বিশৃংখলা দেখা দেয়ার আশংকা ছিল। এজন্য রসূলুল্লাহ (স) তার গোত্রের লোকদের মনস্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিলেন এবং তার উপর হদ কার্যকর করে তার গোত্রের লোকদের ইসলামের প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন করে তোলা যুক্তিসংগত মনে করেননি–" (যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১)।

৯. গনীমতের মালে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত লোকের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং এটা তাদের মধ্যে সমান অংশে বন্টিত হওয়া উচিৎ। এ ব্যাপারে শরীআতের নির্দেশ সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। ইনসাফের দাবীও তাই। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওতাস যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে কোরাইশ ও অপরাপর গোত্রের লোকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাদেরকে উন্মুক্ত হস্তে উপঢৌকন দান করেন এবং আনসারদের কিছুই দেননি। আনসারগণ এজন্য কঠিন অভিযোগ করল। তখন রসূলুল্লাহ (স) এই কাজের পরিণামদর্শিতা এই বর্ণনা করলেন যে, এই লোকেরা মনস্তুষ্টির মুখাপেক্ষী, তাই এই পার্থিব সম্পদ তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير
وترجعون برسول الله الى رحالكم

"হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এর ওপর সন্তুষ্ট হবে না যে, লোকেরা উট-বকরী নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে?"

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দীনের যাবতীয় মূলনীতি এবং নির্দেশ নিজের মূল্য ও মর্যাদা এবং ওজনের দিক থেকে এক সমান নয়। বরং এর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে এবং দীনের প্রতিটি নীতি অনমনীয় নয়, বরং তার অসংখ্য নীতির মধ্যে নমনীয়তা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি এই যে, একটি ছোট নেক কাজ করতে গিয়ে যদি বড় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তা ত্যাগ করা উত্তম। আর যদি কোন ছোট অপরাধ বড় নেক কাজ অথবা দীনের মহান স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে সেটা গ্রহণ করে নেয়া উত্তম। আর যদি দুটি খারাপ কাজের কোন একটির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়াটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে অপেক্ষাকৃত ছোট খারাপ কাজটি গ্রহণ করা উচিৎ।

এর সাথে সাথে উল্লেখিত উদাহরণগুলো থেকে এটাও জানা যায় যে, শরীআতের ব্যবস্থায় মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মানদণ্ড কি, কোন ধরনের জিনিসের উপর কোন ধরনের জিনিসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন মূল্যবোধ এমন পর্যায়ের যার চেয়ে উন্নত কোন মূল্যবোধ আর নেই –যার জন্য তা কোরবানী করা যেতে পারে। আমি আলোচিত বাক্যগুলোতে যা কিছু লিখেছিলাম, এসব কিছুই ছিল তার ভিত্তি। এখন যেসব লোক নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ আবিষ্কার করে নিয়েছে এবং সেগুলোকে আমার অভিমত সাব্যস্ত করে আমার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ঘৃণ্য অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তাদের কথা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। নিজেদের এই কথার জন্য তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

'আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন' থেকে আমি যে দলীল গ্রহণ করেছি তার যে সমালোচনা করা হয়েছে–এ সম্পর্কে আমি কেবল এতটুকুই বলব যে, তরজমানুল কুরআনের ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় আমি সংক্ষেপে যা কিছু লিখেছিলাম[১] তা ১৯৪৬ সনের এপ্রিল সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে বিশদভাবে লিখেছিলাম এবং তা আমার রাসায়েল ও মাসায়েল নামক পুস্তকের প্রথম খন্ডের প্রষ্ঠাগুলোতে ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বর্তমান ছিল। কিন্তু তা থেকে কখনো এমন কীটপতংগ বের হয়নি, যা ১৯৫৬ সনের তরজমানুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে সহসা বের হয়ে আসতে শুরু করল। এর কারণ কি? তা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিকই ভাল জানেন এবং তাঁর জানাটাই যথেষ্ট। যাই হোক একথা তো সব জ্ঞানপিপাসুর অবগত হওয়া উচিত যে, যেসব হাদীসের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (স)–এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য কোরাইশদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়, সেসব হাদীসের বিশ্বস্ততা অস্বীকার করা যায় কি? এই ঘটনা কি অস্বীকার করা যায় যে, সাকীফায়ে বনি সায়েদার সময় থেকে শুরু করে কয়েক শত বছর পর্যন্ত ঐসব হাদীসের ভিত্তিতে কোরাইশদেরকে খেলাফতের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছিল, এমনকি এক দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের ফিকাহবিদগণও খেলাফতের অধিকারী হওয়ার জন্য কোরাইশ বংশভূত হওয়াকে শর্ত মনে করতেন? অথবা ঐসব হাদীস এবং ঘটনাবলীর সঠিকতা স্বীকার করে নেয়ার পর কি ঐসব আপত্তি তোলা হয়েছে–যা প্রশ্নকারী নিজের প্রশ্নের মধ্যে আপত্তি উত্থাপনকারীদের বক্তব্য থেকে নকল করেছেন? যদি প্রথম কথাটি ধরে নেয়া হয়, তবে ঐসব হাদীস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা হওয়া উচিৎ। তাহলে আমাদের মত অনবহিত লোকদের জ্ঞানভাণ্ডার কিছুটা

প্রসারিত হবে। আর যদি দ্বিতীয় কথাটি ধরে নেয়া হয় তাহলে পুনরায় চিন্তা করা উচিৎ যে, এই অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু আসলে কে এবং আমার বিরুদ্ধে এই আবর্জনার ছিটা মূলত কার পবিত্র আঁচলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে?

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মরণযোগ্য। এই আলোচনা মূলত এভাবে শুরু হয়েছিল যে, জামায়াতে ইসলামী ১৯৫০–৫১ সনের নির্বাচনের সময় একটি পলিসি ঘোষণা করেছিল। আর তা ছিল এই যে, প্রার্থী হওয়া যেহেতু ইসলামে জায়েয নয়, এজন্য আমরা নিজেরাও প্রার্থী হতে পারি না এবং কোন প্রার্থীকে ভোটও দেব না।

পরে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, বর্তমানে আমরা এমন অবস্থানে নেই যে–প্রতিটি উপনির্বাচন এবং সাধারণ নির্বাচনে গোটা দেশের প্রতিটি আসনের জন্য আমাদের বাঞ্ছিত মানদন্ড অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করাতে পারি। এই অবস্থায় সাধারণত তিন ধরনের লোক ময়দানে আসে। এক ধরনের লোক হচ্ছে যারা মূলতই ইসলামী ব্যবস্থার বিরোধী এবং দেশকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে–যারা ইসলামী ব্যবস্থার তো বিরোধিতা করে না, কিন্তু তার সাহায্যের বেলায় অতী কষ্টেই তাদেরকে একনিষ্ঠ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে এবং নিজেদের কার্যকলাপের দৃষ্টিতেও তারা নির্ভরযোগ্য নয়। তৃতীয় ধরনের লোক হচ্ছে– যাদের আঁচলও গর্হিত কাজে কালিমালিপ্ত হয়নি এবং ইসলামী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের একনিষ্ঠতার উপরও সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা তাদের সবার মধ্যেই বর্তমান দেখা যায়। কেননা আমাদের দেশে এই পন্থাই চলে আসছে এবং এখানকার আলেম সমাজ পর্যন্ত প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোকে খারাপ কিছু মনে করে না। বরং ফিকহী দিক থেকেও এই ধরনের প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারটি নাজায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক আলেমের দ্বিমত রয়েছে।

এখন আমরা যদি জেদ ধরি যে, এই তিন ধরনের প্রার্থীর সাথে একইরূপ ব্যবহার করব এবং সবার পক্ষে নিজেদের ভোট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব তাহলে ফল এই দাঁড়াবে যে, আমরা প্রথমোক্ত দুই প্রকারের লোকদের বিজয়ের জন্য রাস্তা সমতল করে দেব এবং তৃতীয় ধরনের লোকদের সাথে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার প্রচেষ্টায় অতি কষ্টেই আমাদের সাহায্য–সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে পারব। এভাবে আমরা একটি তুলনামূলকভাবে ছোট স্তরের এবং আনুসঙ্গিক সংশোধনের (প্রার্থী হওয়ার অবৈধতা) খাতিরে

এক বড় জিনিসের (গোটা দেশে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা) ক্ষতি সাধন করার অপরাধে অপরাধী হব। অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থী হওয়ার পদ্ধতির সংস্কার উদ্দেশ্যের দিক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এটা কায়েম হয়ে যাবার পর অন্য সব জিনিসের সংশোধনের সাথে সাথে প্রার্থী হওয়ার প্রথারও সংস্কার হতে পারে।
এরই ভিত্তিতে আমরা নিজেদের পূর্ববর্তী পলিসির মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছি যে, আমরা নিজেরা তো পদপ্রার্থী হওয়া থেকে রীতিমত দূরে থাকব, কিন্তু বিকৃতি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং এর পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে উত্তম ও ইসলামী ব্যবস্থার সহায়ক উপাদানসমূহকে অগ্রবর্তী করার জন্য যেসব প্রার্থীর সমর্থন করা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে–তাদেরকে ভোট দেবও এবং দেওয়াবও।

উপরে আমি ইসলামের নির্দেশসমূহের যে ব্যাখ্যা করেছি তা দেখে প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষ একই দৃষ্টিতে অনুভব করবে যে, আমাদের নতুন পলিসি হুবহু দীনী মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর মধ্যে আদৌ কোন মূলনীতি লংঘন করা হয়নি যার লংঘন সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তুফান সৃষ্টি করা হল যে, তুমি নিজের লালসা–বাসনা এবং স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদেরই স্বীকৃত মূলনীতি লংঘন করার জন্য নেমে পড়েছ এবং তোমার সামনে এখন শুধু ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন–যা অর্জনের জন্য তুমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন যে, জ্ঞানবুদ্ধির দৈন্যতার কারণেই এসব কথা বলা হচ্ছে অথবা তাদের তৎপরতার পেছনে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

–(তরজমানুল কুরআন, শা'বান ১৩৭৭ হিজরী, খৃ. মে, ১৯৫৮ খৃ.)

দীন ইসলামে কর্মকৌশলের গুরুত্ব

প্রবন্ধকার ও তাঁর কতিপয় সমালোচনাকারীর মধ্যে যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছিল, নিম্নের প্রবন্ধটি তারই ঐকতান। অতএব এক ব্যক্তি প্রবন্ধকারকে একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ

"দীন ইসলামে কর্মকৌশলের গুরুত্ব" সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লাহোর "আল-ফোরকান" পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, যার শেষ কিস্তি উক্ত পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় এসে গেছে। জানি না প্রবন্ধটি আপনার নজরে পড়েছে কিনা। কিন্তু এই প্রবন্ধের দুই-একটি কথার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

উল্লেখিত প্রবন্ধের সাথে অনেক জায়গায় আমার মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু "আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন" এবং তরজমানুল কুরআনের যে সংখ্যায় "কিয়া দীনকে সবহি উসূল বেলচক হায়" প্রবন্ধের অধীনে দেয়া নতুন উদাহরণসমূহের সমালোচনা জীবন্ত মনে হয়েছে। শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আপনার দেয়া উদাহরণসমূহ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনুমতি, সাময়িক রুখসাত এবং কঠিন পরিস্থিতির আওতায় প্রযোজ্য হয়ে থাকে এবং ইকামতে দীনের প্রচেষ্টার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রবন্ধের আরেকটি কথার সাথে আমার ঐক্যমত রয়েছে। তা এই যে, আমার মনে হয় আপনি 'কর্মকৌশল সম্পর্কিত কথা' কয়েকটি আনুসঙ্গিক বিষয়ে যেমন "নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার প্রথা" এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে সহযোগিতা ইত্যাদির ব্যাপারে বলেছেন। কিন্তু আপনি যে ভংগীতে এর সপক্ষে রসূলের জীবনাদর্শ থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন (যা প্রবন্ধকারের মতে সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক) তার দ্বারা অবিবেচক ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য দীনের মধ্যে মতলব হাসিলের সুযোগ করে দেয় এবং তা বিপর্যয়ের অসংখ্য দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। নিজের এই আশংকার সমর্থনে প্রবন্ধকার পত্রিকার একই সংখ্যায় "আল-মুনীর"-এর বরাত দিয়ে "ভোটক্রয়" সম্পর্কে একটি বাস্তব উদাহরণও পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি "আল-মুনীরের" সম্পাদক সাহেবকে লিখেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) মন জয়ের (তালীফুল কলব) ক্ষেত্রে যখন লোকদের ঈমান ক্রয় করতেন, তখন ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

ভোটক্রয় সম্পূর্ণ জায়েয। ভোট ক্রেতার হাতে যদি প্রচুর অর্থের সমাগম হয় তাহলে সে সকলের ভোট ক্রয় করে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করবে....। প্রবন্ধকারের বক্তব্য হচ্ছে, আপনার "কর্মকৌশল" সম্পর্কিত প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা যদি এতটা নীচে পর্যন্ত নেমে যেতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে তারা বিভিন্ন পন্থায় এই প্রকারের দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দীনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিতে পারে।

আপনার বক্তব্য হচ্ছে, দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামে তৌহীদ, রিসালাত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ ছাড়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে সময়—সুযোগ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই শর্তে উপেক্ষা করা যেতে পারে যদি তার উপর আমল করতে গেলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

আর জামায়াত-বিরোধী লোকদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি দীন কায়েমই হয় তাহলে তার সার্বিক মূলনীতি অটুট রেখেই কায়েম হবে। অন্যথায় এ ধরনের কোন আন্দোলনে যদি কোন মূলনীতি বিসর্জন দেয়া হয়, তাহলে এটা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নয়। যদি এই ধরনের আন্দোলন সফলকামও হয়, তাহলে ইসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যবস্থাই কায়েম হবে.... পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপও যদি এরূপ করতে বাধ্য করে, তাহলে দীনের প্রেমিকদের এই সার্বিক মূলনীতিসহ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর থাকা উচিত। অথবা তাদেরকে দীন থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

মোটকথা প্রবন্ধকারের যুক্তি এই যে, দীনের আদেশ-নির্দেশের মধ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের সংকোটাবস্থা এবং ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য ব্যতিক্রম তো হতে পারে, কিন্তু দীনী উদ্দেশ্য এবং দীনের সার্বিক কল্যাণের জন্য এই ধরনের ব্যতিক্রমের কোন সুযোগ নেই।

সমস্যার সম্পর্ক যেহেতু "দীনের দাওয়াত ও তার কর্মপন্থা"র মৌলিক বিষয়ের সাথে রয়েছে, এজন্য যেসব লোক জামায়াতে ইসলামীর অন্ধ সমর্থকও নয় এবং চরম বিদ্বেষীও নয়, তারা বাস্তবিকপক্ষেই ব্যাপারটি বুঝতে চায়। এ ব্যাপারে ডিসেম্বর এবং মে মাসের তরজমানুল কুরআনের 'রাসায়েল-মাসায়েল' শিরোনামের অধীনে আপনার দেয়া জবাব পূর্ণ পে সন্তোষজনক নয়। এজন্য আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে, আপনি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাদের কর্মনীতির দৃষ্টান্ত সম্বলিত একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করে তা তরজমানুল কুরআনে পত্রস্থ করুন। এই প্রবন্ধের কলেবর ইকামতে দীনের

সার্বিক চেষ্টা-সাধনার গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং উদাহরণগুলোও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাহলে এটা একদিকে অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাবে, অপরদিকে জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মানসিক অস্বস্তি দূর করতে সক্ষম হবে। সাংগঠনিক দিকটি ছাড়াও ইলমী দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।"

লেখকের জবাব

আল-ফোরকান পত্রিকার যে আলোচনার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তার লক্ষ্যস্থল ও ধরন থেকে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, আলোচনার আসল বুনিয়াদ স্বয়ং এই বিষয়টি নয়; বরং মনের একটি পুরাতন উষ্মা যা দীর্ঘকাল ধরে সুযোগের অপেক্ষায় প্রদমিত অবস্থায় ছিল এবং এখন তা প্রকাশ করার জন্য কিছু বিষয়কে অভিসন্ধি হিসাবে তালাশ করে নেয়া হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এই সংকল্প নিয়ে উঠেপড়ে লেগে যায় যে, অমুক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতেই হবে তাহলে দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নাই-যে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আপনি যত বড় প্রাচীন অথবা আধুনিক লেখকের নামই উচ্চারণ করুন—আমি আপনাকে বলে দিতে পারব যে, অভিযুক্ত সাব্যস্ত করার সংকল্প করে নেয়ার পর তার মধ্য থেকে কত বড় বড় এবং শক্ত অভিযোগের ভিত্তি খুঁজে বের করা যেতে পারে। অন্যদের কথা বাদ দিন, যদি আল্লাহর ভয় এবং তাঁর দরবারে প্রতিটি কথার জন্য জবাবদিহির ভয় না থাকত তাহলে আমি নমুনা হিসাবে বলে দিতাম যে, স্বয়ং তাদেরকে গোমরাহ প্রমাণ করা, বরং তাদেরকে দীন এবং মিল্লাতের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করা কত সহজ ব্যাপার এবং মানুষ তাকওয়া ও খোদাভীতির ছদ্মাবরণে কত রকমের ভিত্তিহীন কথাই না তাদের বিরুদ্ধে রচনা করতে পারে।

আমার নীতি এই যে, কোন ব্যক্তির সমালোচনার আঘাতে যখন আমার মধ্যে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করি তখন আমি তার জবাবদানে বিরত থাকি। কারণ সে তো নিজের উদ্দেশ্যের জন্য পথে পথে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। আমি নিজের উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার পেছনে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াব এবং শেষ পর্যন্ত এই ধরনের লোকদের ঝঞ্ঝাটে পড়ে আমি অন্য কাজের জন্য আবার সময় পাব কোথায়। এজন্যই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি পনের-ষোল বছর যাবৎ ক্রমাগতভাবে আমার উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তো কয়েক বছর ধরে কতিপয় লোক আমার

বিরুদ্ধে অভিযোগ রচনা করাকে নিজেদের স্থায়ী কর্মে পরিণত করে নিয়েছে। কিন্তু আমি কখনো তাদের কোন কথার জবাব দেইনি। যদি কখনো প্রয়োজন মনে করেছি তাহলে সীমা লংঘন না করে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছি। অতপর তাদেরকে যতক্ষণ ইচ্ছা নিজেদের আমলনামা কালো করার জন্য ছেড়ে দিয়েছি।

আপনি যদি 'আল–ফোরকান' এবং 'আল–মুনীর' পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠে ধোঁকার শিকার হতে থাকেন তাহলে আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে, তারা আগামী দিনে আপনার মনে একটি নতুন সংশয়ের সৃষ্টি করবে, আর আমি নিজের সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আপনার সংশয় দূর করার জন্য লেগে থাকব। আপনার জন্য উত্তম পন্থা এই যে, আপনি ধৈর্য সহকারে উভয় পক্ষের বক্তব্য পড়তে থাকুন। আসল অবস্থা আপনি যদি হৃদয়ংগম করতে পারেন তাহলে ভাল, অন্যথায় যেখানে আরো বহু লোক ধোঁকার শিকার হয়েছে, সেখানে আপনিও একজন যুক্ত হলেন।

তথাপি আপনি যেহেতু প্রথম বারের মত তাদের সৃষ্ট ধোঁকা ও সংশয় সম্পর্কে আমাকে লিখেছেন, এজন্য আমি দুই একটি কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছি–তাহলে বক্তব্য হৃদয়ংগম করতে আপনার সাহায্য হবে।

১. 'দুটি বিপদের মধ্যে সহজতর বিপদ গ্রহণ' করার মূলনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি যেসব উদাহরণ দিয়েছি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা থেকে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ের অসুবিধা এবং বান্দার সামনে আগত প্রয়োজনসমূহের ক্ষেত্রেই একান্ত ঠেকার মূহুর্তে রুখসাতের (অনুমতি) প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দীন প্রতিষ্ঠার কাজে এই মূলনীতির ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। এখন আপনি নিজেই একটু চিন্তা করুন, কথা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে হাদীসের রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা (জারহি ওয়া ওয়া তা'দীল) নির্ণয়ের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য জীবিত বরং মৃত রাবীদের গীবত করে বসেছেন–তার কারণ শেষ পর্যন্ত কোন্ ব্যক্তিগত অসুবিধা ছিল? অন্যান্য দৃষ্টান্ত কিছু সময়ের জন্য রেখে দিন। শুধু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য ক্ষুদ্রতর কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে গ্রহণ করে নেয়া, এবং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণে ক্ষুদ্রতর কল্যাণের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া–শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই জায়েয নয়, বরং একান্ত দীনী স্বার্থের জন্যও জায়েয। এ মূলনীতির ক্ষেত্রে বান্দার প্রয়োজন এবং দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত

সংগ্রামের প্রয়োজনের মধ্যে যে পার্থক্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই।

একথা পরিষ্কার যে, মুহাদ্দিসগণ নিজেদের পেশার প্রয়োজনে, অথবা নিজেদের সংকলন ও বই-পুস্তকের উদ্দেশ্যের স্বার্থে তো হাজার হাজার রাবীর দোষত্রুটি উম্মোচন করেননি। এই প্রকাশ্য হারাম, বরং কুরআন মজীদের ভাষা অনুযায়ী নেহায়েত অবাঞ্ছিত কাজ তাঁরা কেবল এ দলীলের ভিত্তিতে করেছেন যে, যদি এই অবাঞ্ছিত কাজটি না করা হয় তাহলে এর চেয়েও অধিক ভয়ংকর বিকৃতির সূচনা হবে। তা এই যে, দীনের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে এমন অনেক কথার অনুপ্রবেশ ঘটবে, যা তিনি কখনো বলেননি এবং এর ফলে দীনের গোটা কাঠামোই বিকৃত হয়ে যাবে। কোন্ ব্যক্তি বলতে পারে যে, এটা একান্তই দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ ছিল না? এর মধ্যে তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে কল্যাণ ও প্রয়োজনের লেশমাত্রও খুজে পাওয়া যাবে না। আর এটা সেই কাজ যাকে একটি ক্ষমাযোগ্য অপরাধ নয়, বরং পুরস্কারযোগ্য কাজ মনে করে উম্মাতের পূর্বের-পরের সমস্ত ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ ঐক্যবদ্ধভাবে করেছেন এবং গোটা উম্মাত এটাকে ইজমা সহকারে সওয়াবের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটার গীবত হওয়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

২. দীনের কোন মূলনীতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ আশংকা করা যে, তার মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী লোকেরা অবৈধ ফায়দা উঠানোর সুযোগ পেয়ে যাবে-বাহ্যত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, এ আশংকার আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স) এবং উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ কোন জরুরী বিষয় বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন কি? কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের পাতায় এমন অনেক কথা বর্তমান রয়েছে, যার দ্বারা কোন অজ্ঞ অথবা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তি যদি অবৈধ ফায়দা উঠাতে চায়—তাহলে বিপর্যয়, বিকৃতি এবং গোমরাহীর শেষ সীমাও অতিক্রম করে যেতে পারে। কিন্তু এসব আশংকার কারণে না আল্লাহ তাআলা, না তাঁর রসূল এবং না উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এমন কোন কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন-যা তাঁর সঠিক স্থানে নির্ভুল এবং যা বর্ণনা করে দেয়া দীনের অনুসরণকারী সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকদের পথপ্রদর্শনের জন্য জরুরী।

আমি আলোচিত প্রবন্ধে যেসব কথা বলেছি, এখন তা যদি স্বয়ং সঠিক হয় এবং এমন একটি মূলনীতি নির্দেশ করে-যা মূলতই দীনের মধ্যে বর্তমান

রয়েছে, তাহলে আপনি নিজেই চিন্তা করুন, এ লোকদের কথা কতটুকু ওজন রাখে এবং এগুলোকে আমার কতটুকু ওজন দেয়া উচিৎ–যা তাদের কাছে আমাকে অভিযুক্ত বানানোর জন্য এই আশংকা সৃষ্টি করে যে, এসব বিষয় বর্ণনা করার কারণে বিপর্যয়ের দরজা খুলে যাবে; বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে যে, আমি নিজে বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার জন্য এবং ধর্মের নামে অধর্মের সেবা করার জন্য এই দরজা খুলে দিচ্ছি। এর জবাব তো কেবল এই হতে পারে যে, ধৈর্য সহকারে নিজের কাজ করে যেতে হবে এবং ঐ লোকদের যা ইচ্ছা তাই বলার সুযোগ দেব।

৩. "ভোট ক্রয়" শিরোনামে আল–মুনীর যা কিছু লিখেছে এবং 'আল–কোরকান' তা থেকে নকল করেছে, তার উদ্দেশ্য যুগপৎভাবে এই বিষয় প্রমাণ করা যে, তারা যে বিপর্যয়ের দরজা খোলার আশংকা প্রকাশ করত তা তো পূর্বেই খুলে গেছে এবং তা আমারই খুলে দেয়া। যে পূর্ণ তাকওয়া সহকারে এই ভেলকী দেখানো হচ্ছে, আমি ধৈর্য সহকারে এর উপর নীরব থাকাই যুক্তিসংগত মনে করতাম। কেননা এ অপবাদ রটনা এবং অন্যকে অভিযুক্ত করার জন্য এই তৎপরতা এবং ব্যাকুলতা নিজের মধ্যে যে প্রাণীশক্তি রাখে, আমি প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, এগুলোর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা যেন কখনো আমাকে আচড় লাগাতে না পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের মত সরলপ্রাণ ব্যক্তিদেরও ধৈর্য সহকারে চুপচাপ বসে থাকতে দিচ্ছে না এবং উল্লেখিত অভিযোগসমূহের জবাব তলব শুরু করে দেয়। এখন দেখুন আসল ব্যাপারটি কি এবং আপনিই আমাকে বলুন, এসব বিষয়ের শেষ পর্যন্ত কি জবাবদিহি করা যেতে পারে।

প্রথমে আল—মুনীর পত্রিকা আমার উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল যে, আমি টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয় জায়েয মনে করি এবং এটাকে 'মুয়াল্লাকাতুল কুলূব' (মনোতুষ্টি)–এর মধ্যে গণ্য করি। (অথচ এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যের লেশ মাত্র ছিল না, এই কথা আমার মুখে আসা তো দূরের কথা, কখনো আমার কল্পনায়ও আসেনি এবং এই জিনিসকে আল–মুনীরের পৃষ্ঠায় দেখার এক সেকেন্ড পূর্বে পর্যন্তও আমি চিন্তা করতে পারতাম না যে, আমার উপর এই অপবাদ কখনো আরোপিত হতে পারে)। অতপর এই আল–মুনীর অপর এক ব্যক্তির একটি চিঠি প্রকাশ করে। এই পত্রে সে নিজের ধারণা মোতাবেক এই ভোট ক্রয়ের সপক্ষে কতিপয় যুক্তি পেশ করে। (এটা সম্পূর্ণ তার নিজের কাজ। এ ব্যাপারে তার সাথে বা অন্য কারো সাথে কখনো আমার

মতবিনিময় ঘটেনি এবং তার যুক্তিপ্রমাণ অথবা ধ্যান–ধারণার সাথে মূলতই আমার কোন সম্পর্ক নেই)। অতপর আল–ফোরকান এই সম্পূর্ণ ব্যাপার আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে লোকদের বলতে লাগল যে, দেখ! এই ব্যক্তির চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকেরা নৈতিক বন্ধনসমূহ তাকের উপর রেখে দিচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে আমি কবে এবং কোথায় লিখেছি যে, টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয় জায়েয? এটা ছিল একটা জাজ্বল্যমান অপবাদ, যা আল–মুনীর কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের প্রতিশোধের আবেগকে শান্ত করার জন্য নিজেরাই রচনা করেছে এবং প্রচার করে দিয়েছে। এখন যদি একজন সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মিথ্যা বর্ণনার উপর নিজের কিছু অভিমত পেশ করে তাহলে আমাকে কি জবাবদিহি করে ফিরতে হবে? এই ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারা পেশ করার সাথে সাথে আমার প্রশংসায় কিছু কথাও লিখেছে।

শুধু এই কথাটুকুর ভিত্তিতে তার প্রতিটি অভিমতের দায়িত্বভার আমার উপর চাপানো যেতে পারে কি? দোষী সাব্যস্ত করার এই পন্থা গ্রহণ করা হলে পূর্বেকার এবং পরবর্তীকালের ওলামা, মাশায়েখ এবং বুজর্গানে দীনের মধ্য কোন ব্যক্তি কি বেঁচে যেতে পারেন, যার অনুসারী ও শুভাকাংখীদের প্রতিটি ভুলত্রুটির দায়িত্ব তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে গোমরাহীর উৎস প্রমাণ করা যাবে না? বিপথগামী প্রশাসনের প্রোসিকিউটিং ইনসপেকটর লোকদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এই ধরনের তৎপরতা না দেখালেই হয়।

৪. 'আল–আইম্মাতু মিন কুরাইশিন' الائمة من قريش সম্পর্কে আমি রাসায়েল–মাসায়েল গ্রন্থের ১ম খন্ডে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আপনি যদি তা পড়ে থাকতেন তাহলে আপনি সম্ভবত আল–ফোরকানের সমালোচনাকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না যা আপনি ব্যক্ত করেছেন। চিন্তার বিষয় এই যে, শেষপর্যন্ত হাদীসসমূহের মধ্যে এমন কিছু জিনিস তো ছিল যার ভিত্তিতে প্রথম যুগ থেকে শুরু করে শাহ ওলিউল্লাহ (রহ) সাহেবের যুগ পর্যন্ত ফিকাহবিদগণ সাধারণ খেলাফতের জন্য কোরাইশ বংশীয় হওয়াকে আইনগত শর্তের আকারে বর্ণনা করে আসছেন। রসূলুল্লাহ (স)–এর বাণী থেকে এই উদ্দেশ্য যদি মোটেই প্রকাশ না পেত যে, তাঁর পরে খেলাফত কোরাইশদের দিতে হবে, তাহলে ফিকাহবিদগণ কি এতটা অজ্ঞ ছিলেন যে, শুধু ভবিষ্যদ্বাণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্দেশ মনে করে নেবেন এবং বর্তমান যুগের কোন কোন ব্যক্তির পূর্বে আগেকার কোন লোকের বুঝেই এই কথা আসল না যে, এটা তো শুধু একটি খবর, এর উদ্দেশ্য মোটেই এই নয় যে, খলীফা

কোরাইশ বংশ থেকে হতে হবে? 'আল আইম্মাতু মিন কুরাইশিন'-নির্দেশ না খবর-এ সম্পর্কে শাহ ওলিউল্লাহ (রহ) সাহেবের রায় নিম্নরূপঃ

"মোটকথা খেলাফতের যোগ্য হওয়ার জন্য কোরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া শর্ত। এরই ভিত্তিতে হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আনসারদের খেলাফত দাবী প্রত্যাখান করেছিলেন। হাদীসে এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন'-"ইমাম হবে কোরাইশদের মধ্য থেকে"-(ইযালাতুল খিফা, মাকসাদে আওয়াল, পৃ. ৫)।

এ থেকে কি প্রকাশ পায়? শাহ সাহেব এই হাদীসের অর্থ 'ইমাম কোরাইশদের মধ্য থেকে হবে' বুঝেছেন, না কুরাইশদের থেকে হতে হবে বুঝেছেন? মনে করুন এই অর্থের অন্যান্য হাদীসকে যদি আক্ষরিকভাবে খবরও সাব্যস্ত করা হয়, তবুও ফিকাহবিদ এবং হাদীস বিশারদগণ সাধারণভাবে এই খবরকে নির্দেশ (আমর) অর্থেই গ্রহণ করেছেন। বুখারীর বর্ণিত হাদীস "লা ইয়াযালু হাযাল আমরু ফী কুরাইশিন' সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী বলেন, "এই হাদীস বিধিবদ্ধ হওয়ার খবর দেয়। অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব কোরাইশদের ছাড়া অন্যদের জন্য বিধিবদ্ধ হতে পারে না।" ইবনুল মুনীর বলেন, "এই হাদীসের দাবী হচ্ছে সর্বময় কর্তৃত্ব কোরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) মূলত যেন এই কথা বলছেন, কর্তৃত্ব কোরাইশদের মধ্যেই থাকবে। ব্যাপারটি যেন এই রকম, যেমন রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে সম্পত্তি বিভক্ত হয়নি তার উপরই শোফআ দাবী করা যাবে।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, "এই হাদীস যদিও খবর প্রদান সূলভ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা আমরের (নির্দেশ) অর্থ জ্ঞাপক। রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য যেন এই ছিল যে, বিশেষ করে কোরাইশদেরই ইমাম (নেতা) বানাও। হাদীসের অপরাপর সনদও এই অর্থের পোষকতা করে এবং সাহাবাগণও এককভাবে এটাকে সীমাবদ্ধতার অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই লোকদের বিরুদ্ধে-যারা এই অর্থকে অস্বীকার করে। জমহুর আলেমগণও এই কথাই গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম (কেন্দ্রীয় নেতা) হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার জন্য কোরাইশ বংশীয় হওয়া শর্ত"-(ফাতহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৬,৯৭)।

অধিকন্তু বিশেষজ্ঞ আলেমদের এই রায়ের ভিত্তি কেবল ঐসব হাদীসের উপরই নয় যা খবরের আকারে (সাধারণ বর্ণনার আকারে) ও বাচনভঙ্গীতে এসেছে অথবা যা কেবল খবরের পর্যায়ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বরং

একাধিক হাদীস নির্দেশ জ্ঞাপক (আমর) শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "কোরাইশদের অগ্রবর্তী কর এবং তাদের অগ্রবর্তী হও না।" এই হাদীস ইমাম বায়হাকী, তাবারানী এবং ইমাম শাফিঈ নিজ নিজ কিতাবে সংকলন করেছেন। "কোরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা"–ইমাম আহমাদ (রহ) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)–র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয় সম্পর্কে শব্দের পার্থক্য সহকারে মূলত অনেক হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার সমষ্টিগত প্রভাব এই ছিল যে, মুসলিম আলেমগণ শতশত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধভাবে খেলাফতের জন্য কোরাইশ বংশীয় হওয়াকে একটি আইনগত শর্ত হিসাবে বর্ণনা করে আসছেন এবং খারিজী ও মোতাযিলা সম্প্রদায় ছাড়া কেউই এ বিষয়ে মতবিরোধ করেননি। কাযী আইয়ায তো এ বিষয়ের উপর ইজমা হয়েছে বলেও দাবী করেছেন। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"ইমাম (কেন্দ্রীয় নেতা) হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য কোরাইশ বংশীয় লোক হওয়াটা সমস্ত আলেমের মাযহাব। তাঁরা এটাকে ইজমার মধ্যে গণ্য করেছেন। পূর্ববর্তী কালের আলেমদের মধ্যে কারো এ বিষয়ে ভিন্নমত বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে পরবর্তী কালেও মুসলিম রাষ্ট্রের কোন শহরের আলেমগণ এর সাথে মতভেদ করেননি"–(ফাতহুল বারী, ১৩শ খন্ড, পৃ. ১৬, ১৭)।

এখন এই রোগের কি চিকিৎসা করা যায় যে, কথাটা অর্বাচিনদের চিন্তার দ্বার পর্যন্ত পৌছে গেছে–যারা নির্দ্বিধায় দাবী করছে যে, এটা তো কেবল খবর ছিল, যার মধ্যে আমরের (অনুজ্ঞা) গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। মনে হয় যেন পেছনের শতাব্দীগুলোতে অজ্ঞতা এতটা ব্যাপক ছিল যে, নির্দেশ এবং সাধারণ বক্তব্যের মধ্যেকার পার্থক্যটা পর্যন্ত কারো বুঝে আসেনি এবং এর অনুজ্ঞা হওয়ার উপর সবাই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করে বসেছেন এবং শত শত বছর ধরে ঐক্যমত পোষণ করে আসছেন। এই দুঃসাহসের অবস্থা হচ্ছে –এই লোকরাই অন্যদের উপর দোষারোপ করে যাচ্ছে যে, তাদের লেখাসমূহের দ্বারা পূর্বকালের আলেমদের ওপরকার নির্ভরযোগ্যতা খতম হয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের পূর্বে আর কেউই দীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

এই বিষয় সম্পর্কে আমার রায় এখনো তাই, যার ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে "রাসায়েল–মাসায়েল" গ্রন্থে করে এসেছি এবং এই পর্যন্ত আমার নজরে এমন

কোন তাত্ত্বিক আলোচনা পড়েনি যার কারণে এই বিষয়ের উপর পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। আমার কাছে একথা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (স) কোরাইশদেরই খেলাফতের পদ দেয়ার জন্য হেদায়েত দান করেছিলেন। নিশ্চিতই এটা তাঁর নির্দেশ ছিল, কেবল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। কিন্তু এই নির্দেশের ভিত্তি এই ছিল না যে, আইনগতভাবে খেলাফত কোন বিশেষ বংশের একচ্ছত্র অধিকার ছিল যাদের ব্যতীত অন্য কোন গোত্র বা বংশের কোন ব্যক্তি এই পদের মূলতই অধিকারী হতে পারে না! বরং এর আসল কারণ এই ছিল যে, বাস্তব রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলুল্লাহ (স)-এর পর কেবল কোরাইশদের খেলাফতই সফলকাম হতে পারত। এর বিভিন্ন কারণ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। এইজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খেলাফতের পদ কোরাইশদের মধ্যেই সীমিত রাখা হবে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমস্যায় জড়িয়ে না পড়ে এবং মুসলমানরা কেবল ইসলামের সাম্যনীতির প্রদর্শনী করার জন্য কোন অকোরাইশী ব্যক্তিকে খলীফা বানিয়ে এমন পরিণতির সম্মুখীন না হয়ে যায় যা একটি প্রভাবশালী গোত্রের মোকাবিলায় কোন প্রভাবহীন অথবা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী গোত্রের কোন ব্যক্তিকে খলীফা বানানোর ফলে সৃষ্টি হতে পারে।

ইসলামের ফিকাহবিদগণ যদি রসূলুল্লাহ (স)-এর এই নির্দেশকে স্থায়ী সাংবিধানিক আইনের অর্থে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাও অকারণ ছিল না। তাঁর পরে শত শত বছর ধরে কোরাইশদের সেই মর্যাদাই অটুট ছিল যার ভিত্তিতে তিনি প্রথম দিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য যুগের পর যুগ ধরে ফিকাহবিদগণ "কোরাইশ বংশীয় ব্যক্তি খলীফা হবে" কথাটিকে একটি সাংবিধানিক নীতি হিসাবে বর্ণনা করে আসছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)-এর যেসব বাণী থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, কোরাইশদের একটি বিশেষ বংশের লোক হওয়ার ভিত্তিতে এই হুকুম দেয়া হয়নি, বরং তাদের মধ্যে বর্তমান কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে-সে বাণীগুলোও তৎকালীন যুগে কারো কাছে গোপন ছিল না। এবং এই হুকুম ততদিনের জন্য বলবৎ থাকবে যতদিন তাদের মধ্যে খেলাফতের এই পদের যোগ্যতা বর্তমান থাকবে। যেমন তিনি বলেছেন, 'যতদিন তারা দীন কায়েম করতে থাকবে' ما اقاموا الدين এবং-'যতক্ষণ তারা নিজেদের ফয়সালায় ইনসাফের অনুসরণ করবে, নিজেদের ওয়াদা পূরণ করতে থাকবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া অনুগ্রহ করতে থাকবে।'

ما إذا حكموا فعدلوا وعدوا فوفوا واسترحموا

এসব বাণী থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, খলীফার পদের যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য কোরাইশ বংশীয় লোক হওয়ার শর্ত একটি স্থায়ী সাংবিধানিক নীতি নয়। এই কথাকে হযরত আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাকীফায়ে বণী সায়েদায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

ان هذا الامر فى قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره

"এই খেলাফত কোরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে থাকবে এবং তাঁর নির্দেশের উপর অবিচল থাকবে।"

উপরন্তু হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্য–"যদি আমার মৃত্যুর সময় আবু উবায়দা জীবিত না থাকে, তাহলে আমি মুআয ইবনে জাবালকে খলীফা নিযুক্ত করে যাব"–এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, খেলাফত কেবল বংশ ও বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে কোরাইশদের কোন চিরস্থায়ী আইনগত অধিকার নয়।

–(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃ.)

গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান

আমার নিকট কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা এসেছে যার মধ্যে কতিপয় লোকের আপত্তিসমূহের উল্লেখপূর্বক তার জওয়াব চাওয়া হয়েছে। আমার পক্ষে আপত্তিকারীদের শত্রু হওয়া তো মুশকিল। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হয় তখন তার সংশোধন অপরিহার্য মনে হয়-যাতে সাধারণ লোকেরা এবং অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা এসব মাসআলা অনুধাবনে ভুল না করে। এজন্য আমি এই প্রশ্নমালা থেকে আসল ও মৌলিক বিষয়গুলো বেছে নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে তার উত্তর দিচ্ছি। নিম্নে শুধুমাত্র গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্নঃ ১. গীবতের সঠিক সংজ্ঞা কি?

২. গীবতের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা কতটা সঠিক?

"কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার কোন প্রকৃত দোষের কথা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছে এবং সাথে সাথে আকাংখা পোষণ করছে যে, সে যার দোষ বর্ণনা করছে সে তার এই কাজ (দোষচর্চা) সম্পর্কে অবহিত না হোক।"

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই দাবী সহকারে পেশ করা হয়েছে যে, "হাদীস শরীফে মহানবী (স) থেকে গীবতের যে সংজ্ঞা উল্লেখিত হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যার কারণে কোন ব্যক্তি গীবতের সীমা নির্ধারণে ভুলের শিকার হতে পারে। আরও এই যে, মহানবী (স)-এর প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগ নয়।

৩. গীবতের শরীআত অনুমোদিত শ্রেণীসমূহ কি কি এবং কেন তা জায়েয রাখা হয়েছে? তা বৈধ হওয়ার ভিত্তি কি এই যে, তা মূলতই গীবত নয় অথবা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একটি অবৈধ জিনিসকে বৈধ করা হয়েছে?

৪. একথা কি ঠিক যে, মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি যাচাই করেছেন?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ؟

"হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে–তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে"–(সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

৫. মুহাদ্দিসগণ স্বয়ং এই কাজ সম্পর্কে কি বলেন?

প্রবন্ধকারে জবাব

গীবতের শরীআত প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞা

১. প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে, গীবতের স্বয়ং শরীআত প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞাই সঠিক ও যথার্থ। সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র সূত্রে মহানবী (স)–এর প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নোক্ত বাক্যে উধৃত হয়েছেঃ

ذكرك اخاك بما يكره ، قيل افرأيت ان كان فى اخى
ما اقول ، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم
يكن فيه ما تقول فقد بهته -

"গীবত এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের উল্লেখ করলে যা তার অপছন্দনীয়। বলা হল, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবিকই উল্লেখিত দোষ থেকে থাকে? এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বলেনঃ তুমি যা বলেছ প্রকৃতই তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলেছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।"

একই বিষয়বস্তু সবলিত একটি হাদীস ইমাম মালেক (রহ) মুত্তালিব ইবনে আবদিল্লাহ (রা)–এর সূত্রে তাঁর আল–মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة فقال
ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع ـ قال يا رسول الله وان
كان حقا ، قال اذا قلت باطلا فذالك البهتان -

"মুত্তালিব ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে হানতাব আল–মাখযূমী (রা) অবহিত করেন যে, "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করল–গীবত

কি? তিনি বলেনঃ তুমি কোন ব্যক্তির উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা শুনলে সে অপছন্দ করবে।[১] সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! তা যদি সত্য হয়? তিনি বলেনঃ তুমি যদি বাতিল (মিথ্যা) কথা বল তবে তা তো অপবাদ হিসাবে গণ্য।"

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ

মহানবী (স)–এর উপরোক্ত বাণীর আলোকে মহান আলেমগণ গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ করেনঃ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা।"

ইমাম গাযালী (রহ) বলেন,

حد الغيبة ان تذكر اخاك بما يكرهه لو بلغه.

"গীবতের সংজ্ঞা এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা যদি তার কানে পৌছে তবে সে তা অপছন্দ করবে।"

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন–নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ

ان تذكر الانسان فى غيبة بسوء وان كان فيه

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার দুর্নাম করলে–যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে।"

ইমাম নববী (রহ) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন

ذكر المرء بما يكرهه سواء ذكرته باللفظ او بالاشارة والرمز.

"কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে–চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক অথবা ইশারা–ইংগিতে।"

আর–রাগিব আল–ইসফাহানী বলেন,

هى ان يذكر الانسان عيب غيره من غير محوج الى ذكر ذالك

১. কেউ যেন ভ্রান্তির শিকার না হয় যে, এ হাদীসে "অনুপস্থিতিতে" কথার উল্লেখ নাই, তাই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সামনাসামনি খারাপ কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। "গীবত" শব্দটির মধ্যেই স্বয়ং "অনুপস্থিতিতে" অর্থ বর্তমান রয়েছে। অতএব গীবতের সংজ্ঞা হিসাবে যখন কোন কথা বলা হবে তখন তার মধ্যে স্বয়ং উপরোক্ত অর্থ নিহিত থাকবে–চাই তা পরিষ্কারভাবে বলা হোক বা না হোক–(প্রবন্ধকার)।

"নিষ্প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বাদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন,

الغيبة ان يتكلم خلف انسان بما يغمه لو سمعه وكان

صدقا اما اذا كان كذبا فيسمى بهتانا۔

"গীবত এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে-তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ।"

ইবনুত-তাইন বলেন, الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب

"গীবতের অর্থ হচ্ছে-কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী প্রদত্ত সংজ্ঞা এই যে,

الغيبة ان تتكلم خلف الانسان بما يكرهه لو سمعه

ولو كان صدقا۔

"গীবত এই যে, তুমি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে-যদিও তা সত্য হয়।"

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী গীবত ও চোগলখুরি সম্পর্কে বলেন-

الغيبة توجد فى بعض صور النميمة وهو ان يذكره فى

غيبة بما فيه مما يسوءه قاصدا بذالك الافساد

"চোগলখুরির কোন কোন পর্যায়ের মধ্যে গীবতও পাওয়া যায়। তা এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনা করে যা তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, আর এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বিবাদ-বিশৃংখলার সৃষ্টি করা।"

অভিধান, হাদীস ও ফিকহের এসব ইমামগণের মধ্যে কেউই একটি শরঈ বিষয়ের যে সংজ্ঞা স্বয়ং শরীআত প্রণেতা প্রদান করেছেন তাকে অপূর্ণাংগ ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করে জবাবে নিজেদের প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রদান করার দুঃসাহস করেননি। মূলত শরীআত প্রণেতাকে অতিক্রম করে শরীআতের কোন

পরিভাষার তাৎপর্য বর্ণনার অধিকার কারও নেই। শরীআত প্রণেতা যখন একটি পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার বাক্যে জবাব প্রদান করেছেন তখন একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের একথা মেনে নিতেই হবে যে, এটাই তার সঠিক অর্থ। মুসলমান তো দূরের কথা একজন অমুসলিম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা বলার দুঃসাহস করে না যে, শরীআত প্রণেতা শরীআতের একটি পরিভাষার যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক নয়, বরং আমি যে অর্থ করেছি তা সঠিক। এটা এমন একটি অযৌক্তিক কথা যেমন একটি আইন পরিষদ তাদের প্রণীত আইনের কোন পরিভাষার অর্থ স্বয়ং তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কোন ব্যক্তি আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবীদার বনে বলে যে, উল্লেখিত আইনে ঐ বিষয়ের আসল সংজ্ঞা তা নয় যা আইন পরিষদ বর্ণনা করেছে, বরং আমার প্রদত্ত সংজ্ঞাই সঠিক।

আপত্তিকারীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার ত্রুটি

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, আপনি গীবতের যে সংজ্ঞা নকল করেছেন তা না পূর্ণাংগ, না অর্থপূর্ণ। তার মধ্যে এমন কতগুলো গীবত অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী বৈধ এবং কতিপয় গীবত বাইরে থেকে যায় যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী হারাম। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন–এক ব্যক্তি কারো কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। আপনার জানা আছে যে, সে অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। আপনি মেয়ের পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ চরিত্রের লোক। আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে–মেয়ের পিতা তাকে খারাপ লোক জেনে নিজের জামাতার যোগ্য মনে করবে না। সাথে সাথে আপনি মেয়ের পিতাকেও তাকিদ করে বলে দিলেন যে, খবরদার! তার সম্পর্কে আমি আপনাকে যা বলেছি তা যেন সে জানতে না পারে। এই বিষয়টি যদিও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীআতে বৈধ ও অনুমোদিত রাখা হয়েছে, কিন্তু আপনার উধৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী তা হারামকৃত গীবতের আওতায় এসে যায়। কারণ তাতে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা এবং গোপনীয়তা উভয়ই বর্তমান আছে। অপরদিকে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে–যে কেবলমাত্র মুখরোচক কথা ও ঠাট্টা-উপহাস্যোচ্ছলে নিজের বন্ধুদের মধ্যে বসে কোন কোন লোকের দোষ বর্ণনা করে। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তার নেই (শ্রোতাদের দৃষ্টিতে সে নিম্নস্তরের হোক না কেন) এবং সে এও পরোয়া করে না যে, তার একথা তাদের কানে পৌছে যায় কি না। এই জিনিস নিঃসন্দেহে শরীআতে হারাম, কিন্তু তা গীবতের উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কারণ তার মধ্যে না হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা বর্তমান আছে আর না গোপন করার আকাংখা।

শুধু তাই নয়, শরীআত প্রণেতা যে জিনিস সুস্পষ্টভাবে হারাম গীবতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন তাও উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতার বাইরে থেকে যায়। হাদীসে এসেছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামীকে যেনার অপরাধে যখন রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হল তখন মহানবী (স) পথ চলতে চলতে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন—উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি বলছিল যে, "দেখ ঐ ব্যক্তিকে! আল্লাহ তাআলা তার অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু তার নিজের নফস তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ তাকে কুকুরের মত হত্যা না করা হয়।" কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার পাশে একটি গাধা পড়ে থাকতে দেখা গেল। মহানবী (স) থেমে গেলেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে ডেকে বলেনঃ "আস এবং এ গাধার গোশত খাও।" তারা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! তা কে খেতে পারে? তিনি বলেন–

فما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل منه-

"এইমাত্র তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জতের উপর যে হস্তক্ষেপ করলে তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট।"

–(আবূ দাউদ, কিতাবুল-হুদূদ, বাব রাজমি মায়েয)

এই ঘটনায় স্বয়ং শরীআত প্রণেতা (স) গীবত হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনার উধৃত সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি শর্তই উল্লেখিত গীবতে অনুপস্থিত। দুই ব্যক্তির যে কথোপকথন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার বাক্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, হযরত মায়েয (রা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তারা এজন্য আক্ষেপ করে বলেছেন যে, তাঁর যে অপরাধ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছিলেন–তিনি কেন তা পুনঃপুন উল্লেখপূর্বক স্বীকার করতে গেলেন এবং রজমের মত ভয়াবহ শাস্তির সমুখীন হলেন। গোপন রাখার আকাংখা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে তার প্রশ্নই উঠে না। কারণ যে ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল তিনি তো পৃথিবী থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছেন।

হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ হওয়ার মূলনীতি

৩. তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পূর্বে একটি কথা ভালভাবে বুঝে নেয়া আপনার জন্য জরুরী মনে করি। শরীআতে যেসব জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে–তা যদি কোন অবস্থায় বৈধ হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, সংশ্লিষ্ট

জিনিসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়েছে। বরং তার কারণ এই যে, একটি বিরাট কল্যাণ ও প্রয়োজন তা বৈধ হওয়ার দাবী করছে। ঐ কল্যাণ ও প্রয়োজন যদি তার দাবীদার না হত তবে তা পূর্ববৎ হারামই থাকত। যতক্ষণ ও যে সীমা পর্যন্ত এই কল্যাণ ও প্রয়োজনের দাবী থাকে–ততক্ষণ ও সেই সীমা পর্যন্ত তা বৈধ হয় ও বৈধ থাকে। ঐ প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস পুনরায় সস্থানে হারাম হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ মৃতজীব, রক্ত, শূকর, শরাব এবং যে হালাল প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে–এসবই আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য উপরোক্ত কোন জিনিস যদি সাময়িকভাবে বৈধ করা হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, ঐ সময় মৃতজীব মৃত থাকে না, রক্ত আর রক্ত থাকে না, অথবা শূকর বকরী হয়ে যায়। তা বৈধ হওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই যে, মানুষের জীবন নষ্ট করাটা এসব হারাম জিনিসের ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। এই খারাপ থেকে বাঁচার জন্য যে সময় ও সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহার অপরিহার্য হয়–ঐ সময় ও সীমা পর্যন্ত তা আহার করা বৈধ করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিষিদ্ধ হওয়াটা সব সময় এই দাবী করতে থাকে যে, প্রয়োজনের সীমা যেন চুলপরিমান ও অতিক্রম না করা হয়।

এই মৌল ও নীতিগত সত্যকে সামনে রেখে এখন আপনি তৃতীয় মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করুন–শরীআত প্রণেতার বর্ণিত সজ্ঞার আলোকে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা স্বয়ং একটি খারাপ কাজ এবং শরীআতের দৃষ্টিতে একটি গুনাহের কাজ। এই পাপকাজ যদি কখনও বৈধ, নেক অথবা সওয়াবের বিষয় হতে পারে তা কেবলমাত্র এই কারণে যে, একটি প্রকৃত প্রয়োজন তার দাবীদার, তা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে গীবতের নিকৃষ্টতা থেকেও নিকৃষ্টতর কাজ সংঘটিত হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তা বৈধ হওয়ার কারণ এই নয় যে তা মূলতই গীবত নয়, অথবা তা মূলতঃ হারাম নয়; বরং এর কারণ কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের সেইসব প্রয়োজন যা শরীআতের দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান। এসব প্রয়োজনের মধ্যে কোন প্রয়োজন দাবীদার না হলে অনুপস্থিতিতে কারো বদনামী করা কোন ভালো কাজ নয় যে–শরীআত তা নিষ্প্রয়োজনে সাধারণভাবে বৈধ করে রাখবে।

গীবত থেকে ব্যতিক্রম করার ভিত্তি

গীবতের অবৈধতা থেকে যেসব জিনিস ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে তার সর্বপ্রথম ভিত্তি শরীআত প্রণেতার নিম্নোক্ত নীতিগত বাণীঃ

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال

ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق۔

(ابوداؤد، كتاب الادب)

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ "নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি হচ্ছে–অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান–সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা।" –(আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল–গীবাত)

এই "অন্যায়ভাবে" بغير حق শব্দটির ব্যবহার দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, "ন্যায়ের" حق খাতিরে তা করা জায়েয। পুনরায় এই "ন্যায়"–এর ব্যাখ্য মহানবী (স)–এর সুন্নাতের দৃষ্টান্ত থেকেই জানা যায়। যেমন–

এক বেদুইন এসে রসূলুল্লাহ (স)–এর পিছনে নামাযে শরীক হল। নামায শেষ হতেই সে এই কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল–"হে খোদা! আমার উপর ও মুহাম্মাদ (স)–এর উপর রহম করুন, আমাদের দুজন ছাড়া আর কাউকে এই দয়ায় শরীক কর না।" মহানবী (স) সাহাবীদের বলেনঃ

اتقولون هو اضل ام بعيره، الم تسمعوا الى ما قال

"তোমরা কি বল, এই ব্যক্তি অধিক নাদান না তার উট? তোমরা কি শুনতে পাওনি সে কি বলেছে?"– (আবূ দাউদ)।

মহানবী (স) হযরত আয়েশা (রা)–র এখানে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাত প্রার্থনা করল। মহানবী (স) বলেনঃ এ হচ্ছে স্বগোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। অতপর তিনি বের হয়ে আসেন এবং সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে ভদ্র ব্যবহার করেন। ঘরের ভেতর ফিরে এলে আয়েশা (রা) আরয করেন, আপনি তো তার সাথে নম্র ব্যবহার করলেন। অথচ বের হয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেনঃ

ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيمة من ودعه او تركه

الناس اتقاء فحشه

"যার অশিষ্ট ব্যবহারের ভয়ে লোকেরা তার সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করে–কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তার স্থান হবে সর্বনিকৃষ্ট।"
– (বুখারী, মুসলিম)

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআবিয়া (রা) ও আবুল জাহম (রা) উভয়ে তাঁর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। তিনি মহানবী (স)-এর অভিমত জানতে চান। তিনি বলেনঃ

اما معاوية فصعلوك لا مال له اما ابو الجهم فضراب للنساء-

"মুআবিয়া দরিদ্র ব্যক্তি তার কোন সম্পদ নাই। আর আবুল জাহম স্ত্রীদের খুব মারে।" -(বুখারী, মুসলিম)।

আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ এসে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করেন, আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন না-(বুখারী, মুসলিম)।

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

এই ধরনের নজীরসমূহ থেকে ফকীহগণ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ যে "ন্যায় ও সত্যের" কারণে কোন ব্যক্তির জন্য খারাপ কাজ বৈধ হয় তার অর্থ এমন সব প্রকৃত প্রয়োজন যার জন্য এরূপ করা ছাড়া উপায় নেই। পুনরায় এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে গীবত করা যেতে পারে অথবা করা উচিৎ। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ) তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে ঐসব ক্ষেত্র এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীআতের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই অর্জিত হতে পারে। যেমন জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোন খারাবী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোন শরঈ মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোন কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা, বিবাহ ও দৈনন্দিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোন ফিকহের ছাত্রকে কোন ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে-প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি-(ফাতহুল-বারী, ১০ খ, পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী (রহ) মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে ও রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ সৎ ও শরীআত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে কোন দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে। এর অধিকাংশের উপর আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে মশহুর হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে।

প্রথম কারণঃ জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যাদের যালেমকে দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

দ্বিতীয় কারণঃ ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎ কাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে—যার দ্বারা খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে—এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণঃ কোন বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা-আমার উপর আমার বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে জুলুম করছে। তার জন্য এসব করা কি উচিৎ? তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং জুলুম প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে, প্রয়োজন বশতঃ এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হ'ল এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়েয। এটা যেমন হিন্দ আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

চতুর্থ কারণঃ মুসলমানদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ এটা কয়েকভাবে হতে পারেঃ

(ক) হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি আছে-যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজমা'র ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিবও। যেমন কোন লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেন-দেনের ব্যাপারে কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা, বরং নসীহতের নিয়তে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোন ফাসেক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগে তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সুক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

(খ) কোন লোককে কোন বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হল। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসেক বা অলস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোন যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমুলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

পঞ্চম কারণঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদ'আতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর জুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। তবে তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েব নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোন কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ কারণঃ পরিচয় দেয়াঃ কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়েয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়েয। তবে খাট করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম। উলামায়ে কেরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে- (সহীহ মুসলিম, বাব তাহরীমিল গীবাত; রিয়াদ, বাব-মা ইউবাহু মিনাল-গীবাত)।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের বর্ণনাসমূহ থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক, গীবতের যেসব পন্থা জায়েয অথবা অপরিহার্য বলা হয়েছে-তা জায়েয বা অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই নয় যে-তা মূলতই গীবত নয়। বরং তার কারণ হচ্ছে শরীআতের যথার্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন যার জন্য একটি প্রকৃতই হারাম জিনিস প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বৈধ বা অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হারাম জিনিসের বৈধতাকে ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি বের করে তার ভিত্তিতে এমন কতগুলো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন-যার দৃষ্টান্ত সুন্নাতে বর্তমান নেই।

মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি যাচাইয়ের ভিত্তি

৪. এখন চতুর্থ প্রশ্নটি নেয়া যাক। কুরআন মজীদের যে আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি جرح وتعديل পর্যালোচনার যাবতীয় কাজ উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে করেছেন তার ভাষা নিম্নরূপঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ-(الحجرات:٦)

"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে-আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে।"-(সূরা হুজুরাতঃ ৬)

এ আয়াতের দাবী এই যে, "কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসলে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সেই খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখ–তা সঠিক কি না।" অথচ মুহাদ্দিসগণ রাবীগণের চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়নের যে কাজ করেছেন তা এই যে, "কোন ব্যক্তি যখন তোমাদের নিকট খবর নিয়ে আসে তখন তার চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়ন কর। যদি সে দুষ্কর্মপরায়ণ হয় তবে শুধুমাত্র তার খবরই প্রত্যাখ্যান কর না, বরং সাধারণ্যে প্রচারও করে দাও যে, অমুক ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতিপরায়ণ, তার পরিবেশিত তথ্য গ্রাহ্য কর না।"

এই দুটি কথা পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করুন–আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কি এই সাক্ষ্য দেয় যে, শেষোক্ত কথাগুলো পূর্বোক্ত কথাগুলোর অনুরূপ এবং তার কোন অংশে পূর্বোক্ত কথার বিপরীত নয়?

মূলত এই দলীল পেশ করার সময় একথা হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করা হয়নি যে, রাবীগণের চরিত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কাজের ধরন কি ছিল? এ কাজের একটি অংশ এই ছিল যে, যেসব লোক মিথ্যাবাদী, অথবা ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী অথবা কোন দিক থেকে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য তাদের পরিবেশিত খবর সমর্থন করা যাবে না। এর দ্বিতীয় অংশ এই ছিল যে, সাধারণ লোকদের এবং হাদীসের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের রাবীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং বই–পুস্তকে তাদের দোষত্রুটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকে। উপরোক্ত আয়াত এবং অন্যান্য নস (কুরআন–হাদীসের দলীল) থেকে কেবল প্রথম অংশের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব ইমাম মুসলিম (রহ) সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এই অংশের সমর্থনে তা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় অংশের সমর্থনে কোন নস বর্তমান নাই, বরং তাকে গীবত হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়ার সমর্থনে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ এই প্রমাণ পেশ করেন যে, যদি এ কাজ না করা হয় তবে মিথ্যাবাদী, বিদআতী ও দুর্বল রাবীদের বর্ণিত ভ্রান্ত রিওয়ায়াত থেকে মুসলমানদের দীনকে রক্ষা করা যাবে না। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহ) ও ইবনে হাজার (রহ)–এর বর্ণনা আপনি এইমাত্র উপরে দেখেছেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের নিজস্ব ব্যাখ্যা

৫. পাঁচ নম্বর প্রশ্নের জবাব এই যে, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই নিজের কাজের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে না এ কথা বলেছেন যে–তা গীবত নয়, আর না

এই প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমাদের এ কাজের অনুমতি অমুক আয়াত অথবা অমুক হাদীসে দেয়া হয়েছে। বরং তাঁরা বলেন যে, দীনকে বিকৃতি থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মুসলিম সর্বসাধারণকে অনির্ভরযোগ্য রাবীদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ করার জন্য এই গীবতে লিপ্ত হওয়া জায়েয বরং অপরিহার্য। যে যুগে রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয় ঐ সময় প্রবলভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের এই গীবত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রাবীদের বিশ্বস্ততা যাচাইকারী মুহাদ্দিস ইমামগণ নিজেদের সঠিক অবস্থান পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করার জন্য স্বয়ং যেসব কথা বলেছিলেন তা দেখে নিন।

মুহাম্মাদ ইবনে বুনদার বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ)–কে বললাম, আমার একথা বর্ণনা করতে অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, অমুক রাবী দুর্বল এবং অমুক মিথ্যাবাদী। ইমাম সাহেব বলেনঃ

اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟

"তুমিও যদি নীরব থাক এবং আমিও যদি নীরব থাকি তবে অজ্ঞ লোকেরা কিভাবে সহীহ ও ভ্রান্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করবে?"

আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমার পিতা হাদীস ও রাবীদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছিলেন–অমুক ব্যক্তি দুর্বল এবং অমুক ব্যক্তি বিশ্বস্ত। আবূ তুরাব বাখশী বলেন, হে শায়খ! আলেমগণের গীবত কর না। একথার উত্তরে আমার পিতা বলেন, "আমি কল্যাণ কামনা করছি, গীবত করছি না।"

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ) এক রাবী সম্পর্কে বলেন, সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এক সূফী আপত্তি করে যে, এতো আপনি গীবত করছেন। ইবনুল মুবারক (রহ) জবাব দিলেন,

اسكت، اذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل.

"চুপ থাক, আমরা যদি এ কথা বর্ণনা না করি তবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে?"

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ)–কে বলা হল, আপনার ভয় হচ্ছে না যে–আপনি যেসব লোকের দোষক্রটি বর্ণনা করছেন তারা কিয়ামতের দিন আপনাকে পাকড়াও করবে? তিনি জবাব দেন, তারা যদি আমাকে পাকড়াও করে তবে তা আমার জন্য সহজ ব্যাপার হবে মহানবী (স)–এর

পাকড়াও-এর তুলনায়। কারণ সেদিন মহানবী (স) আমার আঁচল টেনে ধরে বলবেন-যে হাদীস সম্পর্কে তুমি জানতে যে, তা মিথ্যা-এমন হাদীস তুমি আমার নামের সাথে সম্পৃক্ত হতে দিলে কেন? তখন আমি কি বলব?

শো'বা ইবনুল হাজ্জাজকে বলা হল, আপনি কতিপয় লোকের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাদের অপমান করলেন। ভালো হত যদি আপনি তা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি বলেন, আমাকে আজকের একটি রাত অবকাশ দাও যাতে আমি আমার ও আমার স্রষ্টার মধ্যে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারি যে, এ কাজ আমার জন্য ত্যাগ করা কি জায়েয? পরবর্তী দিবসে তিনি বের হয়ে বলেন-

قد نظرت بيني وبين خالقي فلا يسعني دون ان ابين امور

هو للناس وللاسلام.

"আমি আমার ও আমার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। জনগণের উপকারার্থে এবং ইসলামের জন্য ঐসব বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই।"

আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী বলেন, আমি ও শো'বা পথ চলাকালে এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখলাম। শো'বা বলেন-

كذب والله . لولا انه لا يحل لي ان اسكت عنه لسكت

"আল্লাহর শপথ। সে মিথ্যা বলছে। এ সম্পর্কে নীরব থাকাটা আমার জন্য বৈধ নয়, অন্যথায় আমি নীরব থাকতাম।"

এই শো'বার বিভিন্ন ছাত্র বলতেন যে, তিনি রাবীদের দোষত্রুটি নির্দেশ جرح -কে "আল্লাহর রাস্তায় গীবত" অথবা "আল্লাহর জন্য গীবত" বলে আখ্যায়িত করতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শো'বা বলতেন- تعالوا حتى نغتاب في الله عزوجل.

"আস আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কিছু গীবত করি।"

আবু যায়েদ আনসারী বলেন, একদিন আমরা শো'বার নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আজ হাদীস বর্ণনা করার দিন নয়, আজ গীবত করার দিন। আসো মিথ্যাবাদীদের কিছুটা গীবত করি। ১.

---

১. এই সমস্ত ঘটনা ও বক্তব্য আল-খাতীব আল-বাগদাদী (রহ) তাঁর আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়াইয়া শীর্ষক গ্রন্থে নকল করেছেন, পৃ. ৪৩-৪৬ দ্র.-(প্রবন্ধকার)।

ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর আস–সাহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় রাবীগণের চরিত্র ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন جرح وتعديل করার এই কাজের সমর্থন করে লিখেছেনঃ

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যে কারণে হাদীসের রাবী ও খবর পরিবেশনকারীদের দোষত্রুটি প্রকাশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাকারীদের একাজের বৈধতা সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন–তা ছিল এই যে, তা না করলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা আছে। কেননা দীনের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হয় অথবা তাতে কোন কাজের নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হবে। কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা না থাকে, আর অন্য রাবী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে যদি তার দোষত্রুটি তুলে না ধরে তবে সে গুনাহগার হবে' এবং মুসলিম জনসাধারণের সাথে প্রতারণাকারী গণ্য হবে। কারণ এসব হাদীস যারা শুনবে তারা তদনুযায়ী বা তার কোন একটি অনুযায়ী আমল করবে। অথচ এর সবগুলো বা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা" (বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ খ., পৃ. ৫৪–৫)।

এ হচ্ছে রাবীদের দোষত্রুটি উন্মোচিত করার সপক্ষে একজন মহান হাদীসবেত্তার যুক্তিপ্রমাণ। উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন–"জেনে রাখ! রাবীদের দোষত্রুটি নির্দেশ করা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী জায়েয বরং অপরিহার্য। কারণ মহান শরীআতকে (মিশ্রণ থেকে) রক্ষার প্রয়োজন তা দাবী করে। আর একাজ হারামকৃত গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আল্লাহ, তাঁর রসূল (স) ও মুসলমানদের কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত ইমামগণ, তাদের প্রাবীণগণ এবং তাদের মধ্যে যাঁরা তাকওয়া–পরহেযগারীতে খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা একাজ করতে থাকেন"– (সহীহ মুসলিমের আরবী ভূমিকা, পূর্বোক্ত উধৃতির নীচে)।

–(তরজুমানুল কুরআন জুন ১৯৫৯ খৃ.)

গীবত সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা

গীবত সম্পর্কে আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি পুনরায় লিখেন–

"১৯৫৯ সনের জুন সংখ্যায় "তরজমানুল কুরআন" পত্রিকায় গীবত ও তার হুকুম সম্পর্কে আপনি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন তা অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এরপর পুনরায় এমন কিছু আলোচনা দৃষ্টিগোচর হল যাতে চিন্তা ও মন–মানসিকতায় জটিলতার সৃষ্টি করে। আপনি কি এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কথা বলে দিতে পারেন না যা দুই+দুই=চার–এর মত তার যথার্থ শরঈ মর্যাদা প্রতীয়মান হয় এবং লোকেরা অতঃপর আর কোন জটিলতার শিকার হবে না?"

এই প্রসংগে কোন কোন প্রশ্নের জওয়াব ইতিপূর্বে চরম আন্তরিক অনিচ্ছার সাথে দিয়েছিলাম। এখন আবার সেই অনিচ্ছা সহকারে আরও দুটি প্রশ্নের জওয়াব দান করে নিজের সীমা পর্যন্ত এই আলোচনা চিরদিনের জন্য সমাপ্ত করতে চাই। যতটা নিম্নস্তরে অবতরণ করে এই আলোচনা করা হচ্ছে তা সবার সামনেই রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের ভুল বুঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার জন্যও একজন ভদ্র লোকের পক্ষে এই ধরনের আলোচনার প্রতিবাদ করা কঠিন।

প্রতিবাদকারীদের প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা এবং শরীআত প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও তার পরিণতি

তরজমানুল কুরআনের জুন (১৯৫৯ খৃ.) সংখ্যায় আমি সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছিলাম তা আপনি পুনরায় পাঠ করুন। এক দৃষ্টিতেই আপনি জানতে পারবেন যে, মহানবী (স)–এর বাণীর আলোকে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষত্রুটির চর্চা করাই গীবত। কিন্তু এর বিপরীতে শরীআত প্রণেতা নন–এমন এক ব্যক্তি গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান

---

১. এই সমস্ত ঘটনা ও বক্তব্য আল–খাতীব আল–বাগদাদী (রহ) তাঁর আল–কিফায়া ফী ইলমির রিওয়াই শরীফ গ্রন্থে নকল করেছেন, পৃ. ৪৩–৪৬ দ্র. (প্রবন্ধকার)।

করেন তার আলোকে এই নিকৃষ্ট কথা কেবল সেই অবস্থায় গীবতের পর্যায়ে পড়বে যখন তা অপদস্থ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে করা হবে এবং গীবতকারীর আকাংখা এই হবে যে, সে যার দোষ বর্ণনা করছে সে তা অবহিত না হোক। প্রকাশ্যতই উপরোক্ত সংজ্ঞা অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইমামগণের সংজ্ঞার মত আইন প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নয়, বরং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যার ফলে গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথমত ঃ আইন প্রণেতার সংজ্ঞা মূলতঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনাকে হারাম করেছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন এমন ব্যক্তির উপরোক্ত সংজ্ঞা এই হারামকে শুধুমাত্র এমন দোষত্রুটির বর্ণনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয় যার মধ্যে অপমান, অপদস্থ ও খাটো করার উদ্দেশ্য এবং গোপনীয়তার আকাংখা বর্তমান। এ ছাড়া আর সব দোষত্রুটি উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সাধারণত বৈধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ শরীআত প্রণেতার সংজ্ঞা সমাজকে গীবতের এমন একটি মাপকাঠি প্রদান করে যার ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিবেশে এই নিকৃষ্ট দোষ চর্চার প্রতিরোধ করতে পারে। কারণ 'দোষ চর্চা' ও 'অনুপস্থিতিতে'—এই দুটি অংশ যেখানেই একত্র হয় সেখানেই শ্রোতা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এখানে গীবতের চর্চা হচ্ছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন তার উপরোক্ত সংজ্ঞা সমাজকে এরূপ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। কারণ এক ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও আকাংখা অন্যদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তার বিচারক কেবল দোষচর্চাকারী স্বয়ং হতে পারে, অথবা স্বয়ং আল্লাহ—যাঁর ভয় কারো মনে থাকলে গীবত থেকে দূরে থাকবে, অন্যথায় নিজের সৎ উদ্দেশ্য ও গোপন আকাংখা থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছামত যার-তার গীবত করে বেড়াবে। সমাজের কেউই তার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

তৃতীয়ত ঃ শরীআত প্রণেতা অনুপস্থিতিতে দোষচর্চাকে মূলতই হারাম সাব্যস্ত করার পর তাকে নিম্নোক্ত অবস্থায় বৈধ করেছেন—যখন 'সত্যের' খাতিরে তার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ এমন কোন প্রয়োজন যা শরীআতের দৃষ্টিতে একটি সঠিক ও বিবেচনাযোগ্য প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু যিনি শরীআত প্রণেতা নন তার প্রস্তাব ও ধারণা এক ধরনের দোষচর্চাকে তো চূড়ান্তভাবে হারাম করে যা বৈধ হওয়ার কোন পথ নেই এবং অন্য ধরনের দোষচর্চাকে সাধারণতই হালাল করে দেয় যার সাথে 'প্রয়োজন' অথবা 'সৎ উদ্দেশ্যে'র কোন শর্ত সংযুক্ত নেই।

চতুর্থত ঃ শরীআত প্রণেতার আরোপিত 'বৈধতার শর্তাবলী' পুনরায় সমাজকে এতটা উপযুক্ত বানায় যে, তার পরিপার্শিকতায় যে দোষচর্চাই হবে তা যাচাই করে প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারে যে, তা বৈধ প্রকৃতির দোষচর্চা কিনা। কারণ যথার্থ শরঈ উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োজন তো এমন জিনিস যা যাচাই ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যায়। দোষচর্চাকারীকে প্রত্যেক ব্যক্তিই জিজ্ঞেস করতে পারে যে, কারো অনুপস্থিতিতে তুমি তার দোষচর্চা করছ তার কি প্রয়োজন আছে অথবা এর দ্বারা কোন্ বৈধ ও যুক্তিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছ? সে যদি এটাকে যথার্থ ও শরীআতের দৃষ্টিতে অনুমোদনযোগ্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে পারে অথবা তা আপনা আপনি শ্রোতার বুঝে এসে যায় তবে তা বরদাশত করা যেতে পারে। অন্যথায় যে কোন শ্রোতা তাকে বলে দিতে পারে যে, তোমাকে যদি তোমার অন্তরের উষ্মা প্রকাশ করতে হয় তবে নিজের বাড়ীতে গিয়ে তা কর, গীবতের এই গুনাহের সাথে অযথা আমাদের জড়াচ্ছ কেন।

কিন্তু আইন প্রণেতা নয় এমন ব্যক্তি একদিকে তো প্রয়োজনে গীবতের বৈধতার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং অপরদিকে লোকদেরকে এমন প্রতিটি দোষচর্চার খোলা অনুমতি দেয় যে সম্পর্কে সে এই দাবী করে যে, খাটো করা বা অপমানিত করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং আমি গোপন রাখার আকাংখাও পোষণ করি না। এরপর সমাজে আর কোন ব্যক্তি এই প্রশ্ন তুলতে পারে না যে, জনাব! কোন প্রয়োজনে এই কাজ করা হচ্ছে?

পঞ্চমত ঃ শরীআত প্রণেতার আরোপকৃত বৈধতার শর্তাধীনে যে দোষত্রুটিই বর্ণনা করা হবে তার উপর সেই সমস্ত সীমা ও শর্তাবলী আরোপিত হবে যা শরীআতে উপরোক্ত ধরনের হারাম কাজের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে এবং যা একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ-

১. যে অবস্থায় এ ধরনের দোষত্রুটি বর্ণনা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

২. যতটুকু দোষ বর্ণনা করা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কেবলমাত্র ততটুকুই বর্ণনা করা যাবে।

৩. প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে দোষত্রুটি বর্ণনার বৈধতাও শেষ হয়ে যায় এবং ঐ কাজ পুনরায় হারাম হয়ে যায়। যেমন, শূকরের গোশত মূলতই হারাম এবং জান বাঁচানোর আওতায় কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনে, ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ এবং প্রয়োজনের ন্যূনতম সীমা পর্যন্তই তা ব্যবহার

করা যেতে পারে। এটা হতে পারে না যে, ক্ষুধা পেলেই লোকেরা শূকর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং উদর পূর্তি করে আহার করবে আর অন্য সময়ের জন্য তা কাবাব করে রেখে দেবে। অথবা বলা যায়, মানবজীবন হত্যা মূলতই হারাম এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ। হত্যা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন পূর্ণ শতর্কতা সহকারে তা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং কেবলমাত্র ততটুকুই হত্যাকান্ড ঘটানো যায় যতটুকু বাস্তবিকপক্ষেই জরুরী প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকান্ড থেকে বিরত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ঠিক এই শর্তাবলীই গীবতের ক্ষেত্রেও আরোপিত হবে–যখন তা মূলতই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীআত প্রণেতা নয় সে তার প্রদত্ত সংজ্ঞায় যে জিনিস গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেছে সে তা কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ করে না এবং যা সে এই সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখে তার উপর উপরোক্ত শর্তাবলীর কোনটিই আরোপিত হয়না।

শরীআত প্রণেতার সংজ্ঞা ও যে ব্যক্তি শরীআত প্রণেতা নয় তার সংজ্ঞার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান–যা গীবতের প্রকৃতি ও তার বিধানের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। এখন যার ইচ্ছা শরীআত প্রণেতার কথা মানবে আর যার ইচ্ছা অন্যদের কথা অনুসরণ করবে। ইতিপূর্বে (জুন সংখ্যায়) আমি ইবনে হাজার (রহ) ও নববী (রহ)–এর যে বাক্য উধৃত করেছি তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এই মাসআলার ব্যাপারে উম্মাতের আলেমগণ সঠিক শরঈ মর্যাদা তাই বুঝেছেন যা আমি বর্ণনা করেছি। আর হাদীস বিশারদগণ রাবীগণের দোষগুণ যাচাই ও পর্যালোচনার جرح وتعدیل যে কাজ করেছেন তা এই মনে করে করেননি যে, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গোপন রাখার আকাংখা ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষত্রুটি ঢাক বাজিয়ে প্রচার করে বেড়ানো তাদের জন্য মূলতই এবং সাধারণতই বৈধ, বরং তাঁরা এই কাজ আসলেই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত মনে করেই করেছেন। এজন্য তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। তাই তাঁরা শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের দোষত্রুটি যাচাই করেছেন এবং তাদের এমন সব দোষত্রুটি যাচাই করেছেন যার প্রভাব হাদীসের যথার্থতার উপর প্রতিফলিত হতে পারে। এজন্য তাঁরা সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে গেছেন, এই সীমা তাঁরা সাধারণত লংঘন করেননি। আর যে কেউ তা অতিক্রম করলে অপরাপর মুহাদ্দিসগণ তার প্রতিবাদকরেছেন।

কোন ব্যক্তি হয়ত যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, অমুক অমুক কাজের যেহেতু হুকুম দেয়া হয়েছে–তাই এই হুকুম পালন করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের অনুপস্থিতিতে তাদের যে দোষত্রুটি বর্ণনা করা হবে তা সরাসরি হালাল এবং ভালো কাজ, বরং তা গীবতের সংজ্ঞা বহির্ভূত। আপনি সামান্য চিন্তা করেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, এটা সম্পূর্ণতই একটা বাতিল যুক্তি। শরীআতের কোন ইতিবাচক নির্দেশ তার কোন নেতিবাচক নির্দেশকে সরাসরি শেষ করে দিতে পারে না। ফরজ অথবা ওয়াজিব নির্দেশই হোক অথবা মুস্তাহাব বা ভালো কাজই হোক–তা কেবল শরীআত অনুমোদিত পন্থায়ই সম্পাদন করতে হবে। অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ কাজ শুধু এই যুক্তিতে বৈধ করা যায় না যে, একটি ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য তা করা হচ্ছে। আর না শরীআতের কোন নেতিবাচক নির্দেশে এমন কোন সংশোধন করা যেতে পারে–যে নিষিদ্ধ কাজ কোন ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য করা হচ্ছে তা মূলতই নিষিদ্ধ কার্যাবলীর সীমা বহির্ভূত গণ্য হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরীআত আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে এবং দরিদ্রদের খাদ্যদান খুবই পুণ্যের কাজ যা শরীআতেরও দাবী। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কি চুরি করা হালাল হয়ে যাবে? আর এই যুক্তি পেশ করা কি সঠিক হবে যে, এ কাজ মোটেই চুরি নয়, কারণ তা দরিদ্রদের অন্নদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে? নিসন্দেহে কোন কোন ইতিবাচক কাজের জন্য প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ নয়, বরং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ কোন কোন অবস্থায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু তার ভিত্তি এই নয় যে, ঐ নিষিদ্ধ কাজ অমুক ভালো কাজের জন্য করা হচ্ছে, বরং তা কেবল এমন অবস্থায়ই করা যেতে পারে যখন একটি ভালো কাজ সম্পাদন ঐ নিষিদ্ধ কাজের উপর নির্ভরশীল হয় এবং তার কল্যাণকারিতা সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ কাজের ধ্বংসকারিতার তুলনায় অধিক ব্যাপক এবং ঐ নিষিদ্ধ কাজে জড়িত না হলে উক্ত ভালো কাজের মহান কল্যাণকারিতা লুপ্ত হয়ে যায়।

বিশেষ কোন প্রয়োজনে ও যথার্থ উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। শরীআত প্রণেতা যেখানেই কারো অনুপস্থিতিতে তাকে ভর্ৎসনা করেছেন অথবা অন্যদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন–সেখানেই এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরং উক্ত নীতিমালা শরীআত প্রণেতার এ ধরনেরই বক্তব্য ও কার্যাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা যেখানে গীবত হারাম করেছেন এবং তাঁর রসূল (স) স্বয়ং তার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, কারো অনুপস্থিতিতে তার

প্রকৃত দোষত্রুটির বর্ণনা–যা তার অপছন্দনীয়–গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই হারাম কাজ কেবলমাত্র এ যুক্তিতে সাধারণভাবে বৈধ হতে পারে না যে, আপনি শরীআত প্রণেতার অন্য কোন ইতিবাচক নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য গীবতে লিপ্ত হচ্ছেন। ক্ষণিকের জন্য যদি তা মেনেও নেয়া হয় যে, বিশেষত হাদীসের রাবীগণেরই দোষত্রুটি বর্ণনা করার কোন হুকুম আল্লাহ ও তাঁর রসূল দিয়েছেন, যেমন এক ব্যক্তি জিদ ধরেছেন, তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকও বুঝতে পারে যে, এই ধরনের নির্দেশ অবশ্যই গীবতের নির্দেশের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হবে। আর তার কারণ অবশ্যই এই হবে যে, কয়েকজন জীবিত ও মৃত ব্যক্তির দোষত্রুটি বর্ণনার ক্ষতি শরীআত প্রণেতার দৃষ্টিতে দীনকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার কল্যাণের তুলনায় কম ক্ষতিকর।

–(তরজমানুল কুরআন অক্টোবর ১৯৫৯ খৃ.)

গীবত প্রসংগে আলোচনার আরেকটি দিক

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অপর এক ব্যক্তি লিখেছেনঃ

"আপনি তরজমানুল কুরআনের জুন (১৯৫৯ খৃ.) সংখ্যায় গীবত প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে খতীব আল-বাগদাদীর "আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়া" الكفاية في علم الرواية শীর্ষক গ্রন্থ থেকে হাদীসের রাবীগণের কার্যকলাপ যাচাইকারী ইমামগণের الجرح والتعديل যে বক্তব্য নকল করেছেন সেই প্রসংগে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আপনার প্রতি অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করেছেন। তিনি খতীব বাগদাদীর উপরোক্ত গ্রন্থের বাক্যসমূহ উধৃত করে বলেন যে, খতীবের দৃষ্টিভংগী আপনার দৃষ্টিভংগীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং আপনি তাঁর সমস্ত আলোচনা বর্জন করে কেবলমাত্র সেখানে আপনার মতের অনুকূল কতিপয় বাক্য উধৃত করেছেন। এই প্রসংগে আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন।"

লেখকের জবাব

আপনি আমার যে প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন তা পুনরায় পাঠ করে দেখে নিন, তাতে আমি কোথাও খতীব বাগদাদীর অভিমত প্রমাণ হিসাবে পেশ করিনি, আর না তাঁকে আমার মতের সাথে একাত্মতাকারী হিসাবে প্রকাশ করেছি। আমি একটি বিষয়ের বিধান যেখানে পরিষ্কারভাবে হাদীস থেকে পেয়ে যাচ্ছি-সেখানে খতীব বাগদাদী বা তাঁর চেয়েও বড় কোন আলেমের অভিমতের শেষ পর্যন্ত কি মূল্য দিতে পারি। আমি কেবল একজন নকলকারী হিসাবে হাদীস যাচাইকারী কতিপয় ইমামের বক্তব্য তাঁর কিতাব থেকে নকল করেছি। আমি যদি তাঁর অভিমত প্রমাণ হিসাবে পেশ করতাম তবে অবশ্য অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করা যেত।

কিন্তু যে বুজর্গ অন্যদের উপর অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করেন তাঁর নিজের মাত্র দুটি বিশ্বস্ততার নমুনা লক্ষ্য করুন। এই দুটি নমুনাই আপনার উল্লেখিত প্রবন্ধে বর্তমান আছে।

তিনি আল্লামা ইবনে হাজার (রহ) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি "এর (গীবতের) আরও একটি দিক উন্মুক্ত করেছেন। তা এই যে,

وهو ان يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدًا بذلك الافساد

"এই দোষত্রুটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হবে মূলত বিপর্যয় সৃষ্টি করা। অন্য কথায় তা এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) আলোচিত দোষত্রুটি গীবত হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য এটা জরুরী মনে করেন যে, বিপর্যয় সৃষ্টিই হবে তার উদ্দেশ্য।"

এখন আপনি ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, ৩৬১ নং পৃষ্ঠা কিছুটা দেখে নিন। সেখানে আল্লামা ইবনে হাজারের মূল বাক্য এভাবে রয়েছেঃ

الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة وهو ان يذكره في
غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدا بذلك الافساد

"চোগলখোরীর কোন কোন অবস্থার মধ্যেও গীবত পাওয়া যায়। তা এই যে, কোন ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির প্রকৃত দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।"

উপরোক্ত বাক্যে আল্লামা ইবনে হাজার (রহ) গীবতের নয়, বরং চোগলখোরীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং এই কথা বলতে চাচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে শুধু তার দোষত্রুটি সহকারে তার উল্লেখ করা হয় তবে তা গীবত। আর যদি ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা করা হয় তবে তা চোগলখোরীর আওতায় পড়বে।

বিশ্বস্ততার এর চেয়েও আশ্চর্যজনক নমুনা যা তিনি মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামীর ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, মায়েয-এর ঘটনা সহীহ মুসলিমের যে অনুচ্ছেদে باب من اعترف على نفسه بالزنا উল্লেখিত হয়েছে সেখানকার সমস্ত হাদীস তিনি অধ্যয়ন করেছেন। আর এসব হাদীস পাঠে তিনি যা অনুধাবন করতে পেরেছেন তা এই যে, "পাথর নিক্ষেপে হত্যার ঘটনার বহু পূর্ব থেকেই সে কুখ্যাত ছিল এবং তার কোন কোন চরম নৈতিক দুর্বলতার কারণে মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সটকে পড়েছিল। কিন্তু ইসলামে যেনার শাস্তি যেহেতু খুবই কঠোর, তাই সে যতক্ষণ পরিষ্কারভাবে আইনের আওতায় আসেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে মহানবী (স) কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।"

এখন সহীহ মুসলিমের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি বের করে কিছুটা দেখে নিন। এই অনুচ্ছেদের অধীনে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, মায়েয

যখন মহানবী (স)–এর সামনে চারবার যেনার কথা স্বীকার করেন তখন তিনি তার গোত্রের লোকদের জিজ্ঞেস করেন যে, সে কেমন লোক। তারা বলেন–

ما نعلم به بأسا الا انه اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا ان يقام فيه الحد

"আমাদের জানামতে তার মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে সে এমন একটি কাজ করে বসেছে যে সম্পর্কে তার ধারণা হল যে, তার পরিণাম থেকে সে মুক্তি পাবে না–যতক্ষণ তার উপর দন্ড (হদ্দ) কার্যকর না হবে।"

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স) যখন মায়েয সম্পর্কে তার গোত্রের লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন তখন তারা জওয়াব দেন–

ما نعلمه الا وفى العقل من صالحينا فيما نرى

"আমরা এতটুকুই জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী এবং আমাদের জানামতে সে ভালো লোকদের অন্তর্ভূক্ত।"

তিনি পুনর্বার তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, لا باس به ولا بعقله (তার মধ্যে কোন খারাবী নেই এবং তার জ্ঞান–বুদ্ধির মধ্যেও নয়)।

প্রশ্ন হচ্ছে–শেষ পর্যন্ত সহীহ মুসলিমের কোন্ হাদীসের ভিত্তিতে বুযর্গ সাহেব জানতে পারলেন যে, মায়েয ইবনে মালেক আগে থেকেই সমাজে কুখ্যাত হিসাবে পরিচিত ছিলেন, মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য শুধু আইনের আওতায় এসে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন?

এই কল্পনা–প্রাসাদের ভিত্তি যার উপর স্থাপন করা হয়েছে তা এই যে, "শাস্তি কার্যকর করার পরপরই মহানবী (স) একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি তার খারাপ কাজের প্রতি নিম্নোক্ত বাক্যে ইংগিত করেনঃ

أوكلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله تخلف رجل فى عيالنا له نبيب كنبيب التيس........

কমবেশী এই বিষয়বস্তু সম্বলিত চারটি হাদীস ইমাম মুসলিম (রহ) নকল করেছেন যা থেকে অনুমিত হয় যে, মায়েযের চরিত্র সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও মহানবী (স)–এর জ্ঞানে কি কথা বর্তমান ছিল"।

প্রথমত, কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরপরই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা রসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যাস ও মেজাজের পরিপন্থী ছিল। এজন্য সীরাতে পাক (মহানবীর জীবন চরিত) সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও মহানবী (স)-এর ভাষণের এমন অর্থ করতে পারে না-যে অর্থ ঐ বুযর্গ ব্যক্তি গ্রহণ করেছে। অনন্তর এই প্রসংগে হাদীসের বক্তব্যও সুস্পষ্ট নয় যে, এখানে মায়েযকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য কি না। সহীহ মুসলিমের যে চারটি রিওয়ায়াতের উধৃতি দেয়া হয়েছে তা পড়ে দেখা যেতে পারে। তার মধ্যে কোন হাদীসেই এরূপ ইংগিত নাই যে, প্রতিটি জিহাদের সময় মায়েয ইবনে মালেক পিছনে থেকে যেত এবং মুজাহিদদের মহিলাদের খারাপ করার অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুরাফেরা করতে থাকত। বরং তা থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, যেনার অপরাধের প্রথম বারের মত শাস্তি কার্যকর করার পর মহানবী (স) তাঁর ভাষণে মদীনার সেইসব লোকদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন-যারা মুজাহিদদের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পর তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরাফেরা করত। তিনি এই মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে—যখন সমগ্র মদীনা পাথর নিক্ষেপে হত্যার এই ভয়ংকর শাস্তি অবলোকন করে কেঁপে উঠেছিল—তাদের নোটিশ দিলেন যে, বর্তমানে এখানে কঠিন ফৌজদারী আইন জারী করা হল। ভবিষ্যতে যে কেউ এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে তাকেই মায়েযের অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে। শুধু এতটুকুই যে, মহানবী (স) تَخَلَّفَ رَجُلٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা থেকে এই অর্থ বের করা ঠিক হবে না যে, এই رَجُلٌ (ব্যক্তি) বলতে মায়েযকে বুঝানো হয়েছে। অপর বর্ণনায় أَحَدُهُم অথবা احدكم (তাদের মধ্যে বা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি) শব্দ এসেছে। আর মায়েয সম্পর্কে গোটা হাদীস ভান্ডারে ও রিজাল শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই যে, তিনি এ ধরনের লম্পট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে তার সম্পর্কে তো তার নিজ গোত্রের লোকদের এই শক্তিশালী সাক্ষ্য বর্তমান ছিল যে, তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ লোক এবং কোন এক সময় তার দ্বারা একটি গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি যদি লম্পট চরিত্রের লোক হতেন এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের মহিলাদের সম্ভ্রম হরণকারী হতেন তবে তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করার এবং তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠত না।

সামনে অগ্রসর হয়ে বুযর্গ সাহেব বলেন, মায়েযের উপর শাস্তির দন্ড কার্যকর হওয়ার পর সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদলের রায়

ছিল যে, তার গুনাহ তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের মতে মায়েযের অপরাধের স্বীকারোক্তি ও তার তওবার কোন গুরুত্বই ছিল না। তারা এগুলোকে এখন অতীত কাহিনীর মূল্যহীন কথা মনে করতেন এবং মায়েযের বিরুদ্ধে তাদের যে আক্রোশ ছিল তার উপর তারা পূর্ববৎ স্থির থাকেন।"

উপরোক্ত কথার ভিত্তি হাদীসের যে বাক্যের উপর রাখা হয়েছে তা বুযর্গ সাহেব নিজেই উধৃত করেছেনঃ قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته এর সঠিক তরজমা এই যে, "কেউ বলেছিল, এই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তার গুনাহ তাকে নিজের পরিধির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে।" কিন্তু বুযর্গ সাহেব এর তরজমা করেছেনঃ "একদল লোক বলত, এই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তার গুনাহসমূহ তাকে নিজের ঘূর্ণাবর্তে নিয়ে নিয়েছে।" খাতীআ (গুনাহ) শব্দের তরজমা 'গুনাহ' করা হলে এই অলিক মতবাদ হাওয়ায় বিলীন হয়ে যেত যে, মায়েয প্রথম থেকেই চরম দুষ্কৃতকারী ছিল এবং সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিশর্মা ছিলেন। এজন্য খাতাইয়া (ব. ব.) কল্পনা করে "গুনাহসমূহ" তরজমা করা হয়েছে–যাতে যেনার অপবাদ সহ এধরনের আরও অনেক অপরাধ এই সাহাবীর কাঁধে নিক্ষেপ করা যায়–যার গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার এবং জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ স্বয়ং মহানবী (সঃ) দান করেছেন এবং এই পৃথিবী থেকে যিনি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে বিদায় নিয়েছেন।

এরপর যেসব লোক মায়েয (রা) সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিল যে, "ঐ ব্যক্তিকে দেখ! আল্লাহ তাআলা তাকে পর্দাবৃত করে রেখেছিলেন, কিন্তু তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই কুকুরকে মৃত্যুর দুয়ারে না পৌছানো হয়েছে।" তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে–"তাদের মন্তব্যেও কোন সহানুভূতি বা আক্ষেপের লেশমাত্র ছিল না। বরং এসব লোক–যেমন পূর্বে বলে এসেছিল–মায়েযের পূর্বেকার কুখ্যাতির ভিত্তিতে তার সম্পর্কে খুবই কঠোর মনোভাব পোষণ করত এবং তাঁর অপরাধের স্বীকারোক্তির ব্যাপারটিকে কোন গুরুত্বই দিত না। এ কারণে আলোচিত মন্তব্যে শুধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করার আবেগই বর্তমান ছিল না, বরং অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ঘৃণা ও অসন্তোষের আবেগও বর্তমান ছিল।"

উপরোক্ত মন্তব্যের বাক্যসমূহ আপনার সামনেই বর্তমান আছে। তা থেকে কি প্রকাশ পায় যে, তারা মায়েযের কুখ্যাতির কারণে তাঁর সম্পর্কে নেহায়েত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন, তার প্রতি চরম ঘৃণা ও অসন্তোষ পোষণ

করতেন এবং মনে করতেন যে, এরকম খারাপ প্রকৃতির লোকের অনুরূপ পরিণতিই হওয়া উচিৎ? যদি তাদের প্রতিক্রিয়া তাই হত তবে তাদের একথা বলার কি প্রয়োজন ছিল যে, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর পর্দার মধ্যে ঢেকে নিয়েছিলেন, কিন্তু সে তা মানল না? এই বাক্যসমূহের অর্থ শেষ পর্যন্ত এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা চাচ্ছিলেন–আল্লাহ তাআলা যখন তার অপরাধ গোপন রেখেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও বর্তমান ছিল না তখন এই অপরাধের কথা তার গোপন রাখাই উচিৎ ছিল এবং অযথা অপরাধ স্বীকার করে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এই ব্যক্তির শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার যে আন্তরিক আকাংখা তাদের বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে তা কি এজন্য যে, তারা মায়েযের অতীত অপরাধের কারণে তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিশ্চত ছিলেন যে, এই ব্যক্তি মন্দ কাজের উচিৎ শাস্তি লাভ করেছে?

আমি এই ইতিহাসের উপর কোন পর্যালোচনা করতে চাই না। আপনি স্বয়ং দেখতে পারেন যে, শুধুমাত্র নিজের মনগড়া দৃষ্টিভংগী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে একটি মনগড়া কাহিনী দাঁড় করানো হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমের হাদীস হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে একজন সাহাবীর উপর নিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করার ব্যাপারে মোটেই দ্বিধা করা হয়নি। এরপর তো ঐ বুযর্গ সাহেবের আরোপিত প্রতিটি অপবাদই মুখ বুজে সহ্য করা উচিত।

–(তরজমানুল কুরআন অক্টোবর ১৯৫৯ খৃ.)

দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

(ক) খেলাফতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত

(খ) কর্মকৌশল ও দুটি বিপদের মধ্যে সহজতর বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাখ্যা

"কর্মকৌশল" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে প্রবন্ধকার "আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন" (কুরাইশ বংশের লোক ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হবে) শীর্ষক হাদীসের মাধ্যমে যে প্রমাণ পেশ করেছেন তার উপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্নরূপ আপত্তি উথাপিত হয়েছিল। নিম্নে এসব আপত্তির উল্লেখপূর্বক প্রবন্ধকারের পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা হচ্ছে-(সম্পাদক)।

"আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশিন" শীর্ষক হাদীস সম্পর্কে আপনি আপনার প্রবন্ধসমূহে যা কিছু লিখেছেন (বরাতের জন্য দ্র. রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬) এবং এর উপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উথাপিত হয়েছে উপরোক্ত দুটি আলোচনা দেখে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের মীমাংসা প্রদান অত্যাবশ্যক মনে হচ্ছে যার উপর নিরেট ইল্মী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে।

১. বলা হয়েছে যে, মহানবী (স)-এর এই বাণী নির্দেশ হিসাবেও নয়, সংবাদ হিসাবেও নয় এবং ওসিয়াত হিসাবেও নয়, বরং তা একটি বিবাদের মীমাংসা ছিল-যা খেলাফত সম্পর্কে কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই মনমগজে বর্তমান ছিল এবং মহানবী (স)-এর আশংকা ছিল যে, তাঁর ইন্তেকালের পর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই এই মীমাংসা করে দেন যে, তাঁর পরে কুরাইশ ও আনসারদের মধ্য থেকে কুরাইশগণই খেলাফতের (ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের) অধিকারী হবে। অন্য কথায় এটা ছিল একটা সাময়িক সিদ্ধান্ত-যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পরপরই যে বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশংকা রয়েছে তার মূলোৎপাটন। এ পর্যন্তই। এটা কি উল্লেখিত হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা হতে পারে?

২. এও বলা হয়েছে যে, মহানবী (স)–এর এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সমানাধিকারের মূলনীতি বিনষ্ট হয় না। কারণ ইসলামে সমানাধিকারের মূলনীতি একচ্ছত্র নয়, বরং যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্তের সাথে শৃংখলিত। আর এই শর্ত সমানাধিকারের মূলনীতির বিপরিত নয়। সমতার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যোগ্যতা ও উপযুক্ততার বাছবিচার না করেই যে কোন পদে সমাসীন হওয়ার দাবীদার হতে পারে। এখন যেহেতু খেলাফতের পদের জন্য যোগ্যতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, আর ঐ সময় রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কেবল কুরাইশদেরই ছিল, এজন্য আনসারদের তুলনায় তাদের খেলাফতের দাবীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, তা যোগ্যতার ভিত্তিতেই দেয়া হয়েছিল। এই যুক্তির ভিত্তিতে দাবী করা হয়েছে যে, উপরোক্ত ফয়সালার দ্বারা সমতার মূলনীতি বিনষ্ট হয় না। এই যুক্তি কি যথার্থ?

৩. এও বলা হয়েছে যে, আপনি কখনো এ হাদীসকে 'আদেশ' গণ্য করেন আবার কখনো তাকে সাধারণ বক্তব্য বা সমাচার হিসাবে প্রমাণ করেন। সুতরাং এক ব্যক্তি "চেরাগে রাহ" নামক পত্রিকার ইসলামী আইন সংখ্যার (১ খ., পৃ. ১৮০) থেকে আপনার একটি বাক্য উধৃত করেছেন–যাতে আপনি এ হাদীসকে কেবলমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণী সাব্যস্ত করেছেন এবং তার অনুজ্ঞা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। অথচ এখন আপনি তাকে অনুজ্ঞা সাব্যস্ত করছেন। এর ফলে কি এরূপ সন্দেহ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না যে, হয় আপনি বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে পারেননি, অথবা আপনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনও এই অর্থ করছেন, কখনো ঐ অর্থ?

৪. এই প্রসংগে আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর এই বাণী থেকে আপনি কোন্ মূলনীতি গ্রহণ করেছেন এবং আপনার মতে তার প্রয়োগ কোন্ বিষয়ে কিভাবে হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যদি আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোরও ব্যাখ্যা প্রদান করেন তবে খুবই ভালো হয়।

(ক) "কর্মকৌশল" ও "দুইটি বিপদের মধ্যে সহজতর বিপদ" গ্রহণের নীতির দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি?

(খ) এই নিয়ম দুইটি অনুপেক্ষণীয় মন্দের মত দুইটি অনুপেক্ষণীয় পুণ্য ও দুইটি বাধ্যতামূলক নির্দেশের মধ্যেও কি প্রয়োগ করা যায়?

(গ) আপনি কি চান যে, এখন দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নবী-রসূলগণের অনমনীয় প্রচেষ্টার পথ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নমনীয় ও আপোষমূলক

পন্থায় এবং অপকৌশল ও বিপদ এড়িয়ে চলার নীতি অনুযায়ী তা চলুক এবং রাজনৈতিক স্বার্থে দীনের যে মূলনীতিরই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তাকে শরীআতের সীমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দীনী কৌশল ও কল্যাণকামিতার নামে সংশোধন করা হোক?

(ঘ) আপনি দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা হিসাবে আপনার নিজের জন্য কি এই অধিকার দাবী করেন যে, কর্মকৌশল অথবা বাস্তব রাজনীতি অথবা দীন প্রতিষ্ঠার সার্বিক কল্যাণের আওতায় দীনের হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের মধ্যে কোনটি বর্জন ও কোনটি গ্রহণ করবেন, কোনটি জায়েয ও কোনটি নাজায়েয সাব্যস্ত করবেন এবং কোনটি অগ্রগামী ও কোনটি পশ্চাদগামী করবেন?

(ঙ) যদি লোকদের হাতে শিথিলতার এই মূলনীতি তুলে দেয়া হয় যে, তোমরা দীনের মধ্যে সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে যা চাও গ্রহণ কর এবং যা চাও বর্জন করতে পার-তবে এর দ্বারা দীনের ব্যাপারে ঐক্য ও শৃংখলা বরং সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে না?

(চ) এ কথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, আইন-বিধানে পরিবর্তন করার, অগ্র-পশ্চাৎ করার অথবা তাতে অবকাশ ও অনুমতি দেয়ার ও ব্যতিক্রম বের করার অধিকার স্বয়ং শরীআত প্রণেতার রয়েছে। কিন্তু শরীআত প্রণেতার এসব কার্যক্রমের উপর কিয়াস করে এবং তা থেকে কতিপয় মূলনীতি নির্গত করে অন্যরাও তাদের সামনে নতুনভাবে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থায় সমাধান পেশের অধিকার রাখে কি? আর শেষপর্যন্ত কার এই অধিকার রয়েছে?

প্রবন্ধকারের জবাব

আপনার প্রশ্নমালার ধারাবাহিকতা ভংগ করে তৃতীয় নম্বর প্রশ্নের জওয়াব আমি আগে দেব-যাতে মাঝখানে একটি আনুসংগিক আলোচনা এসে আসল বিষয় থেকে দৃষ্টি অন্যত্র না ফিরাতে পারে। "চেরাগে রাহ" সাময়িকীর আইন সংখ্যা থেকে আমার যে বাক্য উধৃত করা হয়েছে তা মূলত আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে ১৯৩৯ খৃ.-এর তরজমানুল কুরআনের আগষ্ট সংখ্যায় এক প্রাচ্যবিদের "ইসলামী আইন এবং সমাজ ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধের উপর সংক্ষিপ্ত টীকার আকারে লেখা হয়েছিল। ঐ সময় পর্যন্ত এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ আমার হয়নি এবং আমি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

মরহুমের তথ্যের উপর নির্ভর করে একটি মত প্রকাশ করেছিলাম।[১] কিন্তু পরে যখন আমি নিজে তথ্যানুসন্ধান করি তখন ঐ সিদ্ধান্ত আমার নিকট ভুল মনে হল এবং আমি ১৯৪৬ সালের এপ্রিলের তরজমানুল কুরআনে এর বিপরীত মত প্রকাশ করি–যা আপনি "খিলাফতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত" শিরোনামে রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থের ১ম খন্ডে দেখে নিতে পারেন। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে মত পরিবর্তন কোন নতুন ও আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। এটাকে কেউ যদি খারাপ অর্থে প্রয়োগ করতে চায় তবে তা করার অধিকার তার রয়েছে। আমার মত পরিবর্তনের কারণসমূহ আপনি আগে দেখে নিবেন।

এখন মূল বিষয়গুলো আলোচনা করা যাক। আপনি আপনার ১ নম্বর প্রশ্নে মহানবী (স)–এর বাণীর যে তাৎপর্য নকল করেছেন তাতে প্রথম অবোধগম্য কথা এই যে, কোন ব্যাপারে একটি হুকুম দেয়া এবং কোন বিবাদের মীমাংসা করে দেয়ার মধ্যে শেষপর্যন্ত কি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, তা নির্দেশ (অনুজ্ঞা) ছিল না, বরং ছিল একটি বিবাদের মীমাংসা। তারপর এ কথাও বুঝে আসে না যে, রসূলুল্লাহ (স) খেলাফতের হকদার হিসাবে কুরাইশদের আনসারদের উপর অথবা সমগ্র আরব ও অনারবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকলে তাতে আলোচ্য বিষয়ের উপর শেষপর্যন্ত কি প্রভাব পড়ে।

কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য এ দুটি কথা উপেক্ষা করে যদি আপনি নিজে উপরোক্ত ব্যাখ্যার বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা করেন তবে অনুভব করতে পারবেন যে, তা কেবল একটি মনগড়া ব্যাখ্যা যার পেছনে অনুমান ও অযথা দাবী ছাড়া আর কোন দলীল–প্রমাণ নেই। হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গোটা ভান্ডারে বাস্তবিকপক্ষে এমন কোন সাক্ষ্য বর্তমান আছে কি যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে খেলাফত সম্পর্কে কোন বিবাদের অস্তিত্ব ছিল? সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা তো এই ছিল যে, তাঁরা মহানবী

---

১. এর ইতিহাস এই যে, খেলাফত আন্দোলনের সূচনায় ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণ এই প্রশ্ন তুলেছিল যে, এবং তারপর ইংরেজ সরকার কতিপয় মৌলভী সাহেবের নিকট থেকে এর সমর্থন আদায় করেছিল যে, (তুরস্কের) উসমানী খেলাফতই তো অবৈধ। কারণ তারা কুরাইশ বংশীয় নয়। আর শরীআতের দৃষ্টিতে খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া শর্ত। এর উপর মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুম ১৯২০ খৃ. কলিকাতায় খেলাফত কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। তা পরবর্তীকালে "মাসআলায়ে খিলাফত ও জাযীরাতুল আরব" শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে তিনি অত্যন্ত জোরাল ভাষায় বলেছিলেন যে, মহানবী (স)–এর বাণী "আল–আইম্মাতু মিন কুরাইশিন" মূলতই অনুজ্ঞাসূচক ছিল না, বরং তা ছিল শুধুমাত্র একটি খবর (ভবিষ্যদ্বাণী) যা তিনি ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে দিয়েছিলেন। মাওলানার ঐ আলোচনার প্রভাব আমার মনমগজে ক্রিয়াশীল ছিল–যার আলোকে আমি পূর্বোক্ত টীকায় আমার মত প্রকাশ করেছিলাম (প্রবন্ধকার)

(স)–এর মৃত্যুর ধারণাও বরদাশত করতে পারতেন না। আর কোথায় মহানবী (স)–এর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায়ই নিজ নিজ স্থানে বসে এই চিন্তা করবেন যে, কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এই চিন্তার এমন সীমায় পৌছে যাওয়া যে, তা আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বিবাদের রূপ ধারণ করবে।

এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা যা সামান্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত ঘরে বসে রচনা করা হয়েছে। উপরন্তু এর উপর আরো একটি কল্পনার প্রাসাদ দাড় করানো হয়েছে যে, মহানবী (স) কুরাইশদের খেলাফতের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে যা কিছুই বলেছেন মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল এই বিবাদের মীমাংসা। প্রশ্ন হচ্ছে–শেষ পর্যন্ত কিসের সাহায্যে কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)–এর এই উদ্দেশ্যের জ্ঞান লাভ করেছে? স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) কি এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন? অথবা তাঁর বক্তব্য অথবা তা থেকে এমন কোন ইংগিত পাওয়া যায় যার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়? অথবা মহানবী (স)–এর পরে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে কি কেউ তাঁর উপরোক্ত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন? যদি এর কোনটিই না হয়ে থাকে তবে শেষ পর্যন্ত এই দুঃসাহসের কোন সীমা আছে কি যে, মানুষ যে জিনিসকেই ইচ্ছা বিনা দলীল–প্রমাণে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য বলে চালিয়ে দেবে?

কুরাইশদের ইমামত সম্পর্কে মহানবী (স)—এর বাণী

হাদীসের ভান্ডারে মহানবী (সঃ) থেকে এ বিষয় সম্পর্কে কোন একটি কথাও বর্ণিত নাই। বরং তিনি বিভিন্ন স্থানে তা বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেন। এসব বর্ণনা স্বয়ং দেখে নিন এবং বলুন তাতে কোথায় এই উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীতে হযরত মুআবিয়া (রা)–এর সূত্রে বর্ণিত আছেঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر فى قريش
لايعاديهم احد الاكبه الله فى النار على وجهه ما اقاموا الدين

"আমি রসূলুল্লাহ (স)–কে বলতে শুনেছিঃ এই কাজ (দায়িত্ব) কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। যে ব্যক্তিই এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করবে–তাকে আল্লাহ তাআলা উপুর করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন– যতক্ষণ তারা দীন কায়েম করতে থাকবে।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ) তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর সূত্রে মহানবী (সঃ)–এর একটি ভাষণ উধৃত করেছেন–যাতে তিনি কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেনঃ

اما بعد يا معشر قريش فانكم اهل هذا الامر ما لم تعصوا الله فاذا عصيتموه بعث اليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب

"অতপর হে কুরাইশগণ! তোমরা এই কাজের যোগ্য বিবেচিত হবে যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হবে। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তবে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন কাউকে পাঠাবেন– যে তোমাদের চামড়া এমনভাবে তুলে নেবে যেমনিভাবে এই ডালের চামড়া তোলা হয়।"

মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী–তে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) বলেনঃ–

الأئمة من قريش ما عملوا بثلاث، ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوفوا فمن لم يفعل ذالك منهم فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين۔

"ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে যতক্ষণ তারা তিনটি বিষয়ের উপর আমল করবেঃ যখন হুকুম করবে ন্যায়–ইনসাফ সহকারে করবে, তাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করলে তারা অনুগ্রহ করবে এবং তারা যখন প্রতিশ্রুতি দেবে তখন তা পূর্ণ করবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা না করবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।"

উপরোক্ত দুজন ইমাম প্রায় একই বিষয়বস্তু ও শব্দ সম্বলিত হাদীস হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহ) ও ইমাম বায়হাকী (রহ) আতা (রহ)–এর মুরসাল হাদীস নকল করেছেন যে, মহানবী (স) কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন–

انتم اولى الناس بهذا الامر ما كنتم على الحق الا ان تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة۔

"তোমরা রাষ্ট্রপ্রধানের পদের জন্য অন্য লোকদের তুলনায় অধিক যোগ্য– যতক্ষণ তোমরা সত্যের উপর অবিচল থাকবে। কিন্তু তোমরা যদি সত্য

থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের চামড়া এমনভাবে তুলে নেয়া হবে যেভাবে এই ডালের ছাল তুলে নেয়া হয়।"

ইমাম বায়হাকী (রহ), তিবরানী (রহ) ও শাফিঈ (রহ) একাধিক সনদসূত্রে মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী নকল করেছেন- قدموا قريشا ولا تقدموها "কুরাইশদের সামনে দাও, তাদের অতিক্রম করে সামনে যেও না।" মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে- قريش ولاة الناس "কুরাইশগণ জনগণের নেতা ও পথপ্রদর্শক।"

উপরোক্ত হাদীসসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উল্লেখিত রিওয়ায়াতগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, মহানবী (স) তাঁর ইন্তেকালের পরপরই খেলাফতের বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সম্ভাব্য কোন বিবাদের মীমাংসো করেননি, বরং স্বতন্ত্রভাবে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, কুরাইশদের মধ্যে যতক্ষণ বিশেষ কয়েকটি গুণ বর্তমান থাকবে ততক্ষণ অন্যদের তুলনায় (তাদের মধ্যে অনুরূপ গুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) খেলাফতের পদে তারাই অগ্রগণ্য হবে। এ ব্যাপারে কেবল আনসারদের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্নটি ছিল না, বরং সমগ্র আরব-অনারব মুসলিমদের উপর এই বংশের শর্তসাপেক্ষ প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়ার ফয়সালা দেয়া হয়েছে। উম্মাতের সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে উপরোক্ত হাদীসসমূহের এই অর্থই বুঝেছেন এবং ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে কেবল খারিজী ও মুতাযিলাদের ব্যতীত কারো দ্বিমত বর্ণিত হয়নি।

কুরাইশদের ইমামত (নেতৃত্ব) সম্পর্কে উম্মাতের আলেমগণের অভিমত

আবদুল কাহের আল-বাগদাদী (মৃ. ৪২৯ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল ফারক বাইনাল ফিরাক'-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে এমন পনেরটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার উপর ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফিরকাসমূহের মুকাবিলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ১২ নং মূলনীতি নিম্নরূপঃ

"ইমামত (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠা উম্মাতের উপর ফরয ও ওয়াজিব...এই উম্মাতের মধ্যে নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে

বাছাই করা... এবং তাদের সকলের মতে ইমামতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া শর্ত"-(পৃ. ৩৪০-১)।

আল্লামা ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.) আল-ফিসাল ফিল-মিলাল ওয়ান-নিহাল গ্রন্থে লিখেছেনঃ "আহলুস-সুন্নাহ, সমস্ত শীআ, কোন কোন মুতাযিলা ও মুরজিআদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাব এই যে, বিশেষত কুরাইশদের ছাড়া ইমামত জায়েয নয়...এবং সমস্ত খারিজী, মুতাযিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং কতিপয় মুরজিআর মাযহাব এই যে, এই পদ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জায়েয-যে কিতাব ও সুন্নাতের উপর অবিচল-চাই সে কুরাইশ বংশীয় হোক, অথবা সাধারণ আরব, অথবা কোন ক্রীতদাস। দিরার ইবনে আমর আল-গাতাফানী বলেন, ক্রীতদাস ও কুরাইশী দুই ব্যক্তিই যদি কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করে তবে ক্রীতদাসকেই অগ্রবর্তী করা আবশ্যক। কারণ নীতি বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া সহজ হবে। (অতপর ইবনে হাযম তাঁর নিজস্ব পর্যালোচনা পেশ করেন যে,) ফিহ্‌র ইবনে মালেকের বংশধরদের জন্য ইমামত নির্দিষ্ট করার বাধ্যবাধকতা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছি যে, তিনি ইমামতের পদ কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উপদেশ দিয়েছেন। এবং এই রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে। এই রিওয়ায়াত সহীহ হওয়ার সপক্ষে সর্বপ্রধান দলীল এই যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বানী সায়েদার সম্মেলন কেন্দ্রে এই সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করে দেন। অথচ তা ছিল তাদেরই শহর, উপায়-উপকরণ ও জনশক্তিও তাদের অধিক ছিল এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারেও তাদের অবদান কোন অংশে কম ছিল না। রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের মাধ্যমে যদি বিষয়টি চূড়ান্ত না হয়ে যেত যে, ইমামতের ক্ষেত্রে অন্যদের অধিকার তাদের তুলনায় অগ্রগণ্য-তবে তারা নিজেদের ইজতিহাদের বিপরীতে অন্যদের ইজতিহাদ মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন না"-(৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৯)।

আবদুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী (মৃ. ৫৪৮ হি.) নিজ গ্রন্থ আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল-এ লিখেছেন যে,

ان الامة اجتمعت على انها لا تصلح لغير قريش

"কুরাইশদের মধ্য থেকে ইমাম হওয়া জরুরী, তাদের ছাড়া অন্যদের ইমাম বানানো সংগত নয়"-(১ম খন্ড, পৃ. ১০৬)।

ইমাম নাসাফী (মৃ. ৫৩৭ হি.) তাঁর আকাইদুন-নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন-

وينبغي ان يكون الامام من قريش ولا يجوز من غيرهم۔

"কুরাইশদের মধ্য থেকে ইমাম হওয়া অত্যাবশ্যক। তাদের ব্যতীত অপর কাউকে ইমাম বানানো বৈধ নয়।"

উপরোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লামা তাফতাযানী (রহ) শারহ আকাইদিন নাসাফী-তে লিখেছেন, "উপরোক্ত বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খারিজীগণ ও কতিপয় মুতাযিলা ব্যতীত কেউ-ই এই বিষয়ে মতবিরোধ করেনি।"

কাদী আয়াদ (মৃ. ৫৪৪ হি.) লিখেন যে, "ইমামত্বের পদে সমাসীন হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া সমস্ত আলেমের নিকট অপরিহার্য শর্ত। তাঁরা এই বিষয়টিকে ইজমা প্রসূত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন"-(নববী কৃত মুসলিমের শরাহ, কিতাবুল ইমারা)।

ইমাম নববী (মৃ. ৭৭৬ হি.) মুসলিম শরীফের শরাহ গ্রন্থে লিখেছেন- "এসব হাদীস এবং অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, খিলাফতের পদ কুরাইশদের জন্য সুনির্দিষ্ট। তাদের ছাড়া অন্য কাউকে এই পদে অধিষ্ঠিত করা জায়েয নয়। এই বিষয়ের উপর সাহাবীদের যুগে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের পরেও এই ইজমা প্রতিষ্ঠিত আছে"-(কিতাবুল ইমারা, বাবুল খেলাফাতু ফী কুরাইশ)।

এসব মহান আলেম ৮ম হিজরী শতক পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত বিষয়ে ইজমার কথা উল্লেখ করে এসেছেন। ৯ম শতকের কাছাকাছি পৌঁছে আল্লামা ইবনে খালদূন খবর দেন যে, এই ইজমা ভংগ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। তা এই কারণে নয় যে, ঐ সময় মহানবী (স)-এর বাণীর কোন নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, বরং তার কারণ এই যে, কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন দুর্বল হয়ে পড়ল এবং অনবরত আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করতে করতে তাদের ঐক্যশক্তি শেষ হয়ে গেল এবং রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারটি তাদেরকে গোটা মুসলিম এলাকায় ছড়িয়ে দিল তখন তারা খেলাফতের দায়িত্ব বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং তাদের তুলনায় অনারব মুসলিমদের প্রভাব এতটা বৃদ্ধি পেল যে, সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাঁরাই মালিক হয়ে গেল। এ কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ আলেমের সামনে ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল এবং তাঁরা এই মত প্রকাশ করতে থাকেন যে, এখন খেলাফতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আর অবশিষ্ট নেই"-(মুকাদ্দিমা, পৃ. ১৯৪)।

অবশেষে ১০ম শতকে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের একটি বিরাট দল যে তুর্কি উসমানী খেলাফতেকে স্বীকার করে নেন –ইবনে খালদুনের উপরোক্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান কারণগুলোই ছিল তার ভিত্তি। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন যে, উম্মাতের আলেমগণ কি মহানবী (স)–এর হাদীসগুলোকে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যেকার কোন বিবাদের সাময়িক ফয়সালা মনে করেছিলেন, না কতিপয় গুণাবলী বর্তমান থাকার শর্ত সাপেক্ষে একটি স্থায়ী সাংবিধানিক নির্দেশ মনে করতেন? একথা কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যে, গোটা উম্মাতের আলেমগণ সম্মিলিতভাবে একটি হাদীসের তাৎপর্য অনুধাবনে ভুল করে থাকবেন এবং শত শত বছর ধরে সেই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবেন?

খেলাফতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তের তাৎপর্য

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি পর্যালোচনা করে দেখা যাক। একথা হৃদয়ংগম করতে খুব একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই যে, "যোগ্যতা ও উপযুক্ততা"–র প্রয়োগ শুধুমাত্র ঐসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উপর আরোপিত হয় যা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। তা এমন কোন গুণাবলীর উপর প্রযুক্ত হতে পারে না–যা কোন ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না –যতক্ষণ সে কোন বিশেষ বংশে, গোত্রে, দেশে বা বিশেষ বর্ণ ও ভাষাভাষীর মধ্যে জন্মগ্রহণ না করবে। সমতা বা সমানাধিকারের মূলনীতির সাথে যদি সামঞ্জস্য থেকে থাকে তবে প্রথমোক্ত গুণাবলীরই এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। আপনি হয়ত টানাহেঁচড়া করে শেষোক্ত গুণাবলীর সাথে "যোগ্যতা" পরিভাষার প্রয়োগ করে বসতে পারেন, কিন্তু এ ধরনের "যোগ্যতা"–কে কোন পদের উপযুক্ত হওয়ার জন্য শর্ত সাব্যস্ত করাটা "সমতার মূলনীতির" সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

উদাহরণতঃ আপনি যদি বলেন, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তিই আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ সে–ই বিচারক হওয়ার যোগ্য—তবে এ কথা এদেশের লোকদের অধিকারের বেলায় সমতার নীতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে পারে। কিন্তু উদাহরণতঃ আপনি যদি বলেন, একজন জাঠ আইনজ্ঞই কেবল পাকিস্তানের বিচারকের পদের যোগ্য হতে পারে তবে একথাটিকে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকই সমানাধিকারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মেনে নেবে না। এর সমর্থনে আপনি যতই কথার কামান দাগান যে, বিচারালয়ের জন্য আইনগত প্রভাব–প্রতিপত্তির প্রয়োজন আছে এবং এখানে দীর্ঘকাল যাবত জাঠদেরই আইনগত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে–তাই জাঠ

গোত্রভুক্ত হওয়াও যোগ্যতারই একটি অংশ। কিন্তু আপনার কোন বাকপটুত্বই সোজা বুদ্ধির অধিকারী কোন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারবে না যে, এই বিশেষ প্রকারের যোগ্যতা বিচার বিভাগীয় পদের জন্য শর্ত গণ্য করা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সকল পাকিস্তানীদের সমতার মূলনীতি অটুক থাকে। সে বলবে যে, আপনি যদি আপনাদের এখানকার বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এরূপ করে থাকেন তবে পরিষ্কার বলে দিন যে, আপনারা সার্বিক কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে তা করছেন। শেষ পর্যন্ত আপনি গায়ের জোরে সমতার মৌলনীতির গোল ছিদ্রে যোগ্যতার এই নতুন মতবাদের চৌকোনা পেরেক অযথা কেন ঠুকছেন।

সত্য কথা এই যে, ইসলামী শরীআত তার কোন বক্তব্যের যথার্থতা ও সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের অর্থহীন মনগড়া কথার মুখাপেক্ষী নয়। সহজ এবং সোজা কথা এই যে, ইসলাম তার নিজস্ব জীবন-ব্যবস্থায় বংশ, স্থান ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে সমান অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী। এখানে যে কোন ব্যক্তি যে কোন পদের যোগ্য-যদি তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা থেকে থাকে-চাই সে কৃষ্ণ অথবা সাদা, আরব বা অনারব, সিরীয় অথবা ইরাকী যাই হোক -খেলাফতের পদ ব্যতীত আর সমস্ত পদের বেলায় এই মূলনীতি প্রথম দিন থেকেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কার্যত বলবৎ করা হয়েছে। স্বয়ং খিলাফতের পদের ক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টি এই ছিল যে,

اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشى-

"শোন এবং মানো-হাবশী গোলামকেই তোমরাদের নেতা নিয়োগ করা হোক না কেন।"

কিন্তু এ বিশেষ পদটির জন্য ঐ সময়ে যে কারণে কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তা এই যে-ইসলামী খেলাফতের জন্য আরবদের এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেরুদন্ড হিসাবে ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন ছিল এবং আরবদের মধ্য থেকে তখন পর্যন্ত গোত্রীয় মনোভাব কার্যত এতটা দূরীভূত হতে পারেনি যে, যে কোন মুসলমানকে খলীফা বানিয়ে দিলে তার নেতৃত্ব তারা সহজে মেনে নিতে পারে এবং একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। এই কারণে এমন একটি আরব গোত্রকে খেলাফতের কর্ণধার বানিয়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করা হল-যাদের নেতৃত্ব এক দীর্ঘকাল যাবত আরবদেশে স্বীকৃত হতে পারে, যাদের নেতৃত্বে আরবদের ঐক্যবদ্ধ রাখা যেতে পারত এবং যাদের শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে সক্ষম ছিল। এটাই

ছিল সেই সার্বিক কল্যাণকর ব্যবস্থা যা রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিভিন্ন সময়কার বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে সাকীফায়ে বাণী সায়েদার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) সাহাবীগণের ভরা মজলিসে হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন-

لقد علمت يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وانت قاعد، قريش ولاة هذا الامر فبرّ الناس تبع لبرهم

وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال سعد صدقت -

"হে সা'দ! আপনি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন এবং তখন আপনি বসা ছিলেনঃ "কুরাইশগণ এই নেতৃত্বের মুতাওয়াল্লী। সৎ লোকেরা তাদের মধ্যেকার সৎ লোকদের অনুসরণ করে এবং খারাপ লোকেরা তাদের খারাপ লোকদের অনুসরণ করে।" সা'দ (রা) বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন (নং ১৮)

একই ভাষণে আবূ বাক্‌র (রা) আরও বলেন-

ولم تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش-

(مرويات عمر فاروق حديث ٣٩١)

"আরবরা এই কুরাইশ বংশীয়দের ছাড়া অপর কারো নেতৃত্বের সাথে পরিচিত নয়। (নং ৩৯১)।"

একই গ্রন্থে সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে-

سمعت اذناى ووعاه قلبى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الناس تبعٌ لقريش صالحهم تبع لصالحهم وشرارهم تبعٌ ـ

لشرارهم - (حديث ٧٩٠)

"আমার এই দুই কান রসূলুল্লাহ (স)-এর একথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছেঃ লোকেরা কুরাইশদের অনুসারী। তাদের মধ্যেকার সৎ লোকেরা কুরাইশদের মধ্যেকার সৎ লোকদের এবং খারাপ লোকেরা তাদের মধ্যেকার খারাপ লোকদের অনুসরণ করে"-(হাদীস নং ৭৯০)।

একই বিষয়বস্তু সবলিত হাদীস সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা)-এর সূত্রেও বর্ণিত আছে। তা থেকে পরিষ্কার

জানা যায় যে, মহানবী (স) যার ভিত্তিতে কুরাইশদের জন্য খেলাফতের পদ সুনির্দিষ্ট করার উপদেশ দিয়েছেন তা এই যে, আরব উপদ্বীপে দীর্ঘকাল যাবত তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজিত ছিল। সমতা ও সমানাধিকারের মৌলনীতি কায়েম করার জন্য ঐ সময় খেলাফতের পদ যদি আরব-অনারব যে কোন মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত রাখা হত এবং কোন অ-কুরাইশী আরব বা অনারব মুসলমান অথবা ক্রীতদাসকে খলীফা নির্বাচন করা হত তবে শুধু আরব গোত্রগুলোই বিদ্রোহী হত না, বরং কুরাইশদের মধ্যেকার খারাপ লোকেরাও বিদ্রোহ ঘোষণার সুযোগ পেত এবং কুরাইশদের বিরাট অংশ ইসলামী খেলাফতের বিরোধিতায় লিপ্ত হত। এর ফলে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাই সুদৃঢ় হতে পারত না যার অসংখ্য কল্যাণকর নীতির মধ্যে সমতার এই একটি মূলনীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই রসূলুল্লাহ (স) এই পরিস্থিতিতে কুরাইশদের মধ্যেকার উত্তম লোকদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়াকে উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেছেন-যাতে এই বংশের সম্মিলিত শক্তি ইসলামী খেলাফতের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠপোষক হতে পারে। এই অবস্থায় ইসলামী জীবনব্যবস্থা বিজয়ী, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হওয়ার অধিক সম্ভাবনা ছিল এবং তা যখন পূর্ণরূপে কার্যকর ও সুদৃঢ় হবে তখন যেখানে অসংখ্য কল্যাণকর নীতি কায়েম হবে সেখানে একদিন খেলাফতের ব্যাপারেও সমতা ও সমানাধিকারের মূলনীতি কায়েম হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

কুরাইশদের ইমামত (নেতৃত্ব) সম্পর্কিত হাদীস থেকে গৃহিতব্য মূলনীতিসমূহ

মহানবী (স)-এর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। এই সিদ্ধান্ত থেকে যেসব মূলনীতি নির্গত হয় তা নিম্নরূপঃ

১. এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারাই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করতে ও তা পরিচালনা করতে চান তারা যেন চোখ বন্ধ করে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে ইসলামের সম্পূর্ণ নকশা একবারেই ব্যবহার না করেন। বরং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে কাল ও স্থানীয় অবস্থাকে একজন মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি ও একজন ফকীহ-এর দূরদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সাহায্যে সঠিকভাবে যাচাই করা উচিৎ। যেসব নির্দেশ ও মূলনীতি কার্যকর করার অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করবে তা কার্যকর করবে এবং যেসব বিধান ও মূলনীতির জন্য পরিবেশ অনুকূল না হবে তা কার্যকর করতে আপাতত

বিলম্ব করে প্রথমে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। এই জিনিসের নাম হচ্ছে হিকমাত (কৌশল) বা কর্মকৌশল–যার মাত্র একটি নয় বরং অসংখ্য দৃষ্টান্ত আইন প্রণেতার বাণী ও কর্মপন্থার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তা থেকে জানা যায় যে, ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারটি নির্বোধ লোকদের কাজ নয়।

২. আলোচ্য হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, স্থান–কাল ও পরিবেশ–পরিস্থিতির কারণে ইসলামের দুইটি নির্দেশ অথবা মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্যত যখন বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়ে যায়, অর্থাৎ দুইটি বিধানের উপর যুগপৎ আমল করা সম্ভব নয়, তখন দেখতে হবে যে–শরীআতের দৃষ্টিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ কোনটি। অতপর যেটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে তা কার্যকর করার স্বার্থে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ স্থগিত রাখতে হবে–যতক্ষণ উভয়টির উপর একই সময় আমল করা সম্ভব না হবে। যে সীমা পর্যন্ত এরূপ করা অপরিহার্য–কেবল সেই পর্যন্তই তা করা যাবে। মহানবী (স) ইসলামী খেলাফতের স্থায়িত্বকে সমতা বা সমানাধিকারের মৌলনীতি কার্যকর করার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ খেলাফতের স্থায়িত্বের উপর পূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতা নির্ভরশীল ছিল।

উপরোক্ত মৌল বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অংশের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আপনি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমতার মূলনীতিকে সম্পূর্ণরূপে নয়–বরং তার একটি অংশমাত্র অকেজো রেখেছেন যা খেলাফতের পদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কারণ ঐ সীমা পর্যন্তই উক্ত মূলনীতি অকার্যকর রাখা অপরিহার্য ছিল। দুটি বিপদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিপদের ঝুঁকি গ্রহণের মূলনীতির এটি একটি দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা উক্ত মূলনীতি কার্যকর হওয়ার স্থান–কাল–পাত্রও জ্ঞাত হওয়া যায় এবং তার সীমা ও শর্তাবলীও অবগত হওয়া যায়।

৩. মহানবী (স)–এর উপরোক্ত বাণী ও কার্যক্রম থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যেখানে বংশীয়, গোত্রীয় বা অন্য কোনরূপ অনমনীয় মনোভাব প্রভাবশীল রয়েছে–সেখানে এই মনোভাবের সাথে সরাসরি বিরোধে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। বরং যেখানে যাদের প্রভাব রয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সৎ লোকদেরকে সামনে অগ্রসর করে তাদের সম্মিলিত শক্তিকে ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর করার বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে তার সাহায্যকারী বানানো যেতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত সৎ লোকদের অগ্রণী ভূমিকার ফলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যেখানে প্রতিটি মুসলমান কেবল নিজের দীনী,

নৈতিক ও মানসিক যোগ্যতার ভিত্তিতে বংশ-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে। এটাও হিকমাত ও কৌশলেরই একটি অংশ যাকে 'কর্মকৌশল'-এর নামে স্মরণ করার অপরাধ আমি করেছি।

মহানবী (স)-এর কথা ও কার্যক্রম থেকে আমি যেসব মূলনীতি নির্গত করেছি-যদি তার মধ্যে কারো দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু ধরা পড়ে তবে তিনি যেন যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন। এখন আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে-এ ধরনের চর্চা করার অধিকার কেবল আইন প্রণেতারই রয়েছে, অপর কেউ তার চর্চা করার অধিকারী নয়। এ ব্যাপারে আমি শুধু এতটুকু আবেদন করব যে, এই কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে ইসলামী ফিক্হ-এর ভিত্তিই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। কারণ তার সার্বিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধির ভিত্তিই তো এই ছিল যে, আইন প্রণেতার (মহানবী স.) যুগে যেসব সমস্যা ও ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়েছিল এবং তিনি তার যে সমাধান দিয়েছেন এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন-সেগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আইন প্রণেতার পরে উদ্ভূত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এখন এই পথ বন্ধ করে দিলে ইসলামী ফিক্হ শুধুমাত্র মহানবী (স)-এর যুগে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান পেশের জন্যই থেকে যাবে এবং আমাদের সমসাময়িক কালে উদ্ভূত নতুন সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ব। এটা আপনার চতুর্থ প্রশ্নের জওয়াব। এখন আমি আপনার এই প্রশ্নের প্রতিটি অংশ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলব।

কর্মকৌশল কি?

(ক) কর্মকৌশল-এর ব্যাখ্যা আমি উপরে করেছি। সংক্ষেপে তার অর্থ এই যে, আমরা যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে কাজ করছি-দীনের প্রতিষ্ঠা ও শরীআতের বিধান কার্যকর করার সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাধান পেশ ও কর্মপন্থার মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যার ফলে শরীআতের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে শরীআতের বিধান ও মৌলনীতির প্রয়োগ করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্যই যেন তিরহিত না হয়ে যায়-সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু এই কৌশল অবলম্বনও নিঃশর্ত নয়, বরং তার জন্য দীনের গভীর জ্ঞান এবং শরীআতের মেজাজ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন রয়েছে- যাতে লোকেরা আইন প্রণেতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নিকটতর সম্ভাব্য পন্থা ও কার্যক্রম অবলম্বন করতে পারে। আর এই কৌশল সমর্থনযোগ্য অথবা

প্রত্যাখ্যানযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে-কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ ব্যাপারে যখন তার প্রয়োগ করতে যাবে তখন তাকে কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাত (হাদীস) থেকে তার ফতোয়ার বা কর্মপন্থার সমর্থনে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করবে-যাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সে আইন প্রণেতার কোন কার্যক্রমের উপর কিয়াস করে অথবা কোন হাদীসের ভিত্তিতে তা করেছে।

দুটি বিপদের মধ্যে
সহজতর বিপদ গ্রহণের মূলনীতি

দুটি বিপদের মধ্যে সহজতর বিপদটি গ্রহণের মূলনীতি এই যে—কোন ব্যক্তি যখন এমন কোন পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় যেখানে দুটি অকল্যাণের মধ্যে একটি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে-তখন সে শরীআতের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর অকল্যাণকে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে যখন একই সময় শরীআতের দুটি মূল্যবোধ অথবা উদ্দেশ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথবা দুটি বিধানের উপর যুগপৎ আমল করা সম্ভব না হয় তখন ঐগুলির মধ্যে শরীআতের দৃষ্টিতে যেটির মূল্য ও গুরুত্ব অধিক –সেটি গ্রহণ করবে এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লাভের জন্য এতটা পরিত্যাগ করতে হবে-যতটা এ স্থানে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এই মূলনীতির প্রয়োগও নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(ক) কোন ব্যক্তি যে বিষয়কে অপর যে বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ তাকে কিতাব ও সুন্নাত থেকে পেশ করতে হবে এবং তাকে আরও প্রমাণ করতে হবে যে, এই সময় এই অগ্রাধিকার প্রদান বাস্তবিকই অপরিহার্য ছিল।

(খ) এই মূলনীতি সম্পর্কে যে ব্যক্তি এই কথা বলে যে, এটা কেবলমাত্র দুটি খারাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং দুটি কল্যাণ অথবা দুটি নির্দেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না- সে একটি ভুল কথা বলে। উপরে স্বয়ং মহানবী (স)-এর জীবনাচার থেকে আমি এর একটি উদাহরণ পেশ করছি। আরও একটি উদাহরণ মহানবী (স)-এর যুগেরই –যা আহযাব যুদ্ধের পরপরই ঘটেছিল। বুখারী, মুসলিম, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে সা'দ, ইবনে ইসহাক প্রমুখ বিভিন্ন সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আহযাব যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পরপরই মহানবী (স) সাহাবীদের একটি দলকে বানূ কুরাইযার জনপদে

আভযান পরিচালনার নির্দেশ দেন এবং তাকিদ করে বলে দেনঃ "তোমাদের কেউ তথায় না পৌঁছা পর্যন্ত আসরের নামায (কোন কোন বর্ণনায় যুহরের নামায) পড়বে না।" কিন্তু পথিমধ্যে তাদের বিলম্ব হয়ে গেল এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছিল। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না যে, তাঁরা নির্ধারিত সময়ে নামায পড়ার সাধারণ নির্দেশ পরিত্যাগ করবেন–না রসূলুল্লাহ (স)–এর এই বিশেষ নির্দেশ পরিত্যাগ করবেন? অবশেষে কতিপয় সাহাবী এই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা নামায পড়ে নেবেন অতপর সম্মুখে অগ্রসর হবেন। তাদের যুক্তি এই ছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) তো চাচ্ছিলেন যে, আমরা অতি শীঘ্র রওনা করে সেখানে পৌঁছে যাই, আমরা নামায পড়ব না তা তো তিনি চাননি। কারণ তিনি পরিষ্কার বাক্যে এই হুকুম দিয়েছেন। পরে তাঁর সামনে এই ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি তাদের কারও কার্যক্রম ভ্রান্ত বলেননি। এখন দেখে নিন–এখানে যখন দুইটি বাধ্যতামূলক নির্দেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিল তখন তার কোন একটিকে পরিত্যাগ এবং অপরটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সৈনিক নিজ নিজ দূরদৃষ্টি অনুযায়ী করেছেন এবং এ কাজ শরীআত প্রণেতার জীবদ্দশায়ই করা হয়েছিল। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার যদি তাদের না থাকত তবে রসূলুল্লাহ (স) পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তোমরা দীনের ক্ষেত্রে এমন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছ শরীআতের দৃষ্টিতে যার অধিকার তোমাদের ছিল না।[১] অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বলে–এই মূলনীতির ব্যবহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অসুবিধা দূরীভূত করার সীমা পর্যন্ত বৈধ, কিন্তু দীনের জন্য অথবা দীন প্রতিষ্ঠার কাজে তার ব্যবহার ঠিক নয়–সেও সম্পূর্ণ একটি ভুল কথা বলে। এটা সম্পূর্ণত একটি ভিত্তিহীন দাবী–যার সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাতে কোন প্রমাণ বর্তমান নেই এবং এর বিপরীত অনেক প্রমাণ বর্তমান আছে। খেলাফত ও ইমামতের চেয়ে অগ্রগণ্য ইকামতে দীনের আর কোন কাজ হতে পারে? আপনিও দেখেছেন যে, তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্য মহানবী (স) স্বয়ং দুই বিপদের মধ্যে সহজতর বিপদের ঝুঁকি নেয়ার মূলনীতি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর পথে জিহাদের তুলনায় ইকামতে দীনের অধিক বড় আর কি কাজ হতে পারে? এর

---

১. যেসব মুসলমান উত্তর মেরুতে বসবাস করেন তারা আজও এই মাসআলার সম্মুখীন হবেন। সেখানে তাদেরকে অপরিহার্যরূপে দুইটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ– অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিয়াত এবং শরীআত সম্মতভাবে নামাযের নির্দিষ্ট ওয়াক্তসমূহের মধ্যে অপরিহার্যরূপে একটি পরিত্যাগ এবং অপরটি গ্রহণ করতে হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, এই গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত হয় তাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে অথবা কোন মুফতীর নিকট থেকে গ্রহণ করতে হবে। উভয় অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি এই হবে যে, সংশ্লিষ্ট নির্দেশদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি ত্যাগ করা অধিক ক্ষতিকর। –(গ্রন্থকার)

সামরিক প্রয়োজনে যেখানে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া অপরিহার্য সেখানে রসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন–যেমন মুসলিম ও তিরমিযীর মত নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত। এ বিষয়টি যে ব্যক্তি অস্বীকার করতে চায় আমি তার নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজ আপনি যদি "খেলাফত আলা মিনহাজিন–নুবূওয়াত"–এর ভিত্তির উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন তবে বলুন–আপনার সরকার শত্রু রাষ্ট্রে গোয়েন্দা পাঠাবে কি না? যদি পাঠায় তবে তাদেরকে শরীআতের অনেক বিধানের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদান করবেন কি না? তাদেরকে কি শত্রুরাষ্ট্রে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দাড়ি রাখতে, কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া থেকে দূরে থাকতে, পানাহারের ক্ষেত্রে শরীআতের শর্তাবলী ঠিক রাখতে এবং নিজেদের দায়িত্ব সহজ–সরল পন্থায় ও বৈধ উপায়ে সম্পাদন করতে বাধ্য করা হবে? মনে করুন কোন জাতির সাথে আপনাদের যুদ্ধ বেধে গেল এবং আপনি শত্রুদের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের কর্মঠ লোকদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের সামরিক গোপনীয় তথ্য জ্ঞাত হতে পারেন এবং তাদের মধ্যে আপনাদের পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছেন। আপনি কি এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, না তা থেকে দূরে থাকবেন? মনে করুন আপনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। শত্রুরা আপনার নিকট থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক গোপন তথ্য জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করছে। আপনি দেখছেন–নীরব থাকাও সম্ভব নয় এবং ভেলকিবাজিতেও কাজ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আপনি কি আপনার সামরিক বাহিনী ও সরকারের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবেন–না উদ্দেশ্যমূলকভাবে শত্রুদের মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ইসলামী খেলাফতকে ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করবেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন তা সুস্পষ্ট হওয়া উচিৎ যাতে আপনার সঠিক অবস্থান জানা যায়। এবং সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার বলে দিবেন যে, খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবূওয়াত–এর কাজ এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধও আপনার মতে "ইকামতে দীন"– এর মধ্যে গণ্য হয় কি না?

প্রবন্ধকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার জবাব

(গ) এই অংশে আপনি যেসব অভিযোগ ও অপবাদ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তি তিনটি সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনার উপর রাখা হয়েছে। জানি না এগুলো কি ধরনের অপরিহার্য অবস্থায় হালাল করা হয়েছে।

(এক) "আমি এখন দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সার্বিক চেষ্টা-তদবীর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পন্থা পরিহার করে শুধুমাত্র নমনীয়তা, অপকৌশল ও সুবিধাবাদী নীতির ভিত্তিতে চালাতে চাচ্ছি"। অথচ আমার সামনে মূলতঃ আসল রাজপথ এই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পথই এবং তার উপর চলতে এবং নিজের জামায়াত পরিচালনা করতে আমি সব সময় চেষ্টা করে আসছি। অবশ্য আমি কখনও আমার দলকে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বৈধ ও অনুমোদনযোগ্য কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি পরিত্যাগের ও কোনটি গ্রহণের পরামর্শও দিয়ে থাকি এবং কখনও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে দুটি অনুপেক্ষনীয় ক্ষতির মধ্য থেকে অধিকতর ক্ষতিকর বিষয়টি দূর করার জন্য একটি কম ক্ষতিকর বিষয়কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত গ্রহণ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছি। এই জিনিসকে (আল্লাহ মালুম কি ধরনের সৎ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে) অপবাদ আরোপের মোক্ষম সুযোগ বানানো হয়েছে এবং অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, এই ব্যক্তি তো এখন সুযোগ সন্ধানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

(দুই) "আমার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এজন্য আমি এরূপ করেছি"। অথচ আজ পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি তা শুধুমাত্র দীনকে বিজয়ী জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্যই করেছি। এখানে আমার কোন রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রভাবশীল ছিল না।

(তিন) আমি দীনের যে মূলনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করি – শরীআতের সীমার দিকে লক্ষ্য না রেখেই দীনী কর্মকৌশল ও সার্বিক কল্যাণের দোহাই দিয়ে তা করে ফেলতে চাই। অথচ আমি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর অভিসম্পাতযোগ্য মনে করি- যে এরূপ করে অথবা এরূপ করার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আমি যে দৃষ্টিভংগী পোষণ করি তা এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। আমি দীনের কোন মূলনীতির "পরিবর্তনের" পক্ষপাতীও নই, আমি শরীআতের সীমা লংঘন করে এক চুল পরিমাণ বাইরে যাওয়াও জায়েয মনে করি না এবং দীনী কর্মকৌশল ও সার্বিক কল্যাণের নামে কোন কাজ করা সঠিক মনে করি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি শরীআতের দলীল-প্রমাণের সাহায্যে তাকে বাস্তবিকই দীনী কর্মকৌশল ও সার্বিক কল্যাণ সাব্যস্ত করতে না পারি এবং তা বৈধ হওয়ার অনুকূলে শরীআত থেকে প্রমাণ পেশ করতে না পারি।

(ঘ) এ অংশে আপনি যে অভিযোগ নকল করেছেন তাও চূড়ান্তভাবেই একটি মিথ্যা অভিযোগ-যার সমর্থনে আমার কোন লেখা বা বক্তব্য থেকে উধৃতি পেশ করা সম্ভব নয়। মূলত আমি যা কিছু বলেছি তা এই যে, যে

ব্যক্তিই বাস্তবিকপক্ষে ইকামতে দীনের কাজ করতে চাইবে–তা এক ব্যক্তি, অথবা একটি দল অথবা একটি সরকারই হোক না কেন–তাকে অবশ্যই পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রেখে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। এ পথে কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শুধুমাত্র বৈধ পন্থার মধ্যেই রদবদল করতে হবে না, বরং কোন কোন সময় শরীআত অনুমোদিত এমন সব অনুমতিরও সুযোগ গ্রহণ করতে হবে যার সুযোগ নবী–রসূলগণ ও সাহাবায়ে কিরামগণও গ্রহণ করেছেন। এই জিনিসটিরই অর্থ করা হয়েছে (অভিযোগকারীগণ কর্তৃক) যে, আমি নিজের জন্য স্বয়ং দীনের বিধানাবলীর মধ্যে কোনটি বর্জন ও কোনটি গ্রহণ করতে, কোনটি বৈধ ও কোনটি অবৈধ প্রমাণ করতে এবং কোনটি অগ্রবর্তী ও কোনটি পশ্চাৎবর্তী করার কর্তৃত্বের দাবীদার।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক মানসিক অবস্থা যে, আপনি বাকচাতুর্যের মাধ্যমে এক ব্যক্তির কথার নিকৃষ্ট অর্থ বের করার চেষ্টা করছেন, আর সে যত পরিষ্কারভাবেই তার সঠিক দাবীর বর্ণনা দিক না কেন, কিন্তু আপনি বরাবর বলে যাচ্ছেন যে–আপনি যা বর্ণনা করছেন তা আপনার আসল দাবী নয় বরং আমি যা আপনার কথার সাথে সংযুক্ত করছি–এটাই আপনার আসল উদ্দেশ্য। মনে হয় আপনি যেন কোন বাদীর উকিল নিযুক্ত হয়েছেন যিনি অপরাধীকে যে কোন উপায় ফাসানোর জন্য নিজের মক্কেলের নিকট থেকে ফিস আদায় করেছে। অবিচার এটাই যে, এখানে মক্কেল আর কেউ নয়–আপনার নিজের নফসই হচ্ছে মক্কেল, এর ফিস প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আপনার সমস্ত আকর্ষণের লক্ষ্য এই পর্যন্তই যে, আপনি যার প্রতি অসন্তুষ্ট তাকে যেভাবেই হোক জাহান্নামের উপযোগী প্রমাণ করতেই হবে। অন্তরে খোদার ভয়শূন্য বিচারক যখন কারো প্রতি রুষ্ট হয় তখন তাকে আইন–শৃংখলা ও সমাজের দুশমন প্রমাণ করে দোষী সাব্যস্ত করে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা যাকে রসাতলে নিতে চায় তাকে দেশ ও জাতির দুশমন ঘোষণা করে পথকিলতার গহ্বরে নিক্ষেপের চেষ্টা করে। কিন্তু বিশেষ প্রকৃতির একদল আলেম যখন কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হয় তখন তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা হয়–নিজেদের সাথে আল্লাহ ও রসূলকেও মামলার এক পক্ষ সাব্যস্ত করা এবং প্রমাণ করতে চায় যে, তারা যে ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট সেই কমবখত তো দীনের দুশমন মারাত্মক গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার ফেতনা সৃষ্টি করছে এবং একটি মিথ্যা দাবী সহকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এজন্য আমরা দীনের খাতিরে এই সমস্ত পাপড় বপন করছি। হায় তাদের এই অসন্তোষ ও আক্রোশ যদি

তাদের চিন্তা করার সুযোগ দিত যে, এসব কথা বলে তারা নিজেদের এবং দীনের পতাকাবাহীদের মানমর্যাদার কি বৃদ্ধি করছেন।

(ঙ) আপনার প্রশ্নের এই অংশে আপনি যে অভিযোগ নকল করেছেন- তাও অন্যের কথার উদ্দেশ্যমূলক অর্থ নির্গত করার অপচেষ্টা মাত্র। আমি যে মূলনীতির প্রবক্তা তা মূলত এই নয় যে, "তুমি দীনের সার্বিক কল্যাণকে সামনে রেখে যে কথা ইচ্ছা গ্রহণ কর এবং যা ইচ্ছা বর্জন কর।" এজন্য যারা এই শিথিল মূলনীতি রচনা করেছেন তারাই এর নিকৃষ্ট পরিণতির ব্যাখ্যা দিতে থাকবেন। আমার উপর এর কোন দায়িত্ব নেই।

(চ) এই অংশের জওয়াব এই যে, কেবলমাত্র মহানবী (স)-এর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে আইন প্রণেতার কথা, কাজ, সমর্থন-অনুমোদন মোটকথা আইন প্রণেতার সার্বিক কার্যক্রম আইনের উৎস। তাঁর নজীরসমূহের উপর কিয়াস (অনুমান) করে নতুনভাবে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করা এবং তা থেকে মূলনীতি বের করাই ইসলামী ফিকহ-এর কেন্দ্রবিন্দু। এ কিয়াস ও সমাধান বের করার ক্ষমতা বিভিন্ন লোক তার কার্যক্রমের আওতা অনুযায়ী লাভ করে থাকে। মুফতী ও কাযী (বিচারক), রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রীপরিষদ, শূরা (পরামর্শ পরিষদ বা সংসদ) ও এর বিভিন্ন কমিটি, সামরিক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ,স্বরাষ্ট্র বিভাগ মোটকথা ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ স্ব স্ব বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তা ব্যবহার করবে। সেনাবাহিনীর জন্য কমান্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পুলিশের একজন সিপাহী বাজার ও মহল্লায় যখন হঠাৎ কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তাকে ঐ সময়ে এবং ঐ স্থানেই সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে যে, সে শরীআতের দৃষ্টিতে এই স্থানে কি করার কর্তৃত্ব রাখে। শুধু তাই নয়, একজন সাধারণ নাগরিকও যদি উভয়সংকটে পতিত হয় তবে ঐ সময় কোন মুফতী নয়, বরং সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হবে যে, এটা সেই সংকটাপন্ন অবস্থা কিনা যখন তার জন্য হারাম জিনিস আহার করা বৈধ। যদি তার জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর আক্রমণ আসে তবে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, নিজের নিরাপত্তার জন্য এমন কোন প্রাণ হত্যা করা বৈধ হবে কি না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সন্তান প্রসবকালীন সময়ে যদি মা ও সন্তানের জীবন যুগপৎভাবে রক্ষা করা অসম্ভব মনে হয় তখন একজন ডাক্তারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, এটা এমন এক সময় কি না-যখন একটি প্রাণ নষ্ট করার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। মোটকথা যে প্রকৃতির সমস্যার উদ্ভব হবে তার সমাধানও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী লোকদের বের করতে হবে। এ

ধরনের সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থতা দুটি জিনিসের উপর কেন্দ্রীভূত। এক, ব্যক্তি মূলতই আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার দৃঢ় সংকল্প রাখে। দুই, কিতাব ও সুন্নাতে তার সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন সমর্থন বর্তমান থাকতে হবে।

এই মূলনীতি অত্যন্ত কঠোর–যদি ইখলাস ও শরীআতের মূলনীতির অনুসরণপূর্বক তার প্রয়োগ করা হয়। আবার তা অত্যন্ত শিথিল–যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতা বশত ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তার প্রয়োগ করে। বরং শরীআতের পুরা কাঠামোই এমন যে, শরীআতের সীমা থেকে মুক্তি লাভের আকাংখী ব্যক্তিদের হাতে যদি তা তুলে দেয়া হয় তবে তারা দীন ও নীতি-নৈতিকতার বারটা বাজিয়ে ছাড়বে। সে উযুহীন অবস্থায় নামায পড়তে পারে, কারণ শরীআত কাউকে বাধ্য করেনি যে, নামাযে ইমামতি করতে হলে তাকে মোক্তাদীদের সামনে উযু করতে হবে। সে প্রতি দিন চারজন স্ত্রী গ্রহণ ও তালাক দিতে পারে, কারণ শরীআত একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের ও যখন ইচ্ছা তাদের তালাক দেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। সে কঠিন সংকটাপন্ন অবস্থার বাহানায় যখন ইচ্ছা হারাম জিনিস পানাহার করতে পারে, কারণ সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে তো শরীআত এই অনুমতি দিয়েছে। এই আশংকার মূলোৎপাটনের জন্য যদি কোন ব্যক্তি এসব দরজা বন্ধ করে দিতে চায়–শরীআত স্বয়ং বান্দাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য যার ব্যবস্থা রেখেছে–তবে তাকে গোটা শরীআতকেই বন্ধ করতে হবে। কারণ এই শরীআত কেবল সেইসব লোকের জন্য যারা তার অনুসরণ করতে চায়। শরীআতের গন্ডি অতিক্রম করার সংকল্পকারীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে কেবল বাধা আর বাধা।

–(তরজমানুল কুরআন জুলাই ১৯৫৯ খৃ.)

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

[১৩৮১ হিজরীতে/১৯৬২ খৃ. হজ্জের মৌসুমে মোতামারে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে মক্কা মুআজ্জমায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়]

হকের ছদ্মবেশে বাতিল

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটি বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব। সে সুস্পষ্ট ফিতনা-ফাসাদ ও প্রকাশ্য বিপর্যয়-বিশৃংখলার দিকে খুব কমই ঝুঁকে পড়ে। এজন্য শয়তান তার ফেতনা-ফাসাদকে কোন না কোনভাবে সংস্কার-সংশোধন ও কল্যাণের ছদ্মাবরণে মানুষের সামনে তুলে ধরে। শয়তান যদি বেহেশতে আদম আলাইহিস সালামকে একথা বলত, "আমি তোমাদের দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করাতে চাই এবং এর ফলে তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে" তাহলে সে কখনও তাদেরকে ধোঁকা দিতে পারত না। বরং সে তাদের এই বলে ধোঁকা দিলঃ

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ-

"তোমাকে সেই গাছটি দেখিয়ে দেব কি যার মাধ্যমে চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?"-(সূরা তহাঃ ১২০)।

মানুষের প্রকৃতি আজ পর্যন্ত এ পথেরই অনুগামী হয়েছে। আজও শয়তান তাকে যত প্রকার বিভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিক্ষেপ করেছে তার সবই কোন না কোন বিভ্রান্তিকর শ্লোগান এবং মিথ্যার ছত্রছায়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।

প্রথম ধোকা : পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্র

উল্লেখিত প্রতারণাসমূহের মধ্যে একটি মারাত্মক প্রতারণা হচ্ছে বর্তমানে সামাজিক সুবিচারের (Social Justice) নামে মানবজাতিকে যে প্রতারণা করা হচ্ছে। প্রথমে শয়তান একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা

(Individual liberty) এবং উদার নীতির (Liberalism) নামে ধোঁকা দিতে থাকে এবং এরই ভিত্তিতে সে অষ্টাদশ শতকে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্র কায়েম করায়। এক সময় এই ব্যবস্থার এতই প্রভাব ছিল যে, দুনিয়াতে মানবজাতির উন্নতির জন্য এটাকে চূড়ান্ত হাতিয়ার মনে করা হত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে প্রগতিবাদী এবং প্রগতিশীল বলে পরিচয় করাতে পছন্দ করত সে স্বাধীনতা ও উদারপন্থী হওয়ার শ্লোগান দিতে বাধ্য ছিল। লোকেরা মনে করত, মানব-জীবনের জন্য যদি কোন ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে কেবল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এই ধর্মহীন গণতন্ত্রই আছে যা পাশ্চাত্যে কায়েম হয়েছে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই সময় এসে গেল যখন গোটা বিশ্ব অনুভব করতে লাগল যে, এই শয়তানী ব্যবস্থা পৃথিবীকে জুলুম ও স্বৈরাচারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এরপর অভিশপ্ত ইবলীসের পক্ষে এই শ্লোগানের দ্বারা মানুষকে আর অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ধোঁকা দেয়া সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় ধোঁকাঃ সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্র

অতপর খুব বেশী সময় অতিবাহিত হতে পারেনি, এর মধ্যেই শয়তান সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে আরেকটি প্রতারণার জন্ম দেয়। এখন সে এই মিথ্যার ছদ্মাবরণে অন্য একটি ব্যবস্থা কায়েম করাচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এত মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন ও স্বৈরাচারে প্লাবিত করে দিয়েছে যার দৃষ্টান্ত মানব জাতির ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই প্রতারণাপূর্ণ মতবাদটি এতই শক্তিশালী যে, আরো কিছু সংখ্যক দেশ এটাকে উন্নতির সর্বশেষ উপায় মনে করে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই প্রতারণার মুখোশ পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি।

শিক্ষিত মুসলমানদের মানসিক গোলামীর একশেষ

মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাত বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন-বিধান মওজুদ রয়েছে। তা তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং জীবনের সার্বিক ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই ভিক্ষুকেরা নিজেদের দীন সম্পর্কে চরম অজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণে নিকৃষ্টরূপে পরাজিত। এজন্য দুনিয়ার

জাতিগুলোর শিবির থেকে যে শ্লোগানই উত্থিত হয় তা এখান থেকেও ত্বরিত প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে। যে যুগে ফরাসী বিপ্লব থেকে উত্থিত চিন্তা-দর্শনের জোর ছিল, মুসলিম দেশসমূহের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে সেখানে এই চিন্তা-দর্শনের প্রকাশ এবং এরই আলোকে নিজেকে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক মনে করত। তারা মনে করত এটা ছাড়া তারা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না এবং তাদেরকে পশ্চাদপন্থী মনে করা হবে। এই যুগটা যখন শেষ হল, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কেবলাও পরিবর্তন হতে শুরু করল। নতুন যুগের সূচনা হতেই আমাদের মাঝে সামাজিক সুবিচার এবং সমাজতন্ত্রের শ্লোগান উচ্চারণকারীদের আবির্ভাব হতে থাকল। এ পর্যন্ত পৌছেও ধৈর্য ধরার মত ছিল। কিন্তু আক্রোশের ব্যাপার এই যে, আমাদের মাঝে এমন একটি দল মাথাচারা দিয়ে উঠতে লাগল যারা নিজেদের কেবলা পরিবর্তন করার সাথে সাথে চাইত যে, ইসলামও তার কেবলা পরিবর্তন করুক। মনে হয় বেচারারা যেন ইসলাম ছাড়া বাঁচতে পারছে না। তাদের সাথে ইসলামেরও থাকা দরকার আছে। কিন্তু তাদের খাহেশ হচ্ছে, তারা যার অনুসরণ করে উন্নতি করতে চায়, ইসলামও যদি তার অনুসরণ করে তাহলে সেও সম্মানিত হবে এবং 'সেঁকেলে ধর্ম' হওয়ার অপবাদ থেকেও বেঁচে যাবে। এই কারণে প্রথমে ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীকে অবিকল ইসলামী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হত। আর আজ এরই ভিত্তিতে প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সামাজিক সুবিচার বর্তমান রয়েছে। এটা সেই স্তর যেখানে পৌছে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক গোলামী এবং তাদের চরম অজ্ঞতার প্লাবন অপমানের চরম পর্যায়ে পৌছে যায়।

সামাজিক সুবিচারের তাৎপর্য

আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বলতে চাই যে, আসলে কিসের নাম সামাজিক সুবিচার এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থাই বা কি? যদিও এটা খুব কমই আশা করা যায় যে, যেসব লোক সমাজতন্ত্রকে 'সামাজিক সুবিচার' প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা মনে করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য লেগে আছে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেবে এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা মূর্খ যতক্ষণ মূর্খই থাকে তার সংশোধনের অনেক কিছু সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে শাসন-দন্ড হাতে পায় তখন "মা আলিমতু লাকুম মিন ইলাহিন গাইরী-আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন খোদাকে জানি না" (কাসাসঃ ৩৮)-এই অহমিকা তাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কথা

হৃদয়ংগম করার যোগ্যও রাখে না। কিন্তু আল্লাহর রহমাতে সাধারণ মানুষের অবস্থা এই যে, যুক্তিযুক্ত পন্থায় তাদেরকে কথা বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক হতে পারে। এই সাধারণ লোকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তির প্রসার ঘটায়। এজন্য সাধারণ লোকদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরাই মূলত আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

ইসলামেই রয়েছে সামাজিক সুবিচার

এ প্রসংগে আমি আমার মুসলমান ভাইদের সর্বপ্রথম যে কথা বলতে চাই তা এই যে, যেসব লোক "ইসলামেও সামাজিক সুবিচার মওজুদ রয়েছে"– এই শ্লোগানে মুখর, তারা সম্পূর্ণত একটি ভুল কথা বলে। বরং সঠিক কথা এই যে, "কেবলমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে।" ইসলাম সেই দীনে হক যা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল করেছেন। মানবজাতির মধ্যে ন্যায়–ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের জন্য কোন্‌টি ন্যায়–ইনসাফ এবং কোন্‌টি ন্যায়–ইনসাফ নয় তা নির্ণয় করা মানবজাতির সৃষ্টিকর্তারই কাজ। অন্য কেউ ন্যায়–ইনসাফ ও জুলুমের মানদন্ড নির্ধারণের অধিকার রাখে না এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ইনসাফ কায়েম করার যোগ্যতাও নেই। মানুষ নিজেই নিজের মালিক এবং কর্তা নয় যে, সে নিজের জন্য নিজেই আদলের মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষমতা পাবে। বিশ্বে তার মর্যাদা হচ্ছে খোদার প্রজা বা অধীনস্ত হিসাবে। এজন্য আদল বা ন্যায়–ইনসাফের মানদন্ড নিরূপণ করা তার কাজ নয়; তার মালিক এবং শাসকের কাজ। তাছাড়া মানুষ যত উন্নত মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন, এক ব্যক্তির পরিবর্তে উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন অসংখ্য লোক একত্রিত হয়ে নিজেদের জ্ঞান–বুদ্ধি খরচ করুক না কেন–মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, এর ত্রুটি, অনিপুনতা ও অপূর্ণাংগতা এবং মানবীয় জ্ঞানের উপর প্রবৃত্তি ও গোড়ামির প্রভাব–এসব কিছু থেকে মুক্ত হওয়া কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। এজন্যই ন্যায়–ইনসাফের উপর ভিত্তিশীল কোন জীবন বিধান নিজেদের জন্য রচনা করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। মানুষের রচিত ব্যবস্থা আপাত প্রকাশ্যত যতই ন্যায়ানুগ বলে দৃষ্টিগোচর হোক, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত প্রমাণ করে দেয় যে, মূলত এর মধ্যে কোন ন্যায়–ইনসাফ নেই। এজন্য মানব মস্তিষ্ক প্রসূত প্রতিটি ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর তা অকেজো প্রমাণ হয় এবং মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় একটি নির্বুদ্ধিতা প্রসূত পরীক্ষা নীরিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত আদল কেবল সেই ব্যবস্থার মধ্যেই

নিহিত রয়েছে যা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত জ্ঞানের অধিকারী, মহা প্রশংসিত ও মহাপবিত্র এক মহান সত্তা তৈরী করেছেন।

আদলের প্রতিষ্ঠাই ইসলামের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় কথা যা প্রথমেই বুঝে নেয়া দরকার তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি "ইসলামে আদল আছে" বলে সে বাস্তব ঘটনা থেকে কম বলে। বাস্তব কথা এই যে, আদলই হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য। আর আদল প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

> "আমরা আমাদের রসূলদের উজ্জ্বল নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান (তুলাদন্ড) নাযিল করেছি- যেন লোকেরা ইনসাফের উপর কায়েম হয়ে যায়। এবং আমরা লৌহ নাযিল করেছি। এর মধ্যে রয়েছে অসম শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ। আল্লাহ জানতে চান কে না দেখেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চিতই আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী এবং পরাক্রমশালী"-(সূরা হাদীদঃ ২৫)।

এই দুটি কথা সম্পর্কে যদি কোন মুসলমান অমনোযোগী না হয় তাহলে সে সামাজিক সুবিচারের খোজে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ছেড়ে অন্য কোন উৎসের দিকে ধাবিত হওয়ার ভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারে না। যে মুহূর্তে তার আদলের প্রয়োজনীতা অনুভূত হবে তৎক্ষণাৎই সে জানতে পারবে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স) ছাড়া আর কারো কাছে আদল নেই এবং থাকতেও পারে না। সে এও জানতে পারবে যে, আদল কায়েম করার জন্য এছাড়া আর কিছুই করার নেই যে, ইসলাম, পুরাপুরি ইসলাম, এবং যোগ-বিয়োগ ছাড়াই ইসলাম কায়েম করতে হবে। আদল ইসলাম থেকে স্বতন্ত্র কোন জিনিসের নাম নয়, স্বয়ং ইসলামই হচ্ছে আদল। ইসলাম কায়েম হওয়া এবং আদল কায়েম হওয়া একই জিনিস।

সামাজিক সুবিচার

এখন আমাদের দেখতে হবে মূলত কোন জিনিসের নাম সামাজিক সুবিচার এবং তা কায়েম করার সঠিক পন্থাই বা কি?

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

প্রতিটি মানব সমাজ হাজার-হাজার, লাখ-লাখ এবং কোটি-কোটি মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই মিশ্র সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সজীব, বুদ্ধিমান

এবং সচেতন হয়ে থাকে। প্রতিটি সদস্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন সত্তার অধিকারী। এর বিকাশ এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়ার জন্য সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি সদস্যেরই একটি ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা রয়েছে। তার নিজের কিছু আকর্ষণ ও কামনা-বাসনা রয়েছে। তার দেহ ও সত্তার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের এই সদস্যদের অবস্থা কোন প্রাণহীন যন্ত্রের খুচরা অংশের অনুরূপ নয় যে, মূল জিনিস হচ্ছে মেশিন আর খুচরা অংশগুলো তারই প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছে এবং এই অংশগুলোর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নেই। বরং মানব সমাজ পক্ষান্তরে জীবন্ত এবং জাগ্রত মানুষের একটি সমষ্টি। এই ব্যক্তিগণ এই সমষ্টি বা সংগঠনের জন্য নয়, বরং সংগঠনই এই ব্যক্তিদের জন্য। ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে এই সমষ্টি বা সংগঠন এজন্যই কায়েম করে যে, পরস্পরের সহায়তায় তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জন এবং দেহ ও আত্মার দাবী পূর্ণ করার সুযোগ পাবে।

ব্যক্তিগত জবাবদিহি

তাছাড়া সমস্ত মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে এই দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে (যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত) অতিবাহিত করার পর আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির জন্য হাযির হতে হবে। তাকে এই পৃথিবীতে যে শক্তি, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ দান করা হয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের জন্য কি ধরনের ব্যক্তিত্ব গঠন করে নিয়ে এসেছে-এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর দরবারে মানবজাতির এই জবাবদিহি সম্মিলিতভাবে নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে হবে। সেখানে বংশ, গোত্র, জাতি একত্রে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করবে না, বরং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে নিজের আদালতে হাযির করবেন এবং প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি করে এসেছ এবং কি হয়ে এসেছ?

ব্যক্তি স্বাধীনতা

এই দুটি ব্যাপারে-অর্থাৎ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আখেরাতে মানুষের জবাদিহির দাবী হচ্ছে পৃথিবীতে সে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে। কোন সমাজে যদি ব্যক্তিকে তার পছন্দমত নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে তার মধ্যে মানবতা শবদেহের মত নির্জীব হয়ে

যায়, তার দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, তার শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা চাপা পড়ে যায়। সে নিজেকে অবরুদ্ধ ও বন্দিদশায় দেখতে পেয়ে জড়তা ও অকর্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। আখেরাতে এ ধরনের অবরুদ্ধ ও পরাধীন ব্যক্তির দোষত্রুটি বেশীরভাগ দায়দায়িত্ব এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গঠনকারী ও পরিচালনাকারীদের ঘাড়ে চাপবে। তাদের কাছ থেকে কেবল তাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশই নেয়া হবে না-বরং তারা যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে অসংখ্য মানুষকে নিজেদের মর্জির বিরুদ্ধে এবং তাদের মর্জিমত ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে বাধ্য করেছে -এজন্যও তাদের জবাবদিহি করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরনের ভারি বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না। সে যদি খোদাকে ভয়কারী মানুষ হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর বান্দাদের অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদানের দিকেই ঝুঁকে পড়বে- যেন প্রতিটি ব্যক্তি যা হবার নিজের দায়িত্বেই হতে পারে। সে যদি নিজেকে ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব হিসাবে গঠন করে তাহলে এ দায়িত্ব তখন আর সমাজের পরিচালকদের উপর চাপবে না।

সামাজিক সংস্থা এবং এর কর্তৃত্ব

এতো গেল ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। অপরদিকে সমাজকে দেখুন-যা পরিবার, বংশ, গোত্র, জাতি এবং গোটা মানবতার আকারে পর্যায়ক্রমিকভাবে কায়েম আছে। একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ও তাদের সন্তানদের নিযে এই সমাজের সূচনা হয়। এদের দ্বারা একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের সমন্বয়ে বংশ, গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। তাদের সমন্বয়ে একটি জাতি অস্তিত্ব লাভ করে এবং জাতি তার সামষ্টিক ইচ্ছা-আকাংখার বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করে। বিভিন্ন আকৃতিতে এই সামাজিক সংস্থাগুলো আসলে যে উদ্দ্যেশ্যের জন্য প্রয়োজন তা হচ্ছে-এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও এর সহায়তায় ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করবে যা তার একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কিন্তু এ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে উল্লেখিত প্রতিটি সংস্থার হাতে ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার থাকতে হবে, যাতে এই সংস্থাগুলো এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিরোধ করতে পারে যা অন্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পর্যায়ে পৌছে যায় এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে এমন খেদমত ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে যা সামগ্রিকভাবে গোটা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

এই সেই স্থান যেখানে পৌঁছে সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরস্পর বিরোধী দাবীসমূহ একটি গ্রন্থির আকার ধারণ করে। একদিকে মানব কল্যাণের দাবী হচ্ছে এই যে, সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে হবে যেন সে নিজের যোগ্যতা ও পছন্দ মাফিক নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। অনুরূপভাবে পরিবার, বংশ, গোত্র, ভ্রাতৃবন্ধন এবং অন্যান্য সংস্থা নিজেদের চেয়ে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যা তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যে তাদের অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অপর দিকে মানব কল্যাণেরই দাবী হচ্ছে–ব্যক্তির উপর পরিবারের, পরিবারের উপর বংশের ও ভ্রাতৃবন্ধনের এবং সমস্ত লোকের ও ছোট সংস্থার উপর বড় সংস্থার এবং বৃহৎ পরিসরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকতে হবে–যেন কেউ নিজের সীমা অতিক্রম করে অন্যদের উপর জুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করতে না পারে। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা মানব জাতির ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন দেখা দেয়। একদিকে প্রতিটি জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় থাকার প্রয়োজন রয়েছে, অপরদিকে কোন উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার বর্তমান থাকারও প্রয়োজন রয়েছে–যাতে কোন জাতি বা রাষ্ট্র সীমা লংঘন করতে না পারে।

এখন সামাজিক সুবিচার যে জিনিসের নাম তা হচ্ছে–ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, ভ্রাতৃসমাজ এবং জাতির মধ্যে প্রত্যেকের যুক্তিসংগত পরিমাণ স্বাধীনতাও থাকতে হবে এবং সাথে সাথে জুলুম, শত্রুতা ও সীমা লংঘনকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাসমূহের হাতে ব্যক্তিদের উপর এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও থাকতে হবে। এর ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাও আদায় করা যাবে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ত্রুটি

এই সত্যকে যে ব্যক্তি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নেবে সে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারবে যে, ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেভাবে সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী ছিল–ঠিক তদ্রুপ বরং তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সামাজিক সুবিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী–যা কার্লমার্কস এবং এঙ্গেলসের দর্শনের অনুসরণে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সে ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত সীমার অধিক স্বাধীনতা দান করে পরিবার, বংশ, প্রতিবেশিক সংস্থা, সমাজ এবং জাতির উপর বাড়াবাড়ি করার

অবাধ সুযোগ দিয়ে দিয়েছে এবং তার কাছ থেকে সামাজিক কল্যাণের জন্য সেবা গ্রহণ করার জন্য সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তিকে খুবই ঢিলা করে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির ত্রুটি হচ্ছে এই যে, তা রাষ্ট্রকে সীমাতিরিক্ত শক্তিশালী করে ব্যক্তি, পরিবার, বংশ ও ভ্রাতৃবন্ধনের স্বাধীনতার প্রায় সবটুকুই হরণ করে নেয় এবং ব্যক্তির কাছ থেকে সমষ্টির জন্য সেবা আদায় করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এত অধিক ক্ষমতা দেয় যে, ব্যক্তি প্রাণবন্ত মানুষ হওয়ার পরিবর্তে একটি মেশিনের প্রাণহীন অংশে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি বলে–এই মতবাদের মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার কায়েম হতে পারে–সে ডাহা মিথ্যা কথা বলে।

সামাজিক নির্যাতনের নিকৃষ্টতম রূপ—সমাজতন্ত্র

এটা মূলতঃ সামাজিক জুলুম ও নির্যাতনের সেই নিকৃষ্টতম রূপ যা কখনো কোন নমরুদ, কোন ফেরাউন এবং কোন চেংগিয খানের যুগেও ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই জিনিসটিকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি "সামাজিক সুবিচার" নামে ব্যাখ্যা করতে পারে যে, এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি বসে নিজেদের একটি সামাজিক দর্শন রচনা করে নেবে, অতপর রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এই দর্শনকে জোরপূর্বক পুরা দেশের কোটি কোটি বাসিন্দার উপর চাপিয়ে দেবে? জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, জমাজমী দখল করে নেবে, শিল্প-কারখানা জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেবে এবং গোটা দেশটাকে এমন একটি জেলখানায় পরিণত করবে যার মধ্যে সমালোচনা, ফরিয়াদ, অভিযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। দেশের মধ্যে কোন দল থাকবে না, কোন সংগঠন থাকবে না, কোন প্লাটফরম থাকবে না–যেখানে লোকেরা মুখ খুলতে পারবে, কোন প্রেস থাকবে না যেখানে লোকেরা মত প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং কোন বিচারালয় থাকবে না ইনসাফ পাবার আশায় যার দরজার কড়া নাড়া যাবে। গোয়েন্দাগিরির জাল ব্যাপকভাবে বিস্তার করে দেয়া হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভয় করবে যে, হয়ত এও গোয়েন্দা বিভাগের লোক। এমনকি নিজের ঘরের মধ্যেও মুখ খোলার সময় কোন ব্যক্তি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেবে যে, কোন কান তার কথা শুনার জন্য এবং কোন জবান তার কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিকটে কোথাও লুকিয়ে নেই তো? তাছাড়া গণতন্ত্রের ধোঁকা দেয়ার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো হবে, কিন্তু সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে যাতে এই দর্শন রচনাকারীদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং এমন কোন ব্যক্তিও যেন তাতে প্রবেশ করতে না পারে যার স্বতন্ত্র মত রয়েছে এবং যে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়।

যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এই পন্থায় আর্থিক সমবন্টন হতে পারে–কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম হয়নি। তারপরও কি আর্থিক সমতার নামই কেবল সামাজিক সুবিচার? আমি এ প্রশ্ন তুলছি না যে, এই ব্যবস্থায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য আছে কি না? আমি এ প্রশ্নও তুলছি না যে, এই ব্যবস্থার ডিকটেটর এবং তার অধীন একজন কৃষকের জীবন–যাত্রার মধ্যে সমতা আছে কিনা? আমি কেবল এই প্রশ্ন করছি যে, বাস্তবিকই যদি তাদের মধ্যে পূর্ণ আর্থিক সমতা কায়েম হয়েও থাকে তাহলে এরই নাম কি সামাজিক সুবিচার হবে? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এক ডিকটেটর ও তার সাংগপাংগরা যে দর্শন রচনা করেছে তা পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার সহায়তায় জাতির ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং জাতির কোন ব্যক্তির এই দর্শনের উপর, অথবা তা কার্যকর করার কোন ক্ষুদ্রতর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে একটি বাক্যও বের করার স্বাধীনতাও থাকবে না? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এক ডিকটেটর ও তার মুষ্টিমেয় সাথী নিজেদের দর্শনের প্রচার ও প্রসারের জন্য গোটা দেশের উপায়–উপকরণ ব্যবহার এবং যে কোন ধরনের সংগঠন ও সংস্থা কায়েম করার অধিকার ভোগ করবে, কিন্তু তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী দুই ব্যক্তিও একত্র হয়ে কোন সংগঠন কায়েম করতে পারবে না, কোন জনসমাবেশে ভাষণ দিতে পারবে না এবং কোন প্রচার মাধ্যমে একটি শব্দও প্রচার করতে পারবে না? এর নাম কি সামাজিক সুবিচার যে, গোটা দেশের জমীর এবং কলকারখানার মালিকদের বেদখল করে দিয়ে একজন মাত্র জমীদার এবং একজন মাত্র শিল্পপতি থাকবে যার নাম হচ্ছে রাষ্ট্র? আর সেই রাষ্ট্র থাকবে হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তির কবজায় এবং এই লোকগুলো এমন সব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে যার ফলে গোটা জাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাদের দখল থেকে অন্যদের হাতে চলে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে যাবে? শুধু পেটের নাম যদি মানুষ না হয়ে থাকে এবং মানবজীবন শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমিত না হয়ে থাকে তাহলে কেবল আর্থিক সমতাকে কি করে সুবিচার বলা যেতে পারে? জীবনের প্রতিটি বিভাগে যুলুম–নির্যাতন কায়েম করে, মানবতার প্রতিটি গতিকে প্রতিহত করে শুধু আর্থিক সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে জনগণকে এক সমান করেও দেয়া হয় এবং স্বয়ং ডিকটেটর এবং তার সাংগপাংগরাও নিজেদের জীবনযাত্রায় জনগণের সমপর্যায়ে নেমে আসে তবুও এই বিরাট যুলুমের মাধ্যমে এই সমতা প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক সুবিচার আক্ষায়িত হতে পারে না। বরং এটা আমি পূর্বেও যেমন বলে এসেছি–

সেই নিকৃষ্টতম সামাজিক নির্যাতন যার সাথে মানবেতিহাস ইতিপূর্বে কখনো সাক্ষাত করেনি।

ইসলামে সামাজিক সুবিচার

এবার আমি আপনাদের বলব, 'ইসলাম' যার অপর নাম 'আদল' তা কি? কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানব জীবনের জন্য ন্যায়-ইনসাফের কোন দর্শন রচনা করবে, তার প্রতিষ্ঠার জন্য বসে বসে কোন পন্থা উদ্ভাবন করবে, জোরপূর্বক জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেবে আর কোন প্রতিবাদকারীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্দ করে দেবে-এরূপ করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) এবং উমার ফারূক (রা) তো দূরের কথা স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এরূপ করার কোন অধিকার ছিল না। কেবল আল্লাহ তাআলারই এই অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে যে, মানুষ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে দেবে। স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর হুকুমের অধীন ছিলেন। তাঁর (নবীর) নির্দেশের আনুগত্য করা কেবল এজন্য ফরজ ছিল যে, তিনি খোদার পক্ষ থেকেই নির্দেশ দিতেন, মাআযাল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে কোন দর্শন রচনা করে নিয়ে আসতেন না। রসূল (স) এবং রসূলের খলীফাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেবল শরীআতে ইলাহিয়াই সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল। এরপর প্রতিটি ব্যক্তিরই যে কোন ব্যাপারে মুখ খোলার পূর্ণ অধিকার ছিল।

ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা

আল্লাহ তাআলা নিজেই ইসলামে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কাজ হারাম যা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস ফরজ যা তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে-তা আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যদের উপর তার কি কি অধিকার রয়েছে এবং তার উপর অন্যদের কি কি অধিকার রয়েছে, কি উপায়-উপকরণের মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিকানা তার হস্তগত হওয়া জায়েয এবং এমন কি কি উপায়-উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিকানা হস্তগত হলে তা জায়েয হবে না, ব্যক্তির কল্যাণের জন্য সমষ্টির এবং সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির কি দায়িত্ব রয়েছে, ব্যক্তির উন্নতির জন্য বংশ, পরিবার, গোত্র এবং গোটা জাতির উপর কি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় এবং কি করা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া যায়-এসব কিছুই কিতাব ও সুন্নাতের চিরস্থায়ী সংবিধানে বর্তমান রয়েছে-যার উপর হস্তক্ষেপ করার এবং যাতে সংযোজন ও সংকোচন করার অধিকার

কারো নেই। এই সংবিধানের আলোকে কোন লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে গণ্ডি নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে তা হরণ করে নেয়ার অধিকার কারো নেই। আয়-উপার্জনের যেসব উপায় এবং তা ব্যয়ের যেসব পন্থা হারাম করা হয়েছে সে তার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। যদি সে ঐ নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ায় তাহলে ইসলামী আইন তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করে। কিন্তু যেসব উপায় ও পন্থা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্জিত মালিকানার উপর তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে এবং ব্যয়ের যেসব খাত বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে-তা থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করতে সে বাধ্য। কিন্তু এর অধিক বোঝা তার উপর চাপানো যাবে না। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু করতে চায় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। সমষ্টি এবং রাষ্ট্রের অবস্থাও তদ্রূপ। তার উপর ব্যক্তির যে অধিকার রয়েছে তা ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক যেভাবে সমষ্টি এবং রাষ্ট্র নিজ নিজ অধিকার তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার এখতিয়ার রাখে। এই চিরস্থায়ী সংবিধানকে যদি কার্যত বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে বাঞ্ছিত সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার পর আর কোন জিনিসের দাবী অবশিষ্ট থাকে না। এই সংবিধান যতক্ষণ বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুক না কেন মুসলমানদের কখনো এই ধোঁকায় ফেলতে পারবে না যে, সে কোথাও থেকে যে সমাজতন্ত্র ধার করে নিয়ে এসেছে সেটাই খাঁটি ইসলাম।

ইসলামের এই চিরস্থায়ী সংবিধানে ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে এমন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার কোন অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি এবং সমষ্টিকেও এমন কোন এখতিয়ার দেয়া হয়নি যার মাধ্যমে সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও এর পরিপোষণের জন্য তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা হরণ করতে পারে।

সম্পদ হস্তান্তরের শর্তসমূহ

ইসলাম কোন ব্যক্তির হাতে সম্পদ আসার মাত্র তিনটি পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেঃ উত্তরাধিকার, দান এবং উপার্জন। কোন সম্পদের বৈধ মালিকের কাছ থেকে ইসলামী শরীআত মোতাবেক কোন ওয়ারিস যে সম্পদ লাভ করে থাকে-কেবল এই ধরনের উত্তরাধিকারই গ্রহণযোগ্য। কোন সম্পদের বৈধ মালিক শরীআতের সীমার মধ্যে যে দান বা উপঢৌকন দিয়ে থাকে কেবল তাই বিবেচনাযোগ্য। এই দান যদি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে এটা কেবল এমন অবস্থায়ই জায়েয হবে যখন তা কোন বিশেষ খেদমতের

জন্য অথবা সমষ্টির স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ন্যায়ানুগ পন্থায় দেয়া হয়েছে। অনন্তর এই ধরনের দান করার অধিকার কেবল এমন রাষ্ট্রেরই রয়েছে যা শরীআত ভিত্তিক সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় পন্থায় পরিচালিত হয় এবং যার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে। এখন থাকল উপার্জনের ব্যাপার, যে উপার্জন হারাম পন্থায় হয়নি ইসলাম কেবল তারই স্বীকৃতি দেয়। চুরি, আত্মসাৎ, ওজনে কম-বেশী, আমানত আত্মসাৎ, ঘুষ, বেশ্যাবৃত্তি, মজুতদারী (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য মজুত করে রাখা), সূদ, জুয়া, প্রতারণাপূর্ণ কারবার, নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তারকারী ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। এসব সীমারেখা বজায় রেখে কারো হাতে যে সম্পদ এসে যায় সে তার বৈধ মালিক-চাই তা বেশী হোক অথবা কম। এ ধরনের মালিকানার জন্য কোন নিম্নতম সীমাও নির্ধারণ করা যেতে পারে না, আর না উচ্চতম সীমা। পরিমাণ এই সীমার কম হওয়াতে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে এনে তা বৃদ্ধি করে দেয়াও জায়েয নয়, আর নির্দিষ্ট সীমার অধিক পরিমাণ হয়ে গেলে তা জোরপূর্বক ছিনিয়েও নেয়া যাবে না। অবশ্য এই বৈধ সীমা অতিক্রম করে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার সম্পর্কে মুসলমানদের এই প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে-"মিন আইনা লাকা হাযা"-এ সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? এই ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রথমে আইনানুগ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অতপর যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, তা বৈধ পন্থায় উপার্জিত হয়নি তাহলে এটা বাজেয়াপ্ত করার পূর্ণ অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।

সম্পদ ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে অবাধ সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং এখানেও কিছু আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে-যাতে কোন ব্যক্তি এমন পথে তা ব্যয় করতে না পারে যা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অথবা তার মধ্যে স্বয়ং সম্পদের মালিকের দীনী এবং নৈতিক ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামে কোন ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ পাপ কাজে ব্যয় করতে পারে না। মদপান এবং জুয়া খেলার দরজা তার জন্য বন্ধ। যেনা-ব্যভিচারের দরজাও তার জন্য রুদ্ধ। ইসলাম স্বাধীন মানুষকে ধরে নিয়ে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার কাউকে দেয় না এবং তাদের ক্রয় করে সম্পদশালী লোকদের ঘর বোঝাই করার অধিকারও দেয় না। অপচয় এবং সীমাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যক্তির ভোগ-বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ

আরোপ করেছে। নিজে ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকবে আর প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটাবে ইসলাম তা মোটেই জায়েয রাখেনি। ইসলাম ব্যক্তিকে কেবল শরীআত সম্মত এবং ন্যায়ানুগ পন্থায়ই সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অধিকার দান করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মাধ্যমে যদি কেউ আরো অধিক সম্পদ আয় করার জন্য তা ব্যবহার করতে চায় তাহলে সে সম্পদ অর্জনের বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য। উপার্জনের শরীআত সম্মত পন্থার বাইরে সে যেতে পারে না।

সামাজিক সেবা

যে ব্যক্তির কাছে নেসাবের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে-সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে ইসলাম তার উপর যাকাত ধার্য করে। অনন্তর সে ব্যবসায়িক পণ্য, জমীর ফসল, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু এবং আরো অন্যান্য সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত ধার্য করে। আপনি দুনিয়ার কোন একটি দেশ বেছে নিন এবং হিসাব করে দেখুন-সেখানে যদি শরীআতের নীতি অনুযায়ী নিয়মিত যাকাত আদায় করা হয় এবং কুরআন নির্ধারিত খাতসমূহে তা বন্টন করা হয় তাহলে কয়েক বছর পরই সেখানে আর এমন কোন ব্যক্তিকে খুজে পাওয়া যাবে না যে জীবন ধারনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এরপরও কোন ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকে-তার মৃত্যুর সাথে সাথে ইসলাম তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেয়-যাতে সম্পদের এই স্তুপ একটি স্থায়ী স্তুপে পরিণত হয়ে থাকতে না পারে।

যুলুমের মূলোৎপাটন

তাছাড়া ইসলাম যদিও এটাই পছন্দ করে যে, জমির মালিক এবং শ্রমিক অথবা কারখানার মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যেকার ব্যাপারগুলো সন্তোষের ভিত্তিতে ন্যায়ানুগ পন্থায় সমাধান হোক এবং আইনের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন না হোক, কিন্তু যেখানেই এই ব্যাপারে যুলুম চলছে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং আইনের মাধ্যমে ইনসাফের সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

জনস্বার্থের জন্য জাতীয় মালিকানার সীমা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ইসলাম হারাম করেনি। যদি কোন শিল্প অথবা ব্যবসা এমন হয় যে, তা জনস্বার্থের জন্য জরুরী বটে কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় তা পরিচালনা করতে কেউ প্রস্তুত নয় অথবা ব্যক্তি মালিকানায় তা পরিচালিত হওয়াটা সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যবস্থাপনায়

পরিচালনা করা যেতে পারে। অনন্তর কোন শিল্প অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কতিপয় ব্যক্তির মালিকানায় এমন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে যা সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর-এক্ষেত্রে সরকার মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে এবং অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে শরীআতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু ইসলাম এটাকে একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে না যে, সম্পদ সৃষ্টির যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরকারী মালিকানায় থাকবে এবং রাষ্ট্রই হবে একক শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং একচ্ছত্র মালিক।

বাইতুলমাল ব্যয়ের শর্তাবলী

বাইতুলমাল (ট্রেজারী) সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, তা আল্লাহ এবং মুসলিম জনগণের সম্পদ এবং তা ব্যয় করার মালিকানা স্বত্ব কারো নেই। মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের মত বাইতুল মালের ব্যবস্থাপনাও জাতি অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। যার কাছ থেকেই কিছু নেয়া হবে এবং যে খাতেই সম্পদ ব্যয় করা হবে তা অবশ্যই শরীআত অনুমোদিত পন্থায় হতে হবে এবং এ সম্পর্কে হিসাব চাওয়ার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকবে।

একটি প্রশ্ন

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সামনে প্রশ্ন রাখতে চাই-কেবল 'অর্থনৈতিক সুবিচারের' নামই যদি 'সামাজিক সুবিচার' হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে তা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এরপরও কি এমন কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে যার জন্য সমগ্র জনতার স্বাধীনতা হরণ করা, তাদের ধন-সম্পদ হরণ করা এবং গোটা জাতিকে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির গোলামে পরিণত করাই অপরিহার্য হয়ে পড়বে? আমরা মুসলমানরা আমাদের দেশসমূহে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী শরীআত ভিত্তিক খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করব এবং সেখানে কাটছাট ব্যতিরেকেই আল্লাহর দেয়া শরীআতকে কোন সংযোজন-সংকোচন ছাড়াই কার্যকর করব-এ পথে আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত কি প্রতিবন্ধক থাকতে পারে? যেদিনই আমরা এটা করতে পারব, সেদিন কেবল সমাজতন্ত্র থেকে ফায়েজ গ্রহণ করার প্রয়োজনীতাই শেষ হয়ে যাবে না, বরং সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণ আমাদের জীবন ব্যবস্থা দেখে অনুভব করতে থাকবে- যে আলোর অভাবে তারা অন্ধকারে সাঁতার কাটছে তা তাদের চোখের সামনেই বর্তমান রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী
আইনের বিধান

ইয়াতীম নাতির উত্তরাধিকার প্রসংগ

"ইসলামে ইয়াতীম নাতির[১] মীরাস প্রসংগ" বেশ কিছুকাল থেকে পত্রপত্রিকায় বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। যেহেতু এ প্রসংগটির আড়ালে হাদীস অস্বীকারকারীদের জন্য হাদীস সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত মতাবদ প্রচারের একটা দুর্লভ সুযোগ রয়েছে—এজন্য তারা একটা আবেগমূলক প্রেক্ষাপট তৈরী করে এর খুব সমালোচনা করেছে। এই পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে শুধু ব্যাপক আলোচনাই যথেষ্ট নয়, বরং এর পক্ষে-বিপক্ষেও মতামত প্রকাশ করা উচিৎ। সময়ের এই বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে লেখক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলো দুটি চিঠির আকারে "দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত।" (نوائے وقت) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি শুধু আলোচিত বিষয়টিকে উপলব্ধি করতেই সহায়ক হবে না, বরং এর পেছনে যে মানসিক বিকৃতি সক্রিয় রয়েছে তাও অনুমান করা যাবে।

প্রথম চিঠি

কিছুকাল থেকে একদল লোক অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, 'দাদার মীরাস থেকে ইয়াতীম নাতির বঞ্চিত হওয়াটা কুরআন বিরোধী।' দাদার মীরাস থেকে ইয়াতীম নাতির বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাতের সকল ফিকাহবিদ ঐক্যমত পোষণ করে আসছেন। হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী, যাহিরী, আহলে হাদীস, শিয়া ইত্যাদি সব মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই এই অপপ্রচারের প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। একবার যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ইয়াতীম নাতিকে বঞ্চিত করাটা কুরআনের পরিপন্থী, আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে, উম্মাতের ফিকাহবিদদের মধ্যে এর উপর পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে-তাহলে যে কোন ব্যক্তির এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে উপায় নেই যে, (ক) হয় মুসলিম ফিকাহবিদগণ কুরআন বুঝতে সক্ষম হননি অথবা, (খ) তারা জেনে বুঝেই কুরআনের বিরোধিতা করার জন্য একমত হয়েছেন।

এই অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে[২] চৌধুরী মুহাম্মাদ ইকবাল চীমা সাবেক পাঞ্জাব আইন পরিষদে একটি আইনের খসড়া

১. ছেলের ঔরসজাত এবং মেয়ের গর্ভজাত সন্তানদের বুঝানোর জন্য আমরা "নাতি" শব্দটি পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছি। (অনুবাদক)

২. [illegible] জানুয়ারী ১৯৫৯ সনে রচিত।

পেশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন করা। লাহোর হাইকোর্টের বিচারক মন্ডলী থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসক, জেলা জজ, সিভিল জজ, সরকারী বিভাগের উচ্চ ও নিম্নস্তরের কর্মচারী, উকীল এবং পৌরসভার কমিশনারদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এই প্রস্তাবের সমর্থন করেছিল। অতঃপর পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি মিয়া আবদুর রশীদের সভাপতিত্বে পারিবারিক কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করে। তারাও এই সংশোধনীর পক্ষে রায় দেন। এখন কোন কোন লোক আপনার পত্রিকায় নতুন করে বিষয়টি উথাপন করছে। আমি চাই, লোকেরা এ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করার পূর্বে এর শরঈ মর্যাদা ভাল করে বুঝে নিক।

উত্তরাধিকার সম্পর্কে
কুরআন—সুন্নাহর মৌলিক বিধান

১. মীরাসের প্রশ্ন কোন লোকের জীবদ্দশায় উথাপিত হয় না, বরং সে কিছু সম্পদ রেখে মারা যাওয়ার পরই এ প্রশ্ন উথাপিত হয়। এ মূলনীতি কুরআনের কয়েক জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নিসার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

> "পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন অংশ রয়েছে, অনুরূপভাবে মেয়েদেরও অংশ রয়েছে।"

সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

> "যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।"

অনুরূপভাবে সূরা নিসার ১১–১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকার আইনের বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার تَرَكَ (সে যা রেখে গিয়েছে) تَرَكْتُمْ (তোমরা যা রেখে গিয়েছ) এবং تَرَكْنَ (তারা যা রেখে গিয়েছে) শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মীরাসের হুকুম শুধু পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথেই সংশ্লিষ্ট।

২. উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে যে সূত্রগুলি পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ

(ক) মীরাসের কোন অধিকার মুরিসের (যার পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়) মৃত্যুর পূর্বে সৃষ্টি হয় না।

(খ) মীরাসের অধিকার শুধু তারাই লাভ করে, যারা মুরিসের মৃত্যুর পর সশরীরে জীবিত অবস্থায় থাকে, জীবিত ধরে নিয়ে নয়।

(গ) মুরিসের জীবদ্দশায় যে ব্যক্তি মারা যায়, মুরিসের পরিত্যক্ত

সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নেই। কেননা মীরাসের অধিকার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সে মারা গেছে। কাজেই কোন ব্যক্তি তার পূর্বে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির ওয়ারিস অথবা তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিকার বলে এই মৃত ব্যক্তির পূর্ববর্তী মৃত ব্যক্তির (কথিত) পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজের কোন অধিকার দাবী করতে পারে না। অবশ্য সে যদি তার সম্পত্তিতে সরাসরি কোন শরঈ অধিকার রাখে তবে তা পেতে পারে।

৩. কোন ব্যক্তির (মুরিস) মৃত্যুর সময় যেসব লোক জীবিত থাকে তাদের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জন্য কুরআন যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছে তা এ নয় যে, যারা অভাবগ্রস্ত অথবা সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে এই সম্পত্তি দেয়া হবে। বরং তা হচ্ছে এই যে, আত্মীয়তার দিক থেকে যে ব্যক্তি মৃতের নিকটতর অথবা মৃত ব্যক্তি তাদের নিকটতর আত্মীয় কেবল তারাই তার উত্তরাধিকারী হবে। নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে অপেক্ষাকৃত দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ওয়ারিস হবে না।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে ধন-সম্পদ রেখে যায় তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে ধন-সম্পদ রেখে যায় তাতে স্ত্রীলোকদেরও অংশ রয়েছে-(সূরা নিসাঃ৭)।

সূরা নিসার এই আয়াতে নিম্নোক্ত মূলনীতি বর্ণিত হয়েছেঃ

"পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই অংশ রয়েছে।"

৪. কোন ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় কে বা কারা তা স্বয়ং কুরআন মজীদ বর্ণনা করে দিয়েছে। কুরআন সাথে সাথে এটাও বর্ণনা করে দিয়েছে যে, এদের মধ্যে কে কতটুকু অংশ পাবে। তা হলঃ
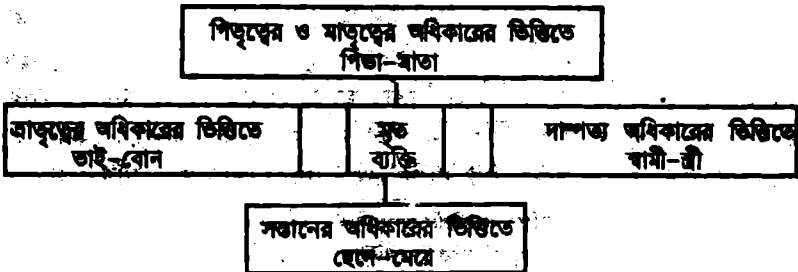
৫. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের এই পরিকল্পনার অধীনে যে আত্মীয়ই যতটুকু অংশ পায় তা মৃতের সাথে তার নিকট সম্পর্কের কারণেই পেয়ে থাকে।

নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে অন্য কেউ তার অধিকারের অংশীদার হতে পারবে না এবং তার অবর্তমানে অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ নিকটাত্মীয়ের অংশ নেয়ার অধিকারী হতে পারে না।

(ক) পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকার মৃতের আপন পিতা-মাতা লাভ করে। তাদের বর্তমানে অন্য কেউ এ অধিকার লাভ করতে পারে না। অবশ্য পিতার অবর্তমানে পিতামহ (দাদা), তার অবর্তমানে প্রপিতামহ পিতৃত্বের অধিকার লাভ করবে। অনুরূপভাবে মা জীবিত না থাকলে দাদী-নানী এবং তারা জীবিত না থাকলে প্রপিতামহী ও প্রমাতামহী এ অধিকার লাভ করবে। এর কারণ এই নয় যে, আপন পিতা-মাতার অবর্তমানে তারা (দাদা-নানা, দাদী-নানী) তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ওয়ারিস সাব্যস্ত হয়েছেন। বরং তাদের উত্তরাধিকার লাভের মূল কারণ হচ্ছে পিতার অবর্তমানে দাদা বা নানা এবং মায়ের অবর্তমানে দাদী বা নানী আপনা আপনিই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকার রাখেন।

(খ) সন্তান হিসাবে যে অধিকার সৃষ্টি হয় তা শুধু মৃতের ঔরসজাত বা গর্ভজাত ছেলে-মেয়েরাই লাভ করে। তাদের বর্তমানে নাতিরা কোনভাবেই এ অধিকার পেতে পারে না। অবশ্য পুত্র-কন্যাদের কেউই যদি বর্তমান না থাকে তাহলে নাতিরা এ অধিকার (হক্কে ওয়ালাদিয়াত) লাভ করবে। পিতা-মাতার বিপরীতে কোন ব্যক্তির অনেক সন্তান থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার এক বা একাধিক সন্তান মারা যায় এবং তার মৃত্যুর পরও তার এক বা একাধিক সন্তান জীবিত থাকে। এ কারণেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অধিকারের বিপরীতে সন্তানের অধিকারের ক্ষেত্রে (সন্তান হিসাবে যে অধিকার সৃষ্টি হয়) একটা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তা হল, সন্তানের (পুত্রের) বর্তমানে সন্তানের সন্তানরা (নাতি) উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। যারা এ বিষয়ের নীতিগত পার্থক্য অনুধাবন করতে পারছে না তারা এই অবস্থা দেখে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, "পিতার মৃত্যুর পর দাদা যখন পিতৃত্বের অধিকার লাভ করতে পারে-তাহলে পিতার মৃত্যুর ক্ষেত্রে নাতি কেন সন্তানের অধিকার লাভ করতে পারবে না? এ দাবী যদি যথার্থ হত তাহলে কেবল এ অবস্থায়ই হতে পারত-যদি একই ব্যক্তি একই সময় তিন-চার ব্যক্তির সন্তান হত। অতঃপর তাদের কোন একজনের মৃত্যুর পর দাদা ওয়ারিস হয়ে যেত। অথবা কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার সবগুলো সন্তান মারা যাওয়া সত্ত্বেও যদি

নাতি-নাতনীদের ওয়ারিস না করা হত। পুনরায় তারা এ ব্যাপারে আরো একটি ভুল করে। তারা পিতার অবর্তমানে তার স্থলে দাদার স্থলাভিষিক্ত হওয়াটাকে "স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতির" উপর ভিত্তিশীল মনে করে বসে, আর জেদ করে বলে যে, পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে দাদা যেভাবে তার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে যায় অনুরূপভাবে পুত্রের মৃত্যুর পরপরই নাতিকে তার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। যাই হোক ব্যাপারটা রেশন দোকানে ক্রেতাদের লাইন নয়; বরং এটা "নৈকট্য ও দূরত্বের মূলনীতির" ব্যাপার। কাজেই যতক্ষণ এমন ব্যক্তি বর্তমান থাকে যার বীর্যে সরাসরি এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে-ততক্ষণ "পিতৃত্বের অধিকার" এমন কোন ব্যক্তি পেতে পারে না-যার বীর্যে সে পরোক্ষভাবে (বিল-ওয়াসিতা) জন্মেছে। অনুরূপভাবে যতক্ষণ এমন সন্তান বর্তমান থাকে যে কোন ব্যক্তির সরাসরি ঔরসজাত-ততক্ষণ পরোক্ষ সন্তান কখনো "সন্তানের অধিকার" লাভ করার দাবীদার হতে পারে না। পিতার অবর্তমানে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতৃত্বের অধিকার লাভ করে না, বরং কোন সম্পর্ক ছাড়াই পিতার অবর্তমানে পিতার মাধ্যমে নিজে এ অধিকার লাভ করে।

(গ) "দাম্পত্য অধিকার" শুধু সেই পেতে পারে যার সাথে মৃতের বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। বৈবাহিক সম্পর্ক যেহেতু বংশধারার মাধ্যমে হতে পারে না এজন্য মুরিসের (শ্বশুরের) জীবদ্দশায় স্বামী কিংবা স্ত্রী মারা গেলে তার মীরাসের অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়। "স্থলাভিষিক্তের নীতিও" এখানে পাওয়া যায় না। স্বামীর জীবদ্দশায় যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে তার (স্ত্রীর) ওয়ারিসদের কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দাম্পত্য স্বত্ব দাবী করতে পারে না। কিংবা স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) ওয়ারিসদের কেউ স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দাম্পত্য স্বত্ব দাবী করতে পারে না। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই "স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মূলনীতি" বর্তমান নেই।

(ঘ) সন্তান এবং পিতার বর্তমান না থাকা অবস্থায় "ভ্রাতৃত্বের অধিকার" শুধু ভাই-বোনেরাই পেয়ে থাকে। চাই সে (ভাই-বোন) সহোদর, বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় হোক না কেন। এখানেও "স্থলাভিষিক্তের মূলনীতি" বর্তমান নেই। ভাইয়ের অবর্তমানে তার সন্তানরা তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তার (চাচার) ওয়ারিস হতে পারে না। ভাইয়ের সন্তানেরা যদি কখনো (চাচার সম্পত্তির) অংশ লাভ করে তবে তা যাবিল-ফুরূজ (যাদের অংশ কুরআনে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে) না থাকার কারণে বা যাবিল ফুরূজের অংশ দেয়ার

পর 'আসাবা' হওয়ার কারণে নিজের অধিকার হিসাবে লাভ করে, কারো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিকারবলে নয়।

৬. কুরআন মজীদ শুধু উপরোক্ত চারটি অধিকারের* যে কোন একটি পেতে পারে– এমন ধরনের সব আত্মীয়ের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং তাদের অংশও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এরপর দুটি প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকে। এক, কুরআন নির্ধারিত অংশ বন্টন করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা কোথায় যাবে? দুই, কুরআন যাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে তাদের কেউ যদি বর্তমান না থাকে তাহলে কারা এর ওয়ারিস হবে? কুরআনের ভাষ্যকার হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইশারা–ইংগিতের ভিত্তিতে এ দুটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হল, নিকটাত্মীয়দের অংশ প্রদানের পর অথবা তাদের অবর্তমানে মৃতের পিতৃকুলের এমন সব নিকটাত্মীয়রা এই সম্পত্তির ওয়ারিস হবে যারা প্রকৃতিগতভাবেই তার সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হয়ে থাকে। এ–ই হচ্ছে আসাবা শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ব্যক্তির এমন সব বংশধর যারা তার জন্য আকর্ষণ অনুভব করে। এদের অবর্তমানে যাবিল–আরহাম (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, যেমন–মামা, নানা, ভাগিনা, এবং মেয়ে অথবা নাতনীর সন্তানগণ) এ অংশ পাবে। এখানেও "স্থলাভিষিক্তের মূলনীতিও" কার্যকর হচ্ছে না এবং "অভাবগ্রস্থ ও অনুগ্রহ পাওয়ার উপযোগী লোকদের সাহায্য করার" মূলনীতিও প্রযোজ্য হচ্ছে না। বরং এখানে কুরআন নির্দেশিত চার মূলনীতিই কার্যকর হচ্ছে।

এক. নিকটতম আত্মীয়দের পরে কম নিকটের আত্মীয়রা ওয়ারিস হবে এবং নিকটতম আত্মীয়দের বর্তমানে অপেক্ষাকৃত দূরের আত্মীয়রা ওয়ারিস হবে না। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানে ওয়াল আকরাবুন" "পিতা–মাতা এবং নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের অংশ আছে।"

দুই. যাবিল–ফুরূজ ছাড়া অন্যদেরকে ওয়ারিস নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে মৃতের উপকার ও সাহায্য– সহযোগিতায় স্বভাবত কে বেশী উদ্যোগী হতে পারে। যেমন–কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "আইয়্যুহুম আকরাবু লাকুম নাফআ" "সাহায্য সহযোগিতার দিক দিয়ে কে তোমাদের নিকটতর?"

তিন. স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষরাই স্বাভাবিকভাবে 'আসাবা' হওয়ার অধিক উপযোগী। এজন্য কুরআন পিতা–মাতার মধ্যে পিতাকে আসাবা গণ্য করে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ নিকটতম পুরুষ আত্মীয়কে

* পিছনে হক দেখুন

দাও।" কিন্তু কোন কোন অবস্থায় মহিলারাও আসাবা হতে পারে। যেমন, কোন মৃতের ওয়ারিস কেবল কন্যা সন্তানরাই হয়েছে এবং তার অন্য কোন পুরুষ আসাবা নেই। এমতাবস্থায় মেয়েদের নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট অংশ মৃতের বোনকে দিতে হবে। কেননা এরূপ অবস্থায় বোনই তার পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়স্থল বলে গণ্য হয়।

চার. কুরআন চতুর্থ মূলনীতি এভাবে বর্ণনা করেছেঃ "ওয়া-উলুল আরহামি বা'দুহুম আওলা বিবাদিন"। "মীরাসের ব্যাপারে দূরবর্তী আত্মীয়ের তুলনায় রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের অধিকার অগ্রগণ্য।" এ মূলনীতির ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল খালু ওয়ারিসুন মান লা ওয়ারিসা লাহু।" "যার কোন ওয়ারিস নেই মামা তার ওয়ারিস"।

এই হচ্ছে মীরাস বন্টনের ইসলামী মূলনীতি। যে ব্যক্তি কখনো বুঝে কুরআন পাঠ করেছে এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পর্কে চিন্তা করেছে- সে কখনও উল্লেখিত মূলনীতি অনুধাবনে ভুল করতে পারে না।

এ কারণেই 'আসাবা' নির্ধারণ এবং যাবিল-আরহামের উত্তরাধিকার প্রসংগ বাদ দিয়ে মীরাসী আইনের বুনিয়াদী মূলনীতির ক্ষেত্রে উম্মাতের সকল আলেম শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একমত রয়েছেন। এবং ইতিপূর্বে এমনকি বর্তমান যুগের পূর্বে ইসলামী ইতিহাসের কোন স্তরে এরূপ আওয়াজ কখনো শুনা যায়নি যে, উম্মাতের গোটা আলেম সমাজ সম্মিলিতভাবে কুরআনের এ বিধান অনুধাবন করতে ভুল করেছেন।

স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মূলনীতির ভ্রান্তি

মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানদেরকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করলে মূলত যেসব আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে এবং এই প্রস্তাব একটা সুষ্ঠু, সুসংহত ও যুক্তিসম্মত "উত্তরাধিকার আইনকে" কিভাবে অযৌক্তিক ও বিশৃংখল করে রেখে দেয় এখন আমি তা আলোচনা করব।

এর বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি হচ্ছে এই যে, এ প্রস্তাব ইসলামের মীরাসী আইনে "স্থলাভিষিক্ত" হওয়ার একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটায়-যার কোন প্রমাণ কুরআনে পাওয়া যায় না। কুরআনের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিই মীরাসের অংশ লাভ করে তা মৃত ব্যক্তির নিকটতর হওয়ার কারণেই লাভ করে, অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে নয়। সন্তানের অবর্তমানে সন্তানের সন্তান (নাতি) এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে পিতামাতার পিতা-মাতা (দাদা-দাদী, নানা-নানী) যে ওয়ারিস সাব্যস্ত হয় তা কারো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে নয়, বরং সরাসরি সন্তান এবং সরাসরি

পিতামাতার অবর্তমানে পরোক্ষ সন্তান (নাতি) এবং পরোক্ষ পিতা (দাদা) আপনা আপনিই সন্তানের অধিকার ও পিতৃত্বের অধিকার লাভ করে। এর প্রমাণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর ওয়ারিসগণ সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে কোন দাম্পত্য অধিকার লাভ করতে পারে না। এজন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মৃত স্ত্রীর ওয়ারিসগণ অথবা কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর তার মৃত স্বামীর ওয়ারিসগণ কোন অবস্থায়ই তাদের (স্বামী বা স্ত্রী) অংশ পায় না। অন্যথায় ইসলামী আইনে যদি বাস্তবিকই স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতি বর্তমান থাকত তাহলে শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা-শালী এবং সৎ-সন্তানাদির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণই ছিল না।

দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে এই যে, স্থলাভিষিক্তের নীতি মেনে নেয়ার পর এই প্রস্তাব তাকে (স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতিকে) পুত্র-কন্যাদের সন্তানদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে। অথচ এর কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ নেই। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতি যদি মূলতই কোন সঠিক ও নির্ভুল নীতি হত তাহলে তো আইন এভাবে হওয়া উচিতঃ

"মূরিসের মৃত্যুর পর যেসব লোকের শরীআতের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিস হওয়ার কথা-এমন কোন ব্যক্তি যদি মূরিসের জীবদ্দশায় মারা যায় তবে তার শরঈ ওয়ারিসগণকে তার স্থলাভিষিক্ত মনে করতে হবে এবং মূরিসের মৃত্যুর পর তারাও মীরাসের অংশ পাবে"।

যেমন-কোন ব্যক্তির স্ত্রী তার জীবদ্দশায় মারা গেল। এমতাবস্থায় স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মৃত স্ত্রীর ওয়ারিসগণকে তার স্থলাভিষিক্ত মনে না করার কি কারণ থাকতে পারে? কোন ব্যক্তির পিতা তার জীবদ্দশায় মারা গেল। "স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতিমালা" মেনে নেয়ার পর কোন্ যুক্তিসংগত দলীলের ভিত্তিতে এই মৃত পিতার ওয়ারিসদের সকলকে তার স্থলাভিষিক্ত মনে করে তাদেরকে তার (মৃত পিতার পুত্রের) পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস করা যাবে না? এক ব্যক্তির চারটি সন্তান বাল্যকালে তার জীবদ্দশায় মারা গেল। এমতাবস্থায় এই সন্তানদের মাকে কেন তাদের স্থলাভিষিক্ত বানানো যাবে না এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে মৃত সন্তানদের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তাদের প্রাপ্য অংশের উত্তরাধিকারী করা হবে না? কোন ব্যক্তির একটি বিবাহিত পুত্র তার জীবদ্দশায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। এ ক্ষেত্রে তার বিধবা স্ত্রী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে শ্বশুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না কেন? এর কি কারণ থাকতে পারে? কেবলমাত্র সন্তানের সন্তান (নাতি) পর্যন্ত "স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতিমালা"কে সীমাবদ্ধ রাখা এবং অন্যান্য সবাইকে এর বাইরে

রাখাটা যদি কুরআনের কোন দলীলের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে তাহলে তা চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিন। অথবা যদি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে তবে তাও গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিন। অন্যথায় সোজা বলে দিন যে, "স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতিমালা" যেরূপ মনগড়া এর প্রয়োগও হবে তদ্রূপ মনগড়াভাবে।

তৃতীয় আপত্তি হচ্ছে এই যে, আইন-কানুন বুঝার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের মীরাস সম্পর্কিত নির্দেশাবলী থেকে যে মূলনীতি হৃদয়ংগম করতে পারে-এই প্রস্তাব তারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ারিসী অধিকার মুরিসের জীবদ্দশায় জন্মায় না। কিন্তু এই প্রস্তাব এই অনুমতির উপর ভিত্তিশীল যে, মুরিসের জীবদ্দশায়ই এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুরিসের মৃত্যু পর্যন্ত এর প্রয়োগ মুলতবী থাকে। কুরআনের দৃষ্টিতে মুরীসের মৃত্যুকালে যারা জীবিত থাকে কেবল তারাই তার ওয়ারিস হতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাব মুরিসের জীবদ্দশায় মরে যাওয়া ব্যক্তিকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করে।

চতুর্থ আপত্তি হচ্ছে এই যে, কুরআন যে সকল আত্মীয়ের অংশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নীতিমালা স্বয়ং কুরআনের নির্ধারিত কোন কোন অংশে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তির মাত্র দুটি ছেলে ছিল। তারা উভয়ে পিতার জীবদ্দশায় মারা গেল। এদের একজন চারটি সন্তান রেখে মারা গেল। দ্বিতীয় জন একটি সন্তান রেখে মারা গেল। কুরআনের দৃষ্টিতে "সন্তানের অধিকারের" (সন্তান হিসাবে যে অধিকার জন্মায়) দিক দিয়ে পাঁচ নাতিই সমান। অতএব দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের প্রত্যেকেরই সমান অংশ পাওয়া উচিৎ। কিন্তু "স্থলাভিষিক্তের নীতি" অনুযায়ী এক পৌত্র ঐ সম্পদের অর্ধেক পাবে এবং অপর চার পৌত্র দুই আনা করে (অর্ধেক) পাবে।

আরো একটি ভ্রান্ত প্রস্তাব

বর্তমানে একদল লোক উত্তরাধিকার সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তাব এভাবে সাজিয়েছেঃ "মুরিসের বংশের এমন কোন আত্মীয়-যে তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হত-সে যদি মুরিসের আগেই মারা যায় তাহলে তার নিকটতম বংশীয় নিকটাত্মীয়গণ তার স্থান দখল করবে। মুরিসের মৃত্যুর পর সে যে অংশটা পেত-এটা এখন তারাই পাবে। এরা যদি সংখ্যায় একাধিক হয় তাহলে কুরআনের বন্টন-নীতি অনুসারে ঐ অংশটুকু তাদের সবার মধ্যে বন্টিত হবে।"*

* ঃ মুরিস হল-দাদা, তার বংশীয় নিকটতম আত্মীয় হল-তার পুত্র, কন্যা, এদের নিকটতম

এই প্রস্তাবে দুই স্তরে "বংশীয় আত্মীয়" কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম স্তরে মুরিসের মৃত সম্ভাব্য ওয়ারিসদের মধ্যে শুধু তার বংশীয় আত্মীয়দেরকে অংশ পাওয়ার জন্য বাছাই করে নেয়া হচ্ছে। এবং অন্যদেরকে ইচ্ছামত বঞ্চিত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরে এই মৃত অংশীদারদের শুধু বংশীয় আত্মীয়দেরই বেছে নেয়া হচ্ছে এবং অবশিষ্টদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "বংশীয় আত্মীয়দের" এই শর্ত কুরআনের কোন্ হুকুম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে? বস্তুত কুরআন যদি বাস্তবিকই এ অনুমতি দিয়ে থাকে যে, কোন ব্যক্তির যে সম্ভাব্য ওয়ারিস তার জীবদ্দশায় মারা গেল, তার মৃত্যুর পর তাকে (সম্ভাব্য ওয়ারিসকে) তার মীরাস দেয়ার খাতিরে আইনতঃ জীবিত মনে করা হবে– তা'হলে জীবন লাভের এই পুরস্কারের ব্যবস্থা সম্ভাব্য সকল ওয়ারিসদের জন্যই থাকা উচিত। তাদের মধ্য থেকে কেবল বংশীয় আত্মীয়দের বেছে নেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আবার এই বংশীয় মৃত আত্মীয়দের আইনগতভাবে জীবিত ধরে নিয়ে আপনি কেবল তাদের জীবিত বংশীয় আত্মীয়দেরকে ওয়ারিস করেছেন এবং অন্যান্য ওয়ারিসদের বঞ্চিত করছেন। আপনি কি কুরআন থেকে প্রমাণ করতে পারেন যে, মুরিসের মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তিকে আইনগতভাবে জীবিত মনে করে নিয়ে নয়, বরং বাস্তবিকই যদি সে জীবিত থাকত এবং মুরিসের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়ার পর মারা যেত, তাহলে শুধু কি তার (জীবিত) বংশীয় আত্মীয়রাই ওয়ারিস হত?

যাক। কিছুক্ষণের জন্যে এ অভিযোগগুলো রেখে দিন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পিতা-মাতা তো বংশীয় আত্মীয়ের বহির্ভূত থাকার কথা নয়। মনে করুন, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার পিতা মারা গেল। পিতার আরো এক স্ত্রী ছিল এবং তার গর্ভজাত তার সন্তানও বর্তমান আছে। পিতার প্রথম স্ত্রীর, যার গর্ভে সে জন্মেছে, আরও সন্তান বর্তমান আছে। এর নিজেরও সন্তান-সন্ততি রয়েছে। এখন যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে আপনি আপনার সূত্র অনুযায়ী তার মৃত পিতার অংশ বের করতে বাধ্য। সে মোট সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পেতে পারে। অতঃপর এ অংশকে আপনি তার বংশীয় আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করবেন। অর্থাৎ তার উভয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ এবং নাতিরাও –যাদের পিতা-মাতা তার জীবদ্দশায় মারা গেছে–আপনার সূত্র অনুযায়ী সবাই ওয়ারিস হবে।

এভাবে মৃতের সন্তানদের সাথে কেবল তাদের সৎ ভাই-বোনই নয়, বরং ভাই-বোনের সন্তানরাও পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যাচ্ছে। অথচ এটা কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বংশীয় আত্মীয় হল–তাদের সন্তানগণ। অর্থাৎ দাদা-পুত্র-নাতি। পুত্র আগে মারা গেল, নাতি তার স্থানে দাঁড়াল। অতঃপর দাদা মারা গেল–নাতি অংশ লাভ করবে–এই সূত্র অনুযায়ী।

যে ব্যক্তির সন্তান বর্তমান রয়েছে তার সহোদর এবং সৎ ভাই-বোন কুরআনের দৃষ্টিতে তার ওয়ারিস হতে পারে না। এবং তার মৃত ভাই-বোনের সন্তানরাও ওয়ারিস হতে পারে না। কিন্তু আপনি তার মৃত পিতাকে অংশীদার নির্ধারণ করে তার জীবিত সন্তানদের অধিকার আত্মসাৎ করেছেন।

এ কেবলমাত্র একটা উদাহরণ। এরকম আরো অংসখ্য উদাহরণ পেশ করা যায়। মৃত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানী ইত্যাদি যারা "বংশীয় আত্মীয়ের" সংজ্ঞার আওতায় পড়ে যায়, তাদেরকে আইনগতভাবে জীবিত ওয়ারিসদের মত অংশীদার নির্ধারণ করা এবং তাদের "বংশীয় আত্মীয়দের" মধ্যে এই অংশ বন্টন করায় কি জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা এসব উদাহরণ থেকে পরিকার বুঝা যায়।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমি শুধু এটাই স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের সর্বসম্মত মীরাসী আইনে এখন যেসব সংশোধনীর প্রস্তাব করা হচ্ছে তার কতটুকু ইলমী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল ইয়াতীম সন্তানদের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টির মূল কারণ কি এবং কিভাবে তার সমাধান করা যেতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবও তেমন একটা জটিল নয়। বিশেষজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ অনুযায়ী শরীআতের মূলনীতির আওতায় অবস্থান করেই এ সমস্যা সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে এবং তা জটিলতা নিরসনেও প্রস্তাবিত সংশোধনীর তুলনায় অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

দ্বিতীয় চিঠি

দৈনিক 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকায় ইয়াতীম নাতির মীরাস সম্পর্কে আমার উপরের প্রবন্ধ প্রকাশের পর 'তাওনসা শরীফ' থেকে এক ব্যক্তি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুমের একটি চিঠির অনুলিপি আমার কাছে পাঠান এবং এ সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। এছাড়া তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্নও করেন। আমি তার চিঠি এবং প্রশ্নের জবাবে যা কিছু লিখেছি তা প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। কেননা এতে বেশীর ভাগই এমন সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব এসে গেছে যা 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর কোন কোন লোক করেছিলেন।

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে যেসব কথা বলা হয়েছে শুধু তার দুই একটি কথার বিশ্লেষণ বাকি থেকে যায়। এক ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন যে, আমি প্রথমে না কি লিখেছিলাম—ইয়াতীম নাতির মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। আর এখন আমি

কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে তা (বঞ্চিত হওয়া) প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি আরজ করব যে, তিনি আমার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করেননি। আমার কথায় উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু ছিল যে, কুরআন-হাদীসে কোথাও পরিষ্কারভাবে এই নির্দেশ তো দেয়া হয়নি যে, ছেলেদের বর্তমানে ইয়াতীম নাতিরা মীরাসের অধিকারী হবে না। (অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীসে এমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশও নেই যে, ইয়াতীম নাতিদের অবশ্যই ওয়ারিসী স্বত্ব দিতে হবে)। কিন্তু কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত মীরাস বন্টনের স্কীমের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা হচ্ছে-"পুত্রের বর্তমানে ইয়াতীম নাতি মীরাস পাবে না।" উম্মাতের সমস্ত আলেম এর উপর একমত রয়েছেন। সদ্যপ্রাপ্ত একটি চিঠিতে "খেলাফতের পদ কোরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার" উপর পূর্ববর্তী আলেমদের (উলামায়ে সালাফ) ইজমার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-"পরবর্তীকালের আলেমগণ এই ইজমা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অতএব ইয়াতীম নাতির মীরাসের ক্ষেত্রেও ইজমার বিপরীত মত পোষণ করা যেতে পারে।" কিন্তু ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব হাদীস এই ইজমার ভিত্তি তাতে এও পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, "যতদিন তারা (কুরাইশ) ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালন করবে-তাদের হাতেই খেলাফত থাকবে।" 'সকীফায়ে বনী সায়েদায়' হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু এ কথাটাই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, "কুরাইশরা যতদিন আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকবে এবং তাঁর বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবে, শাসন ক্ষমতা ততদিন তাদের হাতেই থাকবে।" অতএব পরবর্তীকালে অকুরাইশদের খেলাফতের বৈধতার ফতওয়া পূর্ববর্তী ইজমার বিরোধিতা করে দেয়া হয়নি। বরং তা দেয়া হয়েছিল কুরাইশদের মধ্যে উল্লেখিত বৈশিষ্টগুলো বর্তমান না থাকার কারণে। আর এগুলো খেলাফত লাভের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ের উপর একথা বলা ঠিক নয় যে, পরবর্তী কালের আলেমগণ পূর্বের ইজমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। এ প্রসংগে এটাও বুঝে নেয়া দরকার যে, যদি কোন ইজমার উৎস আদতেই কুরআন ও হাদীসে বর্তমান না থাকে, তাহলে এ ধরনের ইজমা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইজমার উৎস কুরআন-হাদীসে বর্তমান আছে তা কেবল কুরআন-সুন্নার দলীল- প্রমাণের ভিত্তিতেই পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব। যেমন আমি উপরে কুরাইশদের খেলাফতের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলে এসেছি। এখন আমি তাওনসা শরীফ থেকে প্রাপ্ত চিঠির বিশেষ অংশগুলো এবং তার জবাব নকল করছিঃ

১. মীরাস সম্পর্কে মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের চিঠিতে চিন্তার যে নতুন দৃষ্টিভংগীর ইংগিত পাওয়া যায়–এর উপর আপনি কিছুটা আলোকপাত করবেন কি?

২. চিঠির ভাষায় বুঝা যাচ্ছে যে, পিতার ঘরে জন্মগ্রহণের মাধ্যমেই সন্তানের মীরাসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে পিতার মৃত্যুর পর (অতএব পুত্রের মৃত্যুতে নাতি দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না)।

৩. এই দৃষ্টিভংগী যদি ভ্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে পিতার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে কিংবা সে ভবঘুরে প্রকৃতির হলে তার সন্তান কিভাবে দাদার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অথবা court of ward করানোর অধিকার লাভ করে?

লেখকের জবাব

১. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুমের ছাপা চিঠি থেকে কোন নতুন চিন্তা–দর্শনের দিকনির্দেশ বের করা সম্ভব নয়। তাঁর চিঠিতে প্রথমত ইয়াতীম নাতির মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে ফিকাহবিদদের একটি দলীল নকল করা হয়েছে। অতপর এই দলীল খন্ডন না করেই শুধু বলা হয়েছে, "ফিকাহবিদদের দৃষ্টি কেবল একটা কারণের দিকেই গিয়েছে এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য স্বীকৃত ও জ্ঞাত কারণ ও মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে।" কিন্তু যেসব কারণ ও মূলনীতি মাওলানার মতে "জ্ঞাত এবং প্রমাণিত" সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছুই বলেননি। এজন্য তাঁর মতে, 'যেসব কারণ ও মূলনীতি উপেক্ষা করা হয়েছে' সেগুলো কি তা জানা যাচ্ছে না। এটাও জানা যাচ্ছে না যে, তাঁর ভাষায় জ্ঞাত ও সুস্পষ্ট কারণ ও মূলনীতিগুলো আসলেই সুস্পষ্ট ও জ্ঞাত কি না।

২. আপনি মাওলানার চিঠির কোন্ অংশ থেকে এই তাৎপর্য বের করলেন যে, "সন্তান পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই পিতার সম্পত্তির মালিক বলে স্বীকৃতি লাভ করে, কিন্তু এটা তার হস্তগত হয় পিতার মৃত্যুর পর?" আমি তো এর সামান্য ইংগিতও এ চিঠির কোথাও পাচ্ছি না। এ ধারণাটা মূলত কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন–এ প্রবন্ধে আমি বর্ণনা করেছি, যা আপনি 'নওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকায় দেখেছেন। কুরআনের দৃষ্টিতে মুরিসের জীবদ্দশায় মীরাসী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না, বরং তার মৃত্যুকালে যেসব আত্মীয় জীবিত থাকে কেবল তারাই এ স্বত্ব লাভ করে। আপনি যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তা তো আসলে হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথায় দেখা যাচ্ছে, যা দীর্ঘদিন ধরে এখানকার মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। হিন্দু ধর্ম মতে মীরাসী সম্পত্তি মূলত পরিবার কিংবা গোটা বংশের যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি। পরিবারের সদস্যরা

একের পর এক সম্পত্তির সীমিত মালিকানা লাভ করে এবং তাদের কাজ হল অবিকল এই সম্পত্তি একজন থেকে আরেকজনের কাছে হস্তান্তর করা। মনে হচ্ছে যেন তাদের ধর্মে বর্তমান ভবিষ্যতের সকল বংশধর একই সময়ে যৌথ ওয়ারিস হয়। এই নীতির অধীনে পিতা তার পৈত্রিক সম্পত্তি ধ্বংস কিংবা অন্য কাউকে হস্তান্তরের চেষ্টা করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পুত্র তার উত্তরসূরী হিসাবে উক্ত সম্পত্তিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে কোর্টের আশ্রয় নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লাভ করতে পারে। ইসলাম মীরাসী এবং অ-মীরাসী সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ধারণ করে না এবং মালিকের অধিকার শর্তসাপেক্ষ বা সীমিতও করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মালিক তার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ মালিক। চাই সে সম্পত্তি নিজে উপার্জন করুক অথবা পূর্বপুরুষদের থেকে মীরাসী সূত্রে লাভ করুক এবং সে এতে তার জীবদ্দশায় বিক্রয়, দান, ওসিয়াত, ওয়াক্‌ফ সব রকমের ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার রাখে।

৩. কোন ব্যক্তির জ্ঞানশূন্য বা নির্বোধ হওয়া অবস্থায় কাজী (বিচারক) তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী শরীআতে অবশ্য এ সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে দাদার সম্পত্তির ক্ষেত্রেও কোন বিশেষত্ব আরোপ করা হয়নি এবং এটাও জরুরী মনে করা হয়নি যে, সম্পত্তির মালিকের সন্তান অথবা অন্য কোন ভবিষ্যত ওয়ারিসই বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পারবে। বরং এ ব্যাপারটির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন লোক বিচারালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ইসলামী শরীআতে এমন কোন জিনিস নেই, যার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি এই সুযোগ বের করতে পারে যে, সে মীরাসের অধিকারী হওয়ার কারণে সম্পত্তির জীবিত মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিশেষ অধিকার রাখে। ইসলামী আইনের এই ধারার উদ্দেশ্য কোন ওয়ারিসের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা নয়, বরং সম্পদের অপচয় এবং ধ্বংস রোধ করা। এই ধারার উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদের এই আয়াতঃ "ওয়ালা তু'তুস-সুফাহাআ আমওয়ালাকুম"-(সূরা নিসা ঃ ৫)। অর্থাৎ, "যে সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের অবলম্বন করেছেন তা নির্বোধের হাতে তুলে দিও না।" এ বিধান অনুযায়ী যার কোন ভবিষ্যত ওয়ারিস নেই, এমন মালিকের ভোগ-ব্যবহারের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। নাতির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যেসব লোক এতই অস্থির এবং ব্যাকুল তাদের এমন কোন মূলনীতি নির্ধারণ করা উচিৎ যার উপর ভিত্তি করে সন্তানদের বর্তমানেও নাতিকে মীরাস দেয়া যেতে পারে। যদি বলা হয় যে, নাতি সন্তান হওয়ার কারণে স্বয়ং মীরাসের অধিকার রাখে এবং সেও এই অর্থে তার দাদারই সন্তান যে অর্থে তার পিতা তার দাদার সন্তান-তাহলে যে সন্তানের

পিতা জীবিত আছে তাকেও তার পিতাসহ দাদার অপরাপর সন্তানদের সাথে মীরাসী স্বত্বে সমান অংশীদার হওয়া উচিত। যেমন–এক ব্যক্তির চার পুত্র এবং আট পৌত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে মীরাস চার ভাগের পরিবর্তে সমান বার ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। যদি এরূপ না হয় এবং কেউ যদি এর প্রবক্তা না হয়, তাহলে শুধু "ইউসীকুমুল্লাহু ফী আওলাদিকুম"–(আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন) আয়াতকে নাতির মীরাসী অধিকার প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করা অথবা আরবী কবিতার ভিত্তিতে নাতিকে সন্তানের পর্যায়ভুক্ত করে কিভাবে দাদার ওয়ারিস করা ঠিক হতে পারে? যদি বলা হয়, নাতি তার পিতার জীবদ্দশায় নয়, বরং পিতার মৃত্যুর পর চাচাদের সাথে দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে–কুরআনে এর সপক্ষে কোন প্রমাণ বর্তমান নেই। কিন্তু সাময়িকভাবে দলীল-প্রমাণের প্রশ্নটা বাদ দিলেও 'সন্তানের–অধিকার' বলে জীবিত পুত্রদের সাথে নাতিকেও ওয়ারিস নির্ধারণের অর্থ হল নাতিও পুত্রদের সাথে সমান অংশ পাবে। যেমন–এক ব্যক্তির তিন পুত্র জীবিত আছে এবং এক পুত্র চারটি ছেলে সন্তান রেখে মারা গেছে। তাহলে এ ব্যক্তির সম্পত্তি সমান সাত ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিৎ। কিন্তু এ কথাও যদি কেউ সমর্থন না করে, তাহলে নাতির মীরাস অবশ্যম্ভাবীরূপে এই ভিত্তির উপর হবে যে, তার মৃত পিতা নিজের পিতার জীবদ্দশায়ই মীরাসের অধিকারী হয়েছিল এবং এখন ইয়াতীম নাতি তার দাদার মীরাস নয় বরং পিতার সেই মীরাসই পাচ্ছে। যদি এই নীতি মেনে নেয়া হয় যে, পিতার জীবদ্দশায় মরে যাওয়া সন্তানের অধিকার বাকী থেকে যায়– তাহলে এ নীতিকে সন্তানের অধিকারী পুত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং যে পুত্র নিসন্তান অবস্থায় মারা গেছে অথবা অল্প বয়সে বা দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় মারা গেছে, তাদের অধিকারও সুরক্ষিত থাকা উচিৎ। এবং তাদের 'শরঈ' ওয়ারিসদের (যেমন স্ত্রী, মা অথবা মার অবর্তমানে ভাই-বোন) অবশ্যই তা পাওয়া উচিত।[১] এ নীতিকে শুধু সন্তানের অধিকারী পুত্রের সন্তানদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার শরঈ' অথবা যুক্তিসংগত কোন প্রমাণ পেশ করা যাচ্ছে না। কোন কোন লোক শুধু মৃত পুত্রের সন্তানদের পর্যন্ত মীরাসকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য বংশীয় এবং অপর অবংশীয় অথবা রক্ত সম্পর্কের এবং রক্ত সম্পর্কহীন আত্মীয়ের পার্থক্য দাঁড় করান। অথচ এ পার্থক্যের ভিত্তিতে কোন কোন ওয়ারিসকে বঞ্চিত করা প্রথমত কুরআনের পরিপন্থী এবং নির্ভেজাল হিন্দুয়ানী ধ্যান ধারণা প্রসূত। দ্বিতীয়ত বংশীয় আত্মীয়ের সারিতে শুধু সন্তানদের শামিল করা এবং মা ও ভাই-বোনদের বাদ দেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং হাস্যকর।

–(তরজমানুল কুরআন, জুলায়ারী ১৯৫৯ খৃ.)

১. যেসব লোক নাতির মীরাসের ব্যাপারে ইয়াতীমদের নাম করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আবেদন

পারিবারিক আইন কমিশনের প্রশ্নমালা ও তার জবাব

[পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিবারিক আইন কমিশনের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালের শেষভাগে যে প্রশ্নমালা প্রকাশ করা হয় এখানে তা জবাবসহ পত্রস্থ করা হচ্ছে।]

বিবাহ

প্রশ্নঃ বিবাহ বন্ধন কি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিবাহ নিবন্ধকের (Marriage Registrar) মাধ্যমেই হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ জ্বি না, ইসলামী সমাজে পাদ্রী প্রথার কোন স্থান নেই। প্রতিটি মুসলমান যেভাবে নামায পড়াতে পারে–অনুরূপভাবে বিবাহও পড়াতে পারে। বরং পাত্র–পাত্রী নিজেরাই দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে (ইজাব–কবূল করতে পারে)। আইনের বলে যদি বিবাহ নিবন্ধকের একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয় তাহলে অনিবার্যভাবেই দুটি অবস্থার যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সরকারী পাদরী ছাড়া যেসব বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে হয় তা বাতিল বলে গণ্য করতে হবে, অথবা তাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত ও আইনের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দেবে। কেননা উল্লেখিত বিবাহ শরীআতের দৃষ্টিতে সহীহ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই নীতি নির্ধারণ করা বাতুলতাই হবে।

প্রশ্নঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রি করানোটা কি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত? যদি তাই হয় তবে এজন্য কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত? এর বিরোধিতা করলে কি ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত?

উত্তরঃ সরকারী রেজিষ্টারে বিবাহসমূহ নিবন্ধিকৃত হওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে উপকার তো অবশ্যই আছে। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ নয়। ইসলামী শরীআত বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য যেসব নিয়ম–কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার

জানাচ্ছেন, তারা এক্ষেত্রে বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন না কেন? তারা যদি ইয়াতীমের সাথে সাথে মৃত দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা এবং নিঃসন্তান পুত্রদের স্ত্রীদের জন্যও মীরাস দাবী করতেন তাহলে ভালই হত। কেননা এরা উভয়েই অসহায় বিধবা এবং ইসলাম ইয়াতীমের সাথে বিধবার প্রতিও অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

মধ্যে এও একটি যে-অন্ততপক্ষে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহের আক্দ হতে হবে, প্রকাশ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হতে পারে। বিবাদপূর্ণ অবস্থায় এধরনের বিয়ের সপক্ষে পরস্পর সাক্ষী সংগ্রহ করা খুব মুশকিল হবে না। যাই হোক দুটি পন্থায় সাক্ষী দাঁড় করানো অধিকতর সহজসাধ্য হতে পারে। এক, বিবাহনামার একটি নমুনা (কাবিননামা) তৈরী করে প্রচার করা যেতে পারে। তাহলে লোকেরা বিবাহ সম্পর্কিত সমস্ত জরুরী বিষয় এতে সংযোজন করে দুজন সাক্ষী নির্ধারণ করে নিতে পারে। দুই, প্রতি গ্রামে একটি বিবাহ রেজিষ্টার রেখে দেয়া যেতে পারে। যে-ই ইচ্ছা করবে এতে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে নিতে পারবে। কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক করার মধ্যে দুটি ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে। এক, বিরোধিতাকারীদের কোন না কোন শাস্তি দিতে হবে। এতে নতুন অপরাধের একটা তালিকা বৃদ্ধি পাবে। দুই, নিবন্ধনবীহিন বিয়েকে স্বীকার করে নিতে বিচারালয়কে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে। অথচ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শরীআতের দৃষ্টিতে তা বিধিবদ্ধ হয়ে যায় এবং তা অস্বীকার করার অধিকার আদালতের নাই। তাছাড়া এটাও চিন্তা করার বিষয় যে, রেজিষ্টারবিহীন বিয়ের সূত্রে পয়দা হওয়া সন্তানদের আপনি অবৈধ সন্তান বলে ঘোষণা করবেন কি? এবং তাদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তির মীরাস থেকে বঞ্চিত করবেন কি? যদি আপনি এ পর্যন্ত যেতে না চান তাহলে রেজিষ্ট্রিকরণকে আইনত বাধ্যতামূলক করার শেষ পর্যন্ত কি অর্থ হতে পারে?

প্রশ্নঃ স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই কোন চাপের মুখে নয় বরং স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে-এটা জানার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

উত্তরঃ বিবাহের পক্ষদ্বয় নিজেদের সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিনা আইনগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইতিবাচকভাবে তা জানা জরুরী নয়। বিবাহের কোন এক পক্ষ চাপের মুখে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় ও অসম্মতিতে ইজাব-কবুল করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি বিয়ের ব্যাপারে ধরে নেয়া হবে যে, উভয় পক্ষের ইচ্ছা ও সম্মতি নিয়েই ইজাব-কবুল হয়েছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী অবশ্যই দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল অনুষ্ঠিত হতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক যতক্ষণ সাক্ষীদের সামনে পরিষ্কার ভাষায় বিয়ে কবুল না করবে-ততক্ষণ পর্যন্ত তা শুদ্ধ হবে না। যুবতীর (যদি সে অবিবাহিত্র কুমারী হয়ে থাকে) ক্ষেত্রে মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি শব্দ করে কাঁদে তাহলে এটা প্রমাণ হবে যে, সে

এ বিয়েতে রাজী নয়। ইসলামী শরীআত পাত্র-পাত্রীর সম্মতি প্রমাণ করার জন্য এভাবে একটি নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। এখন যদি পর্দার আড়ালে পাত্র অথবা পাত্রীর কাছ থেকে বল প্রয়োগে সম্মতি আদায় করা হয়ে থাকে তাহলে এর প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব অভিযোগকারীর উপর বর্তাবে। আইন-বিধি এ ধরনের বল প্রয়োগ না হওয়ার কোন প্রমাণ উপস্থিত করার দাবীদার নয়, বরং স্বেচ্ছায় সম্মত ছিল এই প্রমাণই চায়। যদি কেউ তা দাবী করে। চাপ বা বল প্রয়োগ করা হয়নি-এটা প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক করে দিলে কেবল আইনের উদ্দেশ্যই পাল্টে যাবে না, বরং কার্যক্ষেত্রে কঠিন সমস্যাও দেখা দিবে।

প্রশ্নঃ বিয়ের সময় বরের বয়স ১৮ বছর এবং কনের বয়স ১৫ বছরের কম হতে পারবে না। আপনার মতে বাল্য-বিবাহ রোধ করার জন্য এ ধরনের আইন তৈরী করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরঃ বাল্য-বিবাহ রোধ করার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন নাই এবং এ উদ্দেশ্যে ১৮ বছর ও ১৫ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ করাটা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের দেশের একটি ছেলের ১৮ বছরের অনেক আগেই দৈহিক দিক থেকে যৌবনকাল শুরু হয়ে যায়। অনুরূপভাবে একটি মেয়েও ১৫ বছরের পূর্বেই দৈহিক দিক থেকে যৌবনে পৌছে যায়। আইনগতভাবে এই বয়সকে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করার অর্থ হচ্ছে-এর চেয়ে কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে, কিন্তু কোন অবৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাতে কোন আপত্তি নাই। ইসলামী শরীআত এই কৃত্রিম সীমা নির্ধারণ করা থেকে এজন্যই বিরত থেকেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বরং এর পরিবর্তে বিষয়টি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দেয়া উচিৎ। তারা কখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে বা না হবে তা তারাই নির্ধারণ করবে। শিক্ষা-দীক্ষা ও বিদ্যা-বুদ্ধির উন্নতি ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে লোকদের মাঝে যত বেশী সচেতনতা সৃষ্টি হবে-তত বেশী সঠিক পন্থায় নিজেদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবে এবং সামঞ্জস্যহীন বাল্য বিবাহের প্রচলন দিন দিন কমে যেতে থাকবে। আর বর্তমানে আমাদের সমাজে এর খুব বেশী প্রচলন নাই। বাল্য বিবাহকে শরীআতে কেবল এজন্যই জায়েয রাখা হয়েছে যে, কোন কোন সময় বংশ ও পরিবারের প্রকৃত কল্যাণের জন্য এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাল্য বিবাহকে আইনগতভাবেই জায়েয রাখতে হবে। আর এই অসামঞ্জস্য প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আইনের পরিবর্তে শিক্ষা ও

ব্যাপক গণচেতনার উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করা উচিৎ। সমাজের যাবতীয় বিপর্যয় ও ত্রুটি-বিচ্যুতির নিরাময় কেবল আইনের দন্ডই নয়।

প্রশ্নঃ আপনার মতে বিবাহের বয়স-সীমা নির্ধারণ করে দেয়াটা কি কুরআন করীম ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নাজায়েয?

উত্তরঃ বিবাহের জন্য বয়স-সীমা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসে কোন সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা তো নেই। কিন্তু বাল্য বিবাহ জায়েয হওয়া সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ হাদীসসমূহে এর বাস্তব উদাহরণ মওজুদ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে শরীআতে যে জিনিস জায়েয রয়েছে, তাকে আপনি কোন্ দলীলের ভিত্তিতে আইনের বলে হারাম ঘোষণা করবেন? আইনের বলে আপনি যদি একটা বয়স-সীমা নির্ধারণ করে দেন, তবে তার অর্থ হচ্ছে-এর চেয়ে কম বয়সে যদি বিয়ে করা হয় তা আপনি বাতিল গণ্য করবেন এবং দেশের বিচারালয়ও এর স্বীকৃতি দিবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই বিয়েকে নাজায়েয এবং বাতিল সাব্যস্ত করার কোন অনুমতি কুরআন এবং সহীহ হাদীসে মওজুদ আছে কি?

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রশ্ন তোলাই চরম ভ্রান্তিকর। বয়সসীমা নির্ধারণের কেবল ইতিবাচক দিকই নয় বরং তার সাথে সাথে নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এর অর্থ শুধু এটুকুই নয় যে, আপনি বিবাহের জন্য কেবল একটি বয়সসীমা নির্ধারণ করতে চান। বরং এর অর্থ এটাও যে, এই বয়সের পূর্বে বিবাহ করাটাকে আপনি নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছেন। এই নেতিবাচক দিকটাকে উপেক্ষা করে আপনি কেবল জিজ্ঞেস করছেন এর ইতিবাচক দিকটা কি নাজায়েয? এতো প্রশ্ন আংশিকভাবে পেশ করার শামিল। পূর্ণাংগ প্রশ্ন তখনই হতে পারে, যখন আপনি এটাও জিজ্ঞেস করবেন—একটি বিশেষ বয়সসীমার পূর্বে বিবাহকে নাজায়েয সাব্যস্ত করার পক্ষে কুরআন এবং সহীহ হাদীসের কোন দলীল আছে কি?

প্রশ্নঃ বিবাহের চুক্তিনামায় এমন যে কোন শর্ত অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে যা ইসলাম এবং নৈতিকতার মৌলনীতির পরিপন্থী নয় এবং আদালতও এসব শর্ত পূর্ণ করতে বাধ্য করতে পারে। এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে ইসলাম ও নৈতিকতার মৌলনীতির পরিপন্থী নয় এমন কোন শর্ত বিবাহ চুক্তির মধ্যে শামিল করা যায় কিনা? এর জবাবে বলা যায়, এ ধরনের শর্ত অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এ জাতীয় কোন শর্তকে কাবিননামায়

আইনত বাধ্যতামূলক অংশে পরিণত করে দিতে হবে। এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারিত কাবিননামায়ও শামিল করতে হবে। শরীআত এ ব্যাপারটি বর-কনে উভয় পক্ষের ব্যক্তিগত মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন (শরীআত অনুমোদিত) শর্ত চূড়ান্ত করে নেবার ব্যাপারটি শরীআত তাদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে। এই সীমা অতিক্রম করে কোন কোন শর্তকে আইন বা প্রচলিত রীতিতে পরিণত করা মূলনীতিরও পরিপন্থী। বাস্তব ক্ষেত্রেও এর ফলে নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সমাজে দেখা গেছে যে, বিবাহে উভয় পক্ষ পরস্পরের উপর আস্থা রেখে কাজ করেছে এবং নানা ধরনের শর্তের কঠিন বন্ধনে কেউ কাউকে আটকাতে চেষ্টা করেনি সেটাই সফল বিয়ে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শর্তের বন্ধন সাধারণত খারাপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে। কেননা এর বদৌলতে আত্মীয়তার সূচনাই হয় অনাস্থার ভিত্তিতে। কৃত্রিম শর্তসমূহের প্রচলন করার জন্য এ দলীলই যথেষ্ট নয় যে, তা ইসলাম এবং নৈতিক মূলনীতির পরিপন্থী নয়। কোন জিনিস ইসলামের পরিপন্থী এবং আখলাকের পরিপন্থী না হওয়ায় তা করতেই হবে এমন তো কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে- ইসলামে ও নৈতিকতার পরিপন্থী নয় এ ধরনের যেসব শর্ত বিয়ের চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার জন্য আইনত বাধ্য করা যায় কি না? এর জবাব হচ্ছে শরীআত নির্ধারিত শর্তাবলী ছাড়া অন্য যেসব শর্ত বিয়ের চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা কার্যকর করার সময় বিচার বিভাগের শুধু এতটুকু দেখলেই চলবে না যে, তা ইসলাম ও নৈতিকতার পরিপন্থী নয়। বরং উভয় পক্ষের ব্যক্তিগত অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ কিনা তাও আদালতকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

প্রশ্নঃ পুরুষদের যেমন তালাক ঘোষণা করার অধিকার রয়েছে, মহিলাদেরও অনুরূপ অধিকার থাকা উচিৎ। বিবাহের চুক্তিনামায় এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং আইনত তা মেনে নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনি কি একমত?

উত্তরঃ ইজাব-কবুলের সময় কনে বলল, আমি তোমার কাছে এই শর্তে বিয়ে বসছি যে, আমি যখনই চাব নিজেকে তালাক দিতে পারব। বর এ শর্ত মেনে নিল। আইন এই শর্তকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। এটা তাফবীজ তালাকেরই পদ্ধতি। ফিকাহবিদগণ এ পদ্ধতিকে জায়েয রেখেছেন। কিন্তু এটা

মনে রাখা দরকার যে, আইনত তাফবীজ তালাক জায়েয হওয়া এক জিনিস আর ইসলামী সমাজে তার প্রচলন করার চেষ্টা করা অন্য জিনিস। শরীআত পুরুষকে তালাকের যে অধিকার দিয়েছে, সে নিজের এ অধিকার তার প্রতিনিধি হিসাবে যার কাছে চায় অর্পণ করতে পারে। আইনত তাফবীজ তালাক জায়েয হওয়ার ভিত্তি এটাই। সে স্ত্রীকেও এ অধিকার প্রদান করতে পারে। কিন্তু এর ব্যাপক প্রচলন করা এবং প্রতিটি বিয়ের চুক্তিনামায় এই শর্ত শামিল করার চেষ্টা করা ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিকার ও কর্তৃত্বের যে সাদৃশ্য কায়েম করেছে তার স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক দাবী হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল স্বামীই তালাক দেয়ার অধিকারী হবে। ইসলাম স্ত্রীর মোহর, ইদ্দাত চলাকালীন সময় তার খোরপোশে, শিশুর দুধ পানকালীন সময়কার এবং তার আত্মনির্ভরশীল হওয়া পর্যন্তকার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর চাপিয়েছে। এজন্য পুরুষ তালাকের অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে সতর্কতার সাথে কাজ করতে বাধ্য হয়। কেননা এর আর্থিক ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে তাকেই বহন করতে হবে।

পক্ষান্তরে ইসলাম নারীর উপর কোন আর্থিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। বরং তালাকের ক্ষেত্রে সে কিছু আর্থিক সুবিধাই পেয়ে থাকে, কোন আর্থিক ক্ষতি তাকে বহন করতে হয় না। এজন্য সে তালাকের অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে চরম অসতর্ক হয়ে পড়তে পারে। বরং সামান্য রাগের মাথায় ও নির্দ্বিধায় সে তালাক প্রয়োগ করে ফেলতে পারে। এসব কারণে ইসলাম দাম্পত্য জীবনের আইন-কানুনে যে স্কীম সামনে রেখেছে তালাকের অধিকার নারীর কাছে হস্তান্তর করা তার পরিপন্থী। এই ভুল পন্থা যদি চালু করা হয় তাহলে সমাজে এর অনেক খারাপ পরিণতি ছড়িয়ে পড়বে। এবং আমরা তালাকের আধিক্যের মহামারীতে এমনভাবে লন্ডভন্ড হয়ে যাব যা থেকে এখনো আমাদের সমাজ নিরাপদরয়েছে।

প্রশ্নঃ আমাদের সমাজের কোন কোন স্তরে কন্যা সন্তান বিক্রির নিকৃষ্ট রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এর মূলোচ্ছেদ করার জন্য আপনার মতে কি ধরনের পদক্ষেপ উপযোগী হবে যাতে পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক কন্যাদের বিবাহ দেয়ার মাধ্যমে অর্থ আদায় করতে না পারে?

উত্তরঃ এটা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের প্রথা। এটাকে আইনত অপরাধ সাব্যস্ত করা উচিৎ। যেসব লোক এভাবে নিজেদের কন্যাদের বিক্রি করে তাদের জন্য জেল অথবা জরিমানার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ আপনি কি এটা উপযুক্ত মনে করেন যে, বিবাহনামার একটি নমুনা তৈরী করা হোক যাতে বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

উত্তরঃ এটা একটা যুক্তিযুক্ত কথা। ফিকাহবিদদের পরামর্শের ভিত্তিতে এ ধরনের একটি বিবাহনামা অবশ্যই প্রণয়ন করা উচিৎ। বরং এর সাথে দাম্পত্য আইনের জরুরী বিধিগুলো সংযোজিত হওয়া উচিৎ। এগুলো জানা না থাকার কারণে লোকেরা সাধারণত ভুল করে থাকে।

তালাক

প্রশ্নঃ যদি কোন স্বামী একই সময় তিন তালাক দেয় তবে আপনার মতে এটা কি চূড়ান্তভাবে মুগাল্লাযা তালাক গণ্য হবে না কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী তিন তোহরে তালাক ঘোষণা না করার কারণে তা মুগাল্লাযা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না?

উত্তরঃ চার ইমাম এবং জমহূর ফিকাহবিদদের মতে একই সময় তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই গণ্য হবে। আমার কাছে এটাই সর্বাধিক সহীহ মত। এজন্য আমি এই নীতির মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের কোন পরামর্শ দিতে পারলাম না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ স্বীকৃত যে, এভাবে তালাক দেয়া চরম অন্যায়। কেননা এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শেখানো তালাকের সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী। এজন্য এই গলৎ পন্থার অবশ্যই প্রতিরোধ হওয়া দরকার। আমার মতে এর প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলো ফলপ্রসূ হতে পারেঃ

এক. মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে তালাকের সঠিক পন্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এর কৌশল এবং উপকারিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে বিদই তালাকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অনন্তর এটাও বলে দিতে হবে যে, এই ভুল পদ্ধতিতে তালাক দানকারী গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

দুই. তালাকনামা লেখকগণকে তিন তালাকের সনদপত্র লেখার নির্দেশ দিতে হবে। এই নির্দেশ লংঘনকারীর জন্য জরিমানা করতে হবে।

তিন. একই সময় তিন তালাক প্রদানকারীর জন্যও জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এর সমর্থনে আমাদের কাছে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে। তাঁর নীতি ছিল–একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়ার মোকদ্দমা যখন তাঁর সামনে পেশ করা হত–তিনি তা কার্যকর করার সাথে সাথে তালাক দানকারীকেও শাস্তি দিতেন।

প্রশ্নঃ তালাকসমূহ নিবন্ধিকৃত করা কি বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিৎ?

উত্তরঃ তালাকের রেজিষ্ট্রির ব্যবস্থা অবশ্যই হওয়া উচিৎ। তবে তা কেবল ঐচ্ছিক রাখা উচিৎ। এটা বাধ্যতামূলক করলে বিভিন্ন রকম অনিষ্টতা ও অসুবিধা দেখা দিবে। তালাক রেজিষ্ট্রি করা হোক বা না হোক তালাকের পক্ষে দুজন সাক্ষী পাওয়া গেলে অথবা তালাকদাতার স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিচারালয় তা মেনে নিবে।

প্রশ্নঃ যদি তালাক রেজিষ্ট্রি করা না হয় তাহলে আপনার মতে এর কি শাস্তি হওয়া উচিৎ।

উত্তরঃ রেজিষ্ট্রি না করার জন্য কোন শাস্তির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ বিভিন্ন এলাকার জন্য সালিসী বোর্ড গঠন করা উচিৎ নয় কি যাতে স্বামী–স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে এবং স্বামী–স্ত্রী যতক্ষণ তালাকের ব্যাপারটি এই বোর্ডের সামনে পেশ না রবে ততক্ষণ তা অনুমোদন করা হবে না?

উত্তরঃ এ ধরনের সালিসী পরিষদ তো অবশ্যই গঠন করা উচিৎ এবং বিচার বিভাগেরও কর্তব্য হচ্ছে দাম্পত্য বিবাদের ফয়সালা করার পূর্বে কুরআনের নির্ধারিত "মীমাংসার পদ্ধতি" অনুসরণ করা। কিন্তু যে তালাকের ব্যাপারটি সালিসী বোর্ড অথবা পারিবারিক পর্যায়ে মীমাংসাকারীদের সামনে আসেনি তাকে মূলতই তালাক বলে মেনে নেয়া হবে না–এটা সঠিক কথা নয়। যে তালাকের মধ্যে তালাকের যাবতীয় শর্ত ও রুকনসমূহ পাওয়া যাবে শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ প্রতিটি তালাকই সংঘটিত হবে। তালাক সংঘটিত হওয়ার শর্তের মধ্যে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অন্তর্ভূক্ত নয় যে, ব্যক্তিকে তা কোন সালিসী বোর্ড অথবা কোন হাকীমের আদালতে সোপর্দ করতে হবে। শরীআতের দৃষ্টিতে এখন যে তালাক সংঘটিত হয়েছে আদালত তা যদি সমর্থন না করে তাহলে লোকেরা ভীষণ জটিলতায় পড়ে যাবে এবং শরীআতের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্নঃ "দাম্পত্য ও পারিবারিক আদালতের" এরূপ এখতিয়ার থাকা উচিৎ কি যে, তালাকপ্রাপ্তার দাবী অনুযায়ী তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অথবা দ্বিতীয়বার বিয়ে বসা পর্যন্ত সে তালাকদাতা স্বামীর কাছ থেকে তার খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিবে?

উত্তরঃ এটা শরীআতের পরিপন্থী এবং ইনসাফেরও পরিপন্থী। একজন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তালাকদাতা স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ লাভের যে

অধিকার রাখে তার নিয়ম-পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সে কতদিন পর্যন্ত খোরপোশ পাওয়ার অধিকার রাখে তাও চূড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে। আজীবন অথবা দ্বিতীয়বার বিয়ে বসা পর্যন্ত খোরপোশ পাওয়ার অধিকার দেয়াটা শরীআতের মূলনীতিরও পরিপন্থী হবে। এটা বুদ্ধি-বিবেকও মেনে নিতে রাজী নয় যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং সে তার দ্বারা এখন আর কোনরূপ ফায়দা উঠানোর অধিকারীও নয়-তাকে আজীবন অথবা দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ঐ তালাক প্রাপ্তার খোরপোশ দিতে বাধ্য করা হবে। এটা স্বয়ং স্ত্রীলোকদের নৈতিক পদমর্যাদাও খাটো করে দেয়। আমি বুঝতে পারছি না যে, কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভদ্র এবং শরীফ মহিলা এটা কি কখনো চিন্তা করতে পারে যে, সে অপর ব্যক্তির কাছ থেকে—যার সে স্ত্রী হয়ে থাকেনি-নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে নিবে? নিজেদের আইন-বিধানে এ ধরনের নিয়ম-কানুন অন্তর্ভুক্ত করে আমরা প্রকারান্তরে সমাজের মহিলাদের মান-সম্মানের উপরই নিকৃষ্টভাবে আঘাত করব। যেসব নারী নিজেদের নৈতিক মান ও মর্যাদার তুলনায় ধন-সম্পদকে অধিক গুরুত্ব দেয় কেবল এই ধরনের মুষ্টিমেয় স্ত্রীলোক এই আইনের সুবিধা ভোগ করবে।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের দাবী উত্থাপন

প্রশ্নঃ আপনি কি ১৯৩৯ সালের Desolution of Marriage Act (বিবাহ বাতিলকরণ আইন)-এর ধারাগুলোকে পূর্ণাংগ ও সন্তোষজনক মনে করেন? অথবা আপনার মতে কি এর সংশোধন ও সংযোজন হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ উল্লেখিত এ্যাক্ট আমার সামনে নাই। এজন্য আমি এ সম্পর্কে কোন মত ব্যক্ত করতে পারছি না। যদি এই প্রশ্নমালার সাথে উল্লেখিত এ্যাক্টের নকল যোগ করে দেয়া হত তাহলে ভালোই হত।

প্রশ্নঃ আপনি কি এটা উপযুক্ত মনে করেন যে, আইন প্রণয়ন পরিষদ 'খোলার' ব্যাপারে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করুক?

উত্তরঃ শুধু 'খোলার' ব্যাপারেই নয়, বরং দাম্পত্য জীবনের সার্বিক ব্যাপারে ইসলামী আইনের একটি সংকলন তৈরী করা উচিৎ। এ উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ আলেম ও অভিজ্ঞ আইনবিদদের একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

স্ত্রীর সংখ্যা

প্রশ্নঃ কুরআনে করীমে স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে একটি মাত্র আয়াত (৪:৪) রয়েছে যা ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। যেখানে

ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন নেই, আপনার মতে সে ক্ষেত্রে কি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতের হুকুম ইয়াতীমের অধিকার সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত–এরূপ ধারণা করা ভুল। যেখানে ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন নেই সে ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে–এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ভুল। কুরআন মজীদে এমন অনেক উদাহরণ বর্তমান রয়েছে যার মধ্যে একটি বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে এমন অবস্থারও উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে এই নির্দেশ বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, অথবা এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, অথবা তার সাথে এই নির্দেশ সম্পৃক্ত রয়েছে। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না এবং কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এটা আশাও করা যায় না যে, তিনি তা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেবেন যে, এই হুকুম সেই অবস্থার সাথে "সম্পৃক্ত" যার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে এবং অন্য সব অবস্থায় এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা অথবা এই অনুমতি থেকে ফায়দা উঠানো নিষেধ। সূরা বাকারার ২৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যদি তোমরা সফরে থাক এবং (ঋণপত্র লিখে দেয়ার জন্য) লেখক না পাও তাহলে কোন জিনিস বন্ধক হিসাবে হস্তগত কর।" আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি কি এ কথার এই তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারে যে, ইসলামী শরীআত কেবল সফররত অবস্থার সাথে এবং লেখক সহজলভ্য না হওয়ার অবস্থার সাথে বন্ধক রাখার ব্যাপারটি সম্পৃক্ত? অনুরূপভাবে সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে যেসব স্ত্রীলোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে তাতে সৎকন্যার (স্ত্রীর অপর পক্ষের মেয়ে) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে– তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের কোলে লালিত–পালিত হয়েছে এবং তাদের মায়েদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।" এই আয়াত থেকে কি এই তাৎপর্য বের করা যায় যে, পালিতা কন্যা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি কেবল "সৎপিতার ঘরে লালিত–পালিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত"?

এসব উদাহরণ থেকে একথা সহজেই বুঝা যায় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি যে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তার সাথে ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই অনুমতিকে শুধুমাত্র উল্লেখিত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা নয় যখন ইয়াতীমের কোন ব্যাপার উদ্ভূত হয়। বরং যে অবস্থা ও পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তার বিশ্লেষণ করলে ফল সম্পূর্ণ উল্টা দাঁড়ায়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবে

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা চালু ছিল। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক স্ত্রী ছিল। অসংখ্য সাহাবার ঘরে একাধিক স্ত্রী বর্তমান ছিল। কুরআনে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোন নির্দেশ না আসাটাই স্বয়ং এই প্রথার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট ছিল।

এই আয়াত মূলত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়ার জন্য নাযিল হয়নি, বরং উহুদের যুদ্ধের পর এই আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে এই পথনির্দেশ দেয়া যে, উহুদের যুদ্ধের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের শাহাদাত বরণ করার ফলে ইয়াতীমদের লালন-পালনের যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পূর্ব থেকে তোমাদের মধ্যে প্রচলিত "একাধিক স্ত্রী গ্রহণের" পন্থায় তোমরা এর সমাধান করতে পার। এভাবে উল্লেখিত আয়াত কোন নতুন অনুমতি দেয়নি বরং পূর্ব থেকে কার্যত যে অনুমতি চলে আসছিল তার দ্বারা একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য গ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে নতুন কথা যা ছিল তা শুধু এটুকুই যে, এক সংগে কতজন স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে পূর্বে তার কোন নির্দিষ্ট সীমাসংখ্যা ছিল না। এখানে তা সর্বাধিক চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই পটভূমির সাথে যে ব্যক্তি পরিচিত সে কখনো এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে পারে না যে, এ আয়াতে প্রথম বারের মত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং সেই অনুমতিকে কেবল এই অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছিল যখন ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির আদালত থেকে অনুমতি লাভ করা আপনার মতে কি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শরীআত প্রথম বিয়ে, দ্বিতীয় বিয়ে, তৃতীয় বিয়ে এবং চতুর্থ বিয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। এ সবের প্রকাশ্য অনুমতি রয়েছে। যদি প্রথম বিয়ে বিচারালয়ের অনুমতি লাভের শর্তাধীন না হতে পারে তাহলে দ্বিতীয় কেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিয়েও এই শর্তের অধীনে আসতে পারে না। এ ধরনের প্রস্তাব কেবল তখনি বিবেচনা করা যেতে পারে-যখন সর্বপ্রথম একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তা বন্ধ করা না গেলেও অন্তত এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়া উচিৎ। এটা রোমান আইন দর্শনের দৃষ্টিভংগী হতে পারে, কিন্তু ইসলামী আইন দর্শনের দৃষ্টিভংগী তা নয়। অতএব

যেসব প্রস্তাবের মৌলিক দৃষ্টিভংগীই ইসলামী দৃষ্টিভংগীর সম্পূর্ণ বিপরীত তাকে ইসলামী আইনের আলোচনার আওতায় নিয়ে আসাটাই সম্পূর্ণ ভুল।

প্রশ্নঃ দরখাস্তকারী তার নিজের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী তার উভয় স্ত্রী ও সন্তানদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে বলে আদালত যতক্ষণ নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ সে তাকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেবে না– আপনার মতে এরূপ আইন প্রণয়ন করা উচিৎ কি?

উত্তরঃ উপরের জবাবের পর এ প্রশ্ন আপনা আপনিই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যায়। তবুও এই প্রস্তাবের কতিপয় দুর্বলতার দিকে ইংগিত করা যুক্তিযুক্ত হবে। এখানে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ–পোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে বলে মনে হবে কেবল এই অবস্থায় আদালত তাকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারছে না, সে কেমন করে বিয়ের অবাধ অনুমতি পাচ্ছে? প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম বিয়ের ব্যাপারে আদালতের অনুমতি লাভের শর্ত জুড়ে দেয়া হচ্ছে না কেন? এবং এ শর্তই বা কেন জুড়ে দেয়া হচ্ছে না যে, বিয়ে করতে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে না পারবে– ততক্ষণ কাউকেও বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হবে না? এও কম আশ্চর্যজনক নয় যে, ভালোবাসা, অনুরাগ এবং পারিবারিক জীবনের স্বাদ ও প্রশান্তির প্রতিটি প্রশ্নকে উপেক্ষা করে শুধু এই একটিমাত্র প্রশ্নকে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের আর্থিক বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে কি না? এর অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় বিয়ে গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য তো নিষিদ্ধ হবেই, কিন্তু উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্য এই অধিকার পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে এর চেয়েও অধিক চিন্তাকর্ষক দুর্বলতা এই যে, আদালত কেবল এক ব্যক্তির আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখেই দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেবে। অথচ শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতাই কার্যত পরিবারের দায়িত্বভার বহনের জন্য যথেষ্ট গ্যারান্টি নয়। আমাদের সামনে এমন অনেক লোকের দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে যাদের প্রচুর আয়ের উৎস আছে–কিন্তু একটি মাত্র স্ত্রী—তার প্রতি কোন নজর তার নেই। আদালতের অনুমতি লাভের শর্ত কি শেষ পর্যন্ত এসব দোষ–ত্রুটির দরজা বন্ধ করতে পারে?

এই ধরনের অপরিপক্ক ও অসার প্রস্তাবের পরিবর্তে কি এটা উত্তম নয় যে, আমরা শরীআতের নীতিমালাকেই যথেষ্ট মনে করি যে, কোন ব্যক্তি একাধিক

বিয়ে করার ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তার বিরুদ্ধে যে স্ত্রীর অভিযোগ রয়েছে তার জন্য আদালতের দরজা খোলা থাকবে?

প্রশ্নঃ (১) আদালত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণকারীর অন্তত অর্ধেকটা বেতন প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানদের দেয়ার ব্যবস্থা করবে–এরূপ আইন হওয়া উচিৎ কি?

(২) যেসব লোক চাকুরী করে না বরং তাদের আয়ের অন্য উৎস রয়েছে–আদালত তাদের কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করবে যে, সে তার আয়ের অন্তত অর্ধেকটা প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানদের দিতে থাকবে?

উত্তরঃ এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এক ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে কেবল নিজের সন্তানদের জিম্মাদার নয়, বরং পিতা-মাতা, ছোট ভাই-বোন এবং অন্যান্য হকদারও তার সাথে রয়েছে। তাকে এদেরও সেবা করতে হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়েকারীর অন্তত অর্ধেক আয় প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানদের দেয়ার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্পূর্ণ বেইনসাফী। তাছাড়া প্রথম স্ত্রী যদি সন্তানহীন হয় এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান থেকে থাকে–তাহলে এটাকে কোন্ ধরনের ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বলা যায় যে, যে স্ত্রীর কোন সন্তান নেই তার জন্য স্বামীর আয়ের অর্ধেকটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে আর অপর স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অবশিষ্ট আয় দ্বারা সংসার চালাবে? শরীআত এ ধরনের অন্ধ নীতিমালা তৈরী করার পরিবর্তে–স্বামী নিজ স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ কায়েম রাখবে–এই নীতি নির্ধারণ করে দেয়। যদি কোন স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদালতে অবিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে বিচারক সেই পরিবারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইনসাফের উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণ করে দেবে।

মোহর

প্রশ্নঃ বিবাহের কাবিননামায় যে মোহর নির্ধারণ করা হয় তা পরিমাণে যত হোক না কেন–তা পরিশোধ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক–আপনার মতে কি এরূপ আইন হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শরীআতই তো মোহর আদায় করা ফরজ করে দিয়েছে। এজন্য পৃথক আইন প্রণয়নের কি প্রয়োজন রয়েছে? অবশ্য যে কোন পরিমাণ মোহর যে কোন অবস্থায় আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যদি এরূপ আইন তৈরী করা হয় তাহলে এটা হবে কুরআনেরও পরিপন্থী এবং বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফেরও পরিপন্থী। কুরআন শরীফ মোহর মাফ করে দেয়ারও অধিকার দেয় এবং পরিমাণে কম মোহর গ্রহণ করারও অধিকার দেয়। অনন্তর স্বামীর আর্থিক অবস্থার তুলনায় মোহরের পরিমাণ যদি অত্যধিক

হয়, অথবা পরবর্তীকালে যদি স্বামীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং একটা মোটা অংকের মোহর পরিশোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথবা কাবিননামায় যদি এমন পরিমাণ মোহর লিপিবদ্ধ থাকে যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না–তাহলে এসব ক্ষেত্রে আদালত অথবা পঞ্চায়েত কর্তৃক স্বামী–স্ত্রীকে একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আদান–প্রদানে সমত করানোর সুযোগও থাকা উচিৎ।

প্রশ্নঃ আপনার মতে মোহরের দাবী উত্থাপন করার জন্য আইনত একটি সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিৎ নয় কি?

উত্তরঃ মোহর পরিশোধের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা বা না করা উভয় পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে আইনের কোন হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্নঃ বিবাহের চুক্তিনামায় যদি মোহর আদায়ের পন্থা সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকে তাহলে মোহরের অর্ধেক হবে মু'আজ্জাল (চাওয়া মাত্র পরিশোধযোগ্য এবং অর্ধেক হবে অ–মুয়াজ্জাল (বিবাহ বাতিলের সময়, অথবা স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাক হওয়ার পর পরিশোধযোগ্য) এ সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তরঃ এই ক্ষেত্রে মোহরের পুরাটা দাবী করার সাথে সাথে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ। অবশ্য আদালত যদি দেখে–বাস্তবিকপক্ষে মোহরের পরিমাণটা স্বামীর আর্থিক সংগতির তুলনায় অনেক বেশী তাহলে ইনসাফের দিকে লক্ষ্য রেখে আদালত মোহর পরিশোধের কিস্তি নির্ধারণপূর্বক একটি উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করে আদালতের ক্ষমতা সীমিত করে দেয়া ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ বর্তমান আইনে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা পর্যন্ত সন্তানের তত্ত্বাবধানের অধিকার মাকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুত্র সন্তান হলে সাত বছর এবং কন্যা সন্তান হলে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে। কুরআন ও হাদীসে তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্দিষ্ট নেই। বরং এটা একদল ফিকাহবিদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত। আপনার মতে এর মধ্যে কি কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা যায়?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে সঠিক কথা এই যে, সন্তানদের স্বার্থকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে হবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র মোকদ্দমার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পিতা–মাতার মধ্যে যার অভিভাবকত্ব

অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ মনে হবে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন একজনের সপক্ষে আইন তৈরী করে দেয়া ঠিক হবে না। অবশ্য এটা আইনত বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিৎ যে, যে পক্ষের তত্ত্বাবধানে শিশুকে দিয়ে দেয়া হবে তারা অপর পক্ষের সাথে তার মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। মশহুর ফিকাহবিদদের মধ্যে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাইয়েমের অভিমতও তাই যা আমি উপরে বর্ণনা করে এসেছি।

স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ

প্রশ্নঃ যদি কোন স্বামী যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে তাহলে পারিবারিক আদালতে স্ত্রীর মোকদ্দমা করার অধিকার থাকা উচিৎ। আপনি কি এই প্রস্তাবের সমর্থক?

উত্তরঃ হাঁ।

প্রশ্নঃ বর্তমান ফৌজদারী আইনের ৪৮৮ ধারা মোতাবেক স্ত্রী ফৌজদারী কোর্টে মাসিক ভরণপোষণের দাবী উত্থাপন করতে পারে। কিন্তু কোর্ট মাসিক সর্বাধিক ১০০ টাকা পর্যন্ত খোরপোশ দিতে স্বামীকে বাধ্য করতে পারে। আপনি কি এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার পক্ষে?

উত্তরঃ হাঁ। বিচারালয়ের এ অধিকার থাকা উচিৎ যে, সে স্বামী স্ত্রীর পদমর্যাদা অনুযায়ী খোরপোষ দেয়ানোর ব্যবস্থা করবে। আইনের মাধ্যমে একটি বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ কোন স্ত্রীলোক পূর্ববর্তী তিন বছরের খোরপোশ দাবী করতে পারবে। আপনি কি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন?

উত্তরঃ তিন বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা ঠিক নয়। স্বামী যখন থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ বন্ধ করে দিয়েছে সেই সময় থেকে ভরণপোষণ দেয়ানো উচিৎ।

প্রশ্নঃ স্ত্রী যদি বিবাহের চুক্তিনামায় ভরণপোষণের সময়সীমা সম্পর্কে বিশেষ শর্ত লিখিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে শুধু ইদ্দত পর্যন্তই নয়, বরং চুক্তিনামায় উল্লেখিত সময় পর্যন্তই সে খোরপোশ পেতে পারে। এটাকে আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করেন?

উত্তরঃ বিবাহের সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে যে, পারিবারিক এবং বংশীয় চাপের মুখে অথবা লৌকিকতার খাতিরে অযৌক্তিক শর্তসমূহ মেনে নেয়া হয়। এধরনের শর্তসমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। যে সীমা পর্যন্ত

খোরপোশ পাওয়ার আইনগত অধিকার স্ত্রীর রয়েছে, যদি তার অধিক কোন শর্ত বিবাহের চুক্তিনামায় লিখিয়ে নেয়া হয় তাহলে আইনত তা কার্যকর হওয়া উচিৎনয়।

সন্তানের বিষয়—সম্পত্তির অভিভাবকত্ব

প্রশ্নঃ পিতার অবর্তমানে আদালত মাকে সন্তানের বিষয়-সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করবে। তবে শর্ত হচ্ছে আদালতের দৃষ্টিতে তার অবস্থান সন্তানের কল্যাণ ও তার বিষয়-সম্পত্তির হেফাজতের পরিপন্থী না হয়। আপনি কি এই প্রস্তাবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন?

উত্তরঃ সন্তানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যখন মাকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন এটা হতে পারে। যেমন পরিবারে এমন কোন পুরুষ লোক নাই যে মুতাওয়াল্লী হতে পারে। অথবা আছে কিন্তু তাকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করলে সন্তানের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।

প্রশ্নঃ আদালতের অনুমতি ছাড়া নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বন্ধক দেয়ার অধিকার মুতাওয়াল্লীর থাকবে না। আপনি কি এ ধরনের আইন প্রণয়ন করার পক্ষপাতী?

উত্তরঃ এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

উত্তরাধিকার ও ওসিয়াত

প্রশ্নঃ (১) যদি পাকিস্তানের (তৎকালীন) কোন অংশে এখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার ও ওসিয়াতের ব্যাপারে শরঈ আইনের উপর আমল করা না হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে এসব এলাকায় শরঈ আইন বলবৎ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত। আপনি কি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন?

(২) বর্তমান আইন ব্যবস্থার জটিলতার দিকে লক্ষ্য রেখে নারীদের দুরবস্থা দূর করার জন্য আপনি কি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন যে, কোন স্ত্রীলোক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমার বাদী হলে তার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সিভিল কোর্ট এই মামলা পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করে দেবে?

উত্তরঃ দু'টি প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্নঃ কুরআন শরীফে অথবা হাদীস শরীফে এমন কোন পরিষ্কার নির্দেশ বর্তমান আছে কি যার মাধ্যমে এতীম নাতিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে?

উত্তরঃ কুরআন ও হাদীসে মীরাস বন্টনের যে মূলনীতি দেয়া হয়েছে তা থেকেই এই মাসয়ালা স্বয়ং বের হয়ে আসে। আর তা সঠিক হওয়ার প্রমাণ এই যে, মূলনীতির পরিবর্তন করে ইয়াতীম নাতিকে ওয়ারিস বানানোর জন্য যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক তাতে মীরাস বন্টনের যাবতীয় বিধি-বিধানই ওলোটপালট হয়ে যায় যা কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই ইসলামী আইনবিদগণ প্রথম যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই মাসয়ালার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করে আসছেন। এখানে এ বিষয়ের পুরা ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তাই এ জন্য (পাঠকগণ) এই পুস্তকের "ইয়াতীম নাতির মীরাস প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটি পাঠ করুন।

প্রশ্নঃ এক মুসলমান তার কোন সম্পত্তি অন্য কারো নামে এই শর্তে হস্তান্তর করল যে, তার (গ্রাহক) মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির মালিকানা পুনরায় হস্তান্তরকারী অথবা তার ওয়ারিসদের কাছে ফিরে আসবে। এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা কি জায়েয হবে?

উত্তরঃ ইসলামী আইনে এ ধরনের হস্তান্তরের জন্য "উমরা" পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এ সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে যে সম্পত্তি এভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে তার মালিকানা পুনরায় হস্তান্তরকারী অথবা তার উত্তরাধিকারীদের নিকট ফিরে আসবে না। হস্তান্তরপত্রে যদি পরিষ্কারভাবে লেখাও থাকে যে, গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা দাতা বা তার ওয়ারিসদের কাছে ফিরে আসবে-তবুও তার মালিকানা হস্তান্তরকারী বা তার ওয়ারিসগণের হাতে ফিরে আসবে না। অপরদিকে ইমাম মালেক বলেন, যে সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় ভোগ করার জন্য দেয়া হয়েছে-তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা সরাসরি উমরাকারী বা তার ওয়ারিসদের কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু দাতা যদি পরিষ্কার বলে দেয় যে, এই উমরা গ্রহীতা ও তার সন্তানদের দেয়া হয়েছে তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

এ ব্যাপারে বেশীরভাগ হাদীস প্রথম মতকে সমর্থন করে এবং গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এই মতই সঠিক। কোন সম্পত্তির সাথে কোন ব্যক্তির স্বার্থ কেবল তার জীবদ্দশা পর্যন্তই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং তার সন্তানরাও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মত সম্পত্তির প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে কেবল জীবদ্দশার জন্য দেয়া দান-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণে পরিণত হয় এবং মূল মালিক বা তার সন্তানগণ সম্পত্তি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত

অবস্থায় পায় তখন তারাও অভিযোগ উত্থাপন করে। এজন্য শরীআতের লক্ষ্য হচ্ছে যদি কিছু দান করা হয় তাহলে তা স্থায়ীভাবেই দান করা উচিৎ। অন্যথায় জীবদ্দশার জন্য দান করাটা ভাল নয়। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আমরা এই লক্ষ্যের ব্যাখ্যা পেতে পারিঃ

امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها، فمن اعمر عمرى
فهى للذى اعمر حيا وميتا ولعقبه (احمد-مسلم)

"নিজের সম্পদ নিজের কাছেই রাখ এবং তা বিনষ্ট কর না। যে ব্যক্তি অন্য লোককে তার জীবদ্দশার জন্য (কোন কিছু) দান করল তা গ্রহিতার জন্যই হয়ে যাবে–তার জীবদ্দশায়ও এবং তার মৃত্যুর পরও। তার মৃত্যুর পর এটা তার উত্তরসূরীদের কাছে থাকবে"–(মুসলিম, আহমাদ)।

প্রশ্নঃ ১৯১৩ সালের "ওয়াকফ আলাল আওলাদ" আইনে সংশোধন আনয়নের জন্য আপনার মতে এরূপ পরিবর্তন কি জরুরী যে, ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি অথবা অন্য কোন স্বার্থের খাতিরে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে তা বিক্রয়, অথবা পরিবর্তন, অথবা কোন লাভজনক পন্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে?

উত্তরঃ এই আইনটিই যদি সম্পূর্ণরূপে তুলে দেয়া হয় তাহলে অনেক ভাল হয় বিভিন্ন দিক থেকে এটা ক্ষতিকর ও জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ইসলামী শরীআতেও এর জন্য কোন মজবুত ভিত্তি নেই।

আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বাতিলকরণ

প্রশ্নঃ বিবাহ বাতিল আইনের ২ নম্বর ধারায় বিবাহ বাতিলের যেসব কারণ উল্লেখ আছে–আপনার মতে কি তার মধ্যে কোন সংযোজন বা সংকোচনের প্রয়োজন আছে?

উত্তরঃ এই আইন আমার সামনে নেই। এজন্য আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। প্রশ্নমালার সাথে আইনের সংশ্লিষ্ট দফাগুলোও সংযুক্ত করে দিলে ভাল হত।

প্রশ্নঃ স্ত্রী যদি বিবাহ বাতিলের দাবী উত্থাপন করে এবং আদালতের রায়ে যদি স্বামী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তালাক লাভ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর দেয়া মোহর ও অন্যান্য জিনিস ফেরত দেয়ানো হবে না। এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা উচিৎ কি?

উত্তরঃ খোলার শরঈ নীতিমালায় এরূপ সুযোগ বর্তমান আছে। এজন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। কিন্তু শর্ত হচ্ছে স্বামীর অপরাধের আধুনিক ধারণা যেন পাশ্চাত্য থেকে আমদানি না করা হয়, বরং ইসলামের অধীনে প্রাপ্ত ধারণার উপরই যেন তুষ্ট থাকা হয়।

প্রশ্নঃ স্বামী-স্ত্রীর মেজাজের সাজঞ্জস্যহীনতার কারণে যদি দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে পড়ে তাহলে এটা কি বিবাহ বাতিল করার বৈধ কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে?

উত্তরঃ মেজাজের সামঞ্জস্যহীনতার ক্ষেত্রে আদালতকে সর্বপ্রথম মীমাংসা করার কুরআনিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বংশের দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক এই বিরোধ দূর করার চেষ্টা করার সুযোগ পাবে। তারা যদি অকৃতকার্য হয়ে যায় তাহলে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর মতবিরোধের কারণ অনুসন্ধান করা আদালতের কাজ নয়, বরং তাকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি বনিবনায় কোন সুযোগই অবশিষ্ট নেই? এরপর আদালত দু'টি পন্থার যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে। হয় স্ত্রীর পক্ষে খোলার রায় দেবে যদি সে তা দাবী করে। অথবা স্বামীকে বাধ্য করবে যে, তার সাথে সংযুক্ত থাকার পরিবর্তে বরং তাকে তালাক দেবে।

প্রশ্নঃ 'বিবাহ বাতিলকরণ' আইনের ৩ নম্বর ক্লোজের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে-স্বামী যদি সাত বছর মেয়াদী কয়েদী হয় তাহলে বিবাহ বাতিল হতে পারে। এই সময়সীমা কমিয়ে চার বছরে নিয়ে আসাটা কি আপনার মতে ভাল হবে না?

উত্তরঃ দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীর ক্ষেত্রে "বিবাহ বাতিলকরণ আইন" মোটেই সঠিক নয়। অনন্তর স্ত্রীকে এ অধিকার দিলেও মূল সমস্যারও সমাধান হবে না। যদি দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদী কারাগারে চলে যায় তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বাতিলের দাবী নিয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার মত মেজাজ প্রকৃতি আমাদের সমাজের মহিলাদের নেই। বিশেষ করে সন্তানের অধিকারী স্ত্রীলোক তো খুব কষ্টেই এরূপ চিন্তা করতে পারে। এজন্য বেশীর ভাগ মহিলাই এরূপ আইন থাকা সত্ত্বেও এর সুযোগ গ্রহণ করবে না এবং তাদের সমস্যা যেমনটি ছিল তেমনই থেকে যাবে। আমার মতে এই সমস্যার সঠিক সমাধান এই যে, কারা আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি সংস্কার আনয়ন করতে হবেঃ

(ক) চার বছর অথবা তার কম সময়ের জন্য আটক কয়েদীকে প্রতি বছর অন্তত দু'বার কমপক্ষে পনর দিন করে পেরোলের অধীনে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

(খ) চার বছরের অধিক কালের জন্য আটক কয়দীদের জেলে রাখার পরিবর্তে বিশেষভাবে তাদের জন্য তৈরী "জেল পল্লীতে" রাখতে হবে। সেখানে তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের সাথে একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কয়েদীদের দ্বারা যেসব কাজ করানো হবে বাজারে প্রচলিত হার তার পারিশ্রমিক অনুযায়ী তাদের নিজেদের একাউন্টে জমা করতে হবে। এই মজুরী বা তার একটা যুক্তিযুক্ত অংশ কয়েদীদের পরিবারবর্গের ভরণ- পোষণের জন্য তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

পারিবারিক আদালত

প্রস্তাবঃ (১) দেশের প্রতিটি বিভাগের অধীনে যেসব পারিবারিক আদালত থাকবে তাতে জেলা জজ এবং সেসন জজের সম মর্যাদা সম্পন্ন বিচারকদের নিয়োগ করা হবে।

(২) যেসব মোকদ্দমা পারিবারিক ও দাম্পত্য আইনের আওতায় পড়ে তা কেবল এই বিশেষ আদালতে দায়ের করতে হবে।

(৩) এসব আদালতের নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি বর্তমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের রীতিনীতি থেকে স্বতন্ত্র হবে। পারিবারিক আদালতকে প্রতিটি মামলা তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। এর সপক্ষে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) এসব আদালতে কোর্ট ফী এবং আনুসঙ্গিক অন্য কোন খরচপাতি আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে না।

(৫) এসব আদালতে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ নিজেদের প্রতিনিধি অথবা আপনজনের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করতে পারবে এবং সনদপ্রাপ্ত উকীল নিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(৬) অন্ততপক্ষে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক বিচারকের সাথে উপদেষ্টা হিসাবে থাকবে।

(৭) এই আদালত প্রয়োজন বোধে যে কোন স্থানে সাময়িক এজলাস বসাতেপারবে।

(৮) বাদী অথবা বিবাদীকে একবারের অধিক আপিল করার সুযোগ দেয়া হবেনা।

(৯) আপিল সরাসরি হাইকোর্টে হওয়া উচিৎ এবং হাইকোর্টকেও তিনি মাসের মধ্যে রায় প্রদান করতে হবে। আপনি কি এ প্রস্তাবগুলো সমর্থন করেন?

উত্তরঃ ১ থেকে ৯ নম্বর পর্যন্ত সবগুলো প্রস্তাবই আমি সমর্থন করি। এগুলো সম্পূর্ণ ঠিক।

প্রশ্নঃ এ ধরনের আদালতের রায়ের ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থ আদায় এবং অন্যান্য নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আপনি কি উপযুক্ত পরামর্শ পেশ করেন?

উত্তরঃ সাধারণ বিচারালয়গুলোর সিদ্ধান্ত এবং সরকারী অর্থ আদায়ের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়, এখানেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ এসব মামলার খরচপাতি সংকুলান করার ব্যাপারে আপনার কি অভিমত রয়েছে?

উত্তরঃ যে পক্ষ বাড়াবাড়ি করেছে বলে সাব্যস্ত হবে অথবা যে পক্ষ অযথা মামলা মোকদ্দমা দায়ের করে আদালত ও অপর পক্ষের সময় ও অর্থ নষ্ট করেছে সেই পক্ষের উপর একটি যুক্তিযুক্ত পরিমাণে অর্থ জরিমানা করতে হবে। এর একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষকে দেয়া হবে এবং অপর অংশ আদালত তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য গ্রহণ করবে। অনন্তর ন্যায়সংগত পরিমাণের অধিক মোহরের দাবী ষ্টাম্প ডিউটি ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। মোহর ন্যায়সংগত পরিমাণ থেকে যত অধিক হবে সেই হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটির বোঝাও ভারী হবে। এই ব্যবস্থা সমাজের সংশোধনের কাজেও সহায়ক হবে। আদালতের পুরা খরচ আদায় না হলেও উল্লেখ্যযোগ্য অংশ আদায় হয়ে যাবে। খরচের বাকিটা সরকার বহন করবে।

–(রবিউস সানী ১৩৭৫ হিজরী, ডিসেম্বর ১৯৫৫ খৃ.)

আহ্‌লে কিতাবদের যবেহকৃত প্রাণীর হালাল-হারাম প্রসঙ্গ

আমাদের দেশ থেকে যেসব লোক লেখাপড়া অথবা ব্যবসা বাণিজ্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে থাকে তাদেরকে সাধারণত একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেখানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল খাবার খুব কষ্টেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। কতিপয় লোকের তো হালাল-হারামের অনুভূতিই নেই। এজন্য তারা নির্দ্বিধায় সেখানে যে কোন ধরনের খাবার খেয়ে নেয়। আবার কতিপয় লোক পানাহারের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে সেখানে যা কিছু পাওয়া যায় তাই খেয়ে নেয়। কিন্তু তারা অন্তরে অনুভব করে যে, হারাম খাদ্য খাচ্ছে। অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক রয়েছে যারা হালালের আনুগত্য করতে চায় এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের পক্ষ থেকে প্রায়ই প্রশ্ন আসছে যে, এসব দেশে খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারামের সীমা কি এবং তারা কি কি জিনিস খাবে আর কোন্ কোন্ খাবার পরিত্যাগ করবে? ইতিপূর্বে আমার কাছে এ প্রসংগে সময় সময় যেসব প্রশ্ন এসেছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকার মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু আজ সমস্যা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যেসব লোক পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যায়, তারা আমাদের এখানকার মুসলিম যুবকদের সেখানে খোদার নাম নিয়ে মেশিনে যবেহ হয়ে আসা প্রাণীর গোশত নির্দ্বিধায় খেতে দেখে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং যেসব আলেম এই গোশত হালাল বলে ঘোষণা করছেন, তারা নিজেদের দলীল হিসাবে তাদের এই ফতোয়ার উল্লেখ করে। সম্প্রতি আমার নামে আসা এক পাকিস্তানী যুবকের লেখা নিম্নের চিঠি তার তাজা প্রমাণ। এই চিঠি এবং এর সাথে পত্র লেখকের পাঠানো ইরাকের আলেমদের ফতোয়া দেখার পর এই মাসআলাটির পূর্ণাংগ এলমী পর্যালোচনা ছেপে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে অনুভূত হয়,যাতে আমাদের এখানকার লোকেরা এই বিতর্কে প্রভাবিত হয়ে কোন ভ্রান্ত পন্থা গ্রহণ না করে বসে। সম্ভব হলে বাইরের মুসলিম দেশসমূহের লোকদেরও সংশোধনের খেয়াল আসতে পারে।

পাকিস্তানী যুবকের চিঠি

বর্তমানে লণ্ডনে অধ্যয়নরত এই যুবক লিখছেঃ "গোশতের প্রসংগটি নিয়ে আমার এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। এর ওপর অনেক আলোচনা হয়েছে। রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থে আপনি যেসব দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন তা বিভিন্ন পন্থায় বার বার তাদের সামনে তুলে ধরেছি। কিন্তু তাদের বুঝে আসে না। এমন দুইজন ইসলামপ্রিয় বন্ধু ইরাক থেকে দু'টি ফতোয়া সংগ্রহ করেছেন। তা আপনার কাছে পৌছানোর জন্য তারা আমাকে পীড়াপীড়ি করছে এবং আপনি তাতে উল্লেখিত দলীলগুলোর জবাব পৃথক পৃথক দেবেন। অতএব ফতোয়া দুটি পাঠানো হল। তারা আপনার জবাবের জন্য অপেক্ষা করবে।

গোশতের ব্যাপারে একটি বিষয় যা আমার জানা নেই তা হচ্ছে, হালাল করার কোন নির্দিষ্ট পন্থা কি কুরআন অথবা হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে? অথবা আল্লাহর নাম নিয়ে মেশিনের সাহায্যে কি যবেহ করা যেতে পারে? পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেহেতু যবেহ করার বিভিন্ন পন্থা প্রচলিত আছে, তাই যতক্ষণ যবেহ করার প্রতিটি পন্থা বিস্তারিতভাবে না জানা যাবে, ততক্ষণ তাদের যবেহকৃত প্রাণীকে মৃত বলাটা বেশ কঠিন। এর ভিত্তিতে আমি মৃতকে হারামের কারণ বানিয়ে আলোচনা করি না, বরং যে দু'টি আয়াতে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করা প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে এবং গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে-সেই আয়াত দু'টিকেই আলোচনার কেন্দ্র বানাই।" এই চিঠির সাথে সে যে ফতোয়া পাঠিয়েছে তার হুবহু অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলঃ

১ নম্বর ফতোয়া

আহলে কিতাবদের যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার জবাব এই যে, আল্লাহ তাআলা-যাঁর কোন নির্দেশই হিকমতশূন্য নয়-মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাবদের খাদ্য হালাল করতে গিয়ে এই বলেননি যে, "আহলে কিতাবদের যবেহকৃত প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল," বরং বলেছেনঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

"আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল।"

এর অর্থ হচ্ছে–ইহূদী খৃষ্টানদের পাদরী এবং এই ধর্মের অনুসারীগণ যেসব খাবার খায় তার মধ্যে শূকরের গোশত ছাড়া আর সবই মুসলমানদের জন্য হালাল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের যবেহ করার ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, তার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে অথবা তা মুসলমানদের পদ্ধতিতে যবেহ করা হয়েছে।

সূরা মায়েদায় এসেছে (১ম রুকূ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের পূর্ণতা বিধান করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী থেকে জানা যায়ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ -

"আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিআমত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি" (সূরা মায়েদা ঃ ৩)।

এই প্রসঙ্গে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে আয়াতে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের খাদ্যদ্রব্য হালাল হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে তা এই 'দীনের পূর্ণতা বিধান' সম্পর্কিত আয়াতের মাত্র কয়েক লাইন পরেই বর্তমান রয়েছে। এই নিকট সম্পর্ক বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার দীন যেভাবে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী এবং তাঁর অন্যান্য নির্দেশ যেভাবে চিরন্তন ও রহিত বা পরিবর্তিত হওয়ার উর্ধে অনুরূপভাবে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত নির্দেশও চিরন্তন। এটাকে আল্লাহ তাআলা কোন নির্দিষ্ট যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট করেননি। এটাও সুস্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে আহলে কিতাবদের এখানে পশুর মাথায় রাবার বুলেট মেরে বেহুশ করে যবেহ করার পদ্ধতি প্রচলিত হবে। তাছাড়া স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মধারাও বর্তমান রয়েছে। এক ইহূদী নারী তাঁকে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খেতে দেয়। এই বকরী আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে কি না বা তা যবেহ করার কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে– এসব জিজ্ঞেস করা ব্যতিরেকেই তিনি তা খেয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর বাণী এই যে, "আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যে জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন তা হালাল, যে জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন তা হারাম এবং যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁর রহমাতের ভিত্তিতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, অবশ্য তাঁর জাত ভুলে যাওয়া থেকে পবিত্র, তোমরা তার পেছনে অনুসন্ধানে লেগে যেও না।" তিনি আরো বলেছেনঃ "আমি যে সম্পর্কে তোমাদের পরিষ্কার বলিনি সে সম্পর্কে

তোমরা আমাকেও জিজ্ঞেস কর না। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নবীদের কাছে অধিক প্রশ্ন করে এবং মতভেদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আমি যে জিনিস থেকে তোমাদের বাধা দেব তোমরা তা থেকে ফিরে থাকবে, আর যখন কোন কাজের নির্দেশ দেব তা যতদূর পার কর।"

ইমাম ইবনুল ইজ্জী আল-মাআফেরী দলীল সহকারে প্রমাণ করেছেন যে, যদি কোন খৃষ্টান তরবারির আঘাতে মুরগীর মাথা উড়িয়েও দেয় তাহলে এটা মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েয। ইহূদী এবং খৃষ্টানদের সম্পর্কে এও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, এই সম্প্রদায়ের যেসব লোকদের ওপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত এবং দাওয়াতের প্রমাণ চূড়ান্ত হয়েছে তারা খোদার নাম যিকির করলেও ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এজন্য যবেহ করার সময় এ ধরনের লোকদের আল্লাহর নাম নেয়া এবং না নেয়া সমান কথা। অবশ্য যাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছেনি এবং প্রমাণ কায়েম হয়নি তারা পূর্বেকার দীনেই আছে এবং তা সহীহ।

যে পশু মুশরিকরা যবেহ করে যারা ইহূদী বা খৃষ্টান নয়, সে যবেহ করার সময় হাজার বার আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হালাল নয়। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলেও যবেহকৃত পশুর গোশত হালাল এবং তা খাওয়া জায়েয। কেননা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির বর্তমান থাকে। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যা মরু বেদুইনরা শহরে নিয়ে আসত এবং যে সম্পর্কে জানা নেই যে, তারা পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েছে কিনা। তিনি বললেনঃ اذکروا اسم الله علیها انتم وکلوها তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নাও এবং তা খাও"। অনুরূপভাবে একবার তাঁর কাছে রুমি পনীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, রোমবাসীরা এই পনীর শূকরের বাচ্চার পাকস্থলির মধ্যে তৈরী করে। তিনি জবাবে শুধু এতটুকুই বললেনঃ اِنِّیْ لَا اُحَرِّمُ حَلَالًا (আমি একটি হালাল জিনিসকে হারাম করতে পারি না। তিনি প্রশ্নকারীর কথার প্রতি এর অতিরিক্ত খেয়াল দেননি।১

---

১. এই হাদীসের কোন বরাত দেয়া হয়নি। তাই এর পর্যালোচনা ও যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব নয়। আবু দাউদের কিতাবুল আতঈমায় যে হাদীস রয়েছে তাতে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, তাবুকের যুদ্ধকালীন সময়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য পনীর আনা

এই বিষয় সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার একটি এই যে, ان الطعام لا يُطرح بالشك কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে কোন খাদ্য ফেলে দেয়া যাবে না)। অনন্তর এই নীতিও বিবেচনাযোগ্য যে, دين الله يسر نيسّروا ولا تعسّروا ولا تنفّروا (আল্লাহর দীনের মধ্যে সহজতা রয়েছে। তাকে তোমরা সহজই রাখ, শক্ত করনা এবং লোকদের তা থেকে বিমুখী করনা)।

২ নম্বর ফতোয়া

মহান আল্লাহর বাণীঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ.........

হল। তিনি ছুরি চেয়ে নিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তা কেটে খেলেন। খাত্তাবী এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, এই পনীর পাকস্থলীর সাহায্যে জমানো হত (অর্থাৎ পশুর দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা যবেহ করে এর পাকস্থলী বের করে নেয়া হত এবং পনীর তৈরীর উদ্দেশ্যে এর সাহায্যে দুধ জমানো হত)। এই পেশা মুসলমান এবং কাফের উভয়ই করত। ইমাম আবু দাউদ এই বর্ণনাটি যে উদ্দেশ্যে নিয়েছেন তা হচ্ছে –রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে জায়েয মনে করেছেন। কেননা তা হারাম হওয়ার কোন সুস্পষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে না–(সুনানে আবু দাউদ, ৫ খণ্ড, পৃ. ৩২৮, সংকলন হামেদ আল ফিকী)। মুসনাদে আহমদের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এক যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (স)–এর জন্য পনীরের একটি টুকরা আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কোথাকার তৈরী? বলা হল, ইরানের। আমাদের ধারণা এটা মৃতজীব থেকে তৈরী হয় (অর্থাৎ এমন পশুর পাকস্থলীর সাহায্যে তৈরী করা হয় যা আহলুল যবেহ ছাড়া অন্য লোকেরা অর্থাৎ মজুসীরা যবেহ করে থাকে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তা কেটে খেয়ে নাও। কিন্তু এই ঘটনাটিকে ইবনে আব্বাসের শাগরিদ ইকরামার বরাত দিয়ে যে ব্যক্তি বর্ণনা করেছে তার নাম জাবের জু'ফী এবং সে সর্বজন পরিচিত মিথ্যাবাদী। অতএব এটা গ্রহণযোগ্য হাদীস নয়। ইকরামা থেকে অপর একটি রিওয়ায়াত আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রে আবু দাউদ তায়ালিসী নকল করেছেন। তাতে মৃত জীবের উল্লেখ নেই; কেবল তঅামুন ইউসনাউ বিআরদিল আ'জাম (অনারব দেশের তৈরী খাদ্য) উল্লেখ আছে–(মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নম্বর ২৬৮৪)। এখন যে হাদীসে পনীর জমানোর জন্য শূকরের বাচ্চার পাকস্থলী ব্যবহার করা জায়েয বলা হয়েছে–কোন্ কিতাবে এবং কোন্ সনদে বর্ণিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান সাপেক্ষ ব্যাপার। (গ্রন্থকার)

(আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হয়েছে এবং কিতাবধারী সম্প্রদায়ের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল)। আহালে কিতাব সম্প্রদায়ের খাদ্য যার মধ্যে যবেহযোগ্য এবং অযবেহযোগ্য সব ধরণের খাবারই শামিল রয়েছে, যা মুসলমানদের জন্য হালাল, উল্লেখিত আয়াত একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। আহলে কিতাবগণ যবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করে কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাদের খাবার হালাল করেছেন, চাই তা তাসমিয়া সহকারে হোক বা তাসমিয়া ছাড়া (যবেহ করা) হোক। শায়েখ যাদাহ (রহ) সূরা আনআমের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন (পৃ. ৩০৪)ঃ

"আল্লাহ তাআলার বাণীঃ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তার গোশত খেও না, তা খাওয়া ফাসেকী কাজ" (সূরা আনআমঃ ১২১)। যেসব জিনিসের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুল বশতঃ আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি–এ আয়াত তা সবই হারাম হওয়া প্রমাণ করে। দাউদ যাহেরীর মাযহাবও তাই। ইমাম আহমদ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক এবং শাফিঈ (রহ) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা যে কোন অবস্থায় মুসলমানদের যবেহ করা পশু হালাল বলেছেন–তার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়ে থাক বা না থাক। তাদের মতের দলীলের ভিত্তি হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসঃ ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليها (মুসলমানদের যবেহকৃত পশু হালাল,. তার ওপর আল্লাহর নাম না নেয়া হয়ে থাকলেও)। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ইচ্ছাকৃতভাবে বিছমিল্লাহ পরিত্যাগ এবং ভুল বশত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

"যে খাদ্যের ওপর গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সত্তা) নাম নেয়া হয়েছে–বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তা ফিসক সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছেঃ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ কিংবা যদি ফিসক হয়–যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয় (সূরা আনআমঃ ১৪৫)। إِنَّهُ لَفِسْقٌ -এর 'হু' সর্বনাম যদি مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ -এর 'মা' শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়– তাহলে সেই অবস্থায় আলেমদের ঐ ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল وَلَا تَأْكُلُوا -এর

আকাল (খাওয়া) ধাতুকেও নির্ধারণ করা যেতে পারে। (এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে–যে খাদ্যের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা খাওয়া ফাসেকী কাজ)।"

এরপর শায়েখ যাদাহ (রহ) এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, وَلَا تَأْكُلُوا......الخ আয়াতের ভিত্তিতে এই রায় যে কোন জিনিস হারাম হওয়ার দিকে ইংগিত করে যার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুল বশতঃ আল্লাহর নাম পরিত্যাগ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, আয়াতটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। এর মধ্যে পানাহারের যাবতীয় জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং আতা এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি জিনিস যার ওপর যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা হারাম। চাই তা খাদ্যদ্রব্য হোক অথবা পানীয় দ্রব্য। কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদদের ইজমা (ঐক্যমত) এই যে, আয়াতের নির্দেশ কেবল আল্লাহর নাম ব্যতীত প্রাণ বের হয়ে যাওয়া পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধরনের পশুর তিন অবস্থা হতে পারেঃ

১. তা যবেহ করা হয়নি এবং অন্য কোন পন্থায় তা মারা গেছে,

২. তা যবেহ করা হয়েছে, কিন্তু তা গাইরুল্লাহর নামে, অথবা

৩. তা যবেহ করার সময় আল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নাম নেয়া হয়নি। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় ঐ পশুর গোশত খাওয়া হারাম। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। তৃতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে এবং এ সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়ঃ

এক ঃ তা সাধারণভাবেই হারাম, যেমন وَلَا تَأْكُلُوا......الخ আয়াতের সাধারণ ভাবধারা থেকে পরিষ্কার জানা যায়। উল্লেখিত তিনটি পন্থাই এই আয়াতের নির্দেশের মধ্যে শামিল রয়েছে।

দুই ঃ তা সাধারণত হালাল। এটা ইমাম শাফিঈর মত। তাঁর মতে তাসমিয়া ছাড়া যবেহ করলে তা সর্বাবস্থায় হালাল–ভুলে অথবা সজ্ঞানে তাসমিয়া পরিত্যাগ করা হোক না কেন। তবে শর্ত হচ্ছে তা আহলে যবেহ (মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান) কর্তৃক যবেহ হতে হবে। ইমাম শাফিঈ আয়াতের সাধারণ নির্দেশকে (আল ইয়াওমা উহিল্লা লাকুমুত তাইয়্যেবাত ওয়া তআমুল্লাযীনা) 'আল–মাইতাহ' এবং "উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহ" আয়াতদ্বয়ের বিশেষ নির্দেশের সাথে বদল করে এর প্রয়োগ ক্ষেত্রকে কেবল

প্রথমোক্ত দুই পদ্ধতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেন। তৃতীয় পদ্ধতি জায়েয হওয়ার সপক্ষে এই দলীল পেশ করেন যে, যে কোন মুমিনের মনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির বর্তমান রয়েছে। তার ওপর যিকির ভুলে যাওয়ার মত অবস্থা কখনো কার্যকর হয়না। এজন্য তার যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া সর্বাবস্থায় হালাল। তাদের যবেহকৃত হালাল প্রাণী কেবল তখনই হারাম হবে যদি তা গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তাসমিয়া বর্জিত যবেহকে "ফিসক" ঘোষণা করেছেন। যে পশু কোন মুসলমান যবেহ করে এবং যবেহ করার সময় যদি তাসমিয়া পরিত্যাগ করে–তবে এর গোশত খাওয়া ফিসকের অন্তর্ভূক্ত হবেনা। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে। কেননা মানুষ কোন ইজতেহাদী নির্দেশের বিরোধিতা করলে ফিসকে লিপ্ত বলে গণ্য হবেনা। মূল কথা হচ্ছে– بما لو يذكر اسم الله আয়াতের নির্দেশ কেবল প্রথমোক্ত পদ্ধতি দুটির ওপর কার্যকর হবে। আয়াতের পরবর্তী অংশ

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

("শয়তানেরা নিজেদের অনুসারীদের মনে নানারূপ সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্রেক করে–যাতে তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে") থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা শয়তানদের অনুচরদের বিতর্ক কেবল দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছিল। এক, মৃতজীব–এটাকে কেন্দ্র করে তারা মুসলমানদের ওপর অভিযোগ উত্থাপন করত যে, "কুকুর এবং শিকারী পাখী যা হত্যা করেছে তোমরা তা খেতে পার, অথচ আল্লাহ তাআলা যা হত্যা করেছেন তা খাচ্ছনা।" তাদের দ্বিতীয় ঝগড়াটি ছিল, গাইরুল্লাহ অর্থাৎ ভূতপ্রেত ও দেবদেবীর নামে যবেহকৃত পশুকে কেন্দ্র করে। তারা মুসলমানদের বলত, "আমাদেরও খোদা আছে, "তোমাদেরও খোদা আছে, তোমরা নিজেদের খোদার নামে যা যবেহ করছ আমরা তা খাচ্ছি, আমরা আমাদের খোদাদের নামে যা যবেহ করি তোমরা তা খাচ্ছনা কেন?"

যেহেতু তাদের ঝগড়া ছিল ঐ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে وَلَا تَأْكُلُوا তাই আয়াতের নিষেধাজ্ঞা ঐ দুটি বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট। অনন্তর আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وان اطعتموهم انكم لمشركون (তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কবুল কর তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে)। আয়াতের এই অংশের আলোকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, তাসমিয়া বিবর্জিত খাদ্য খাওয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের আনুগত্য বলে সাব্যস্ত

হবেনা, বরং মৃত জীব খাওয়া জায়েয মনে করলে এবং দেব–দেবীর নামে যবেহ করলে তাদের আনুগত্য হচ্ছে বলে সাব্যস্ত হবে।

তিন ঃ যবেহকারী যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাসমিয়া পরিত্যাগ করে তাহলে যবেহকৃত পশু হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলে তাসমিয়া ছুটে গেলে যবেহকৃত পশু হালাল হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর এই মত। ইমাম সাহেব বলেন, যদিও অলা তা'কুলু.....আয়াতের মধ্যে তিনটি পদ্ধতিই অন্তর্ভুক্ত এবং তিনটি পদ্ধতিই হারাম সাব্যস্ত হয়, কিন্তু ভুলবশত তাসমিয়া বিবর্জিত যবেহকৃত পশু দু'টি কারণে এই আয়াতের নির্দেশ বহির্ভূত। এইজন্যে যে, প্রথমত إِنَّهُ لَفِسْقٌ –এর সর্বনাম لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ –এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কেননা এটাই সর্বনামের অতি নিকটে আছে এবং নিকটতর স্থানে সর্বনামের প্রত্যাবর্তনই উত্তম। অতএব স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাসমিয়া পরিত্যাগকারী নিঃসন্দেহে ফাসেক। কিন্তু যে ব্যক্তি ভুলের শিকার হয়ে পড়েছে সে শরীআতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এর বাইরে। এজন্য আয়াতের অর্থ হবে, যে পশু যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার গোশত খেওনা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেছে সে এই আয়াতের নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম থাকবে।

দুই, ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় দলীল এই যে, একবার সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, পশু যবেহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় তাহলে এর গোশতের কি হুকুম? তিনি বললেনঃ "এর গোশত খেয়ে নাও, প্রতিটি মুমিনের অন্তরে আল্লাহর নাম বর্তমানরয়েছে।"

"أُوتُوا الْكِتَابَ" –র মধ্যে ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই অন্তর্ভুক্ত। এজন্য وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ইহুদী–খৃষ্টানদের যবেহকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য হালাল– তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামেই যবেহ করুক না কেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "খৃষ্টানরা যদি মসীহ–এর নামে পশু যবেহ করে তাহলে এর গোশত খাওয়া আমাদের জন্য হালাল নয়।" কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলেমদের অধিকাংশের মত এই যে, মসীহ্ –এর নামে যবেহ করা পশুর

গোশতও আমাদের জন্য হালাল।[১] একবার ইমাম শা'বী এবং আতাকে জিজ্ঞেস করা হল, খৃষ্টানরা যদি ঈসা মসীহ্-এর নামে পশু যবেহ করে তাহলে এর গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল হবে কি? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, খৃষ্টানদের যবেহকৃত পশু আমাদের জন্য হালাল। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের জন্য খৃষ্টানদের যবেহকৃত পশু হালাল করেছেন তখন তাঁর জ্ঞানে এটাও ছিল যে, খৃষ্টানরা যবেহ করার সময় কার নাম নেবে।"

এ প্রসংগে প্রবন্ধকারের পর্যালোচনা

ইরাকের আলেমদের এই ফতোয়া দু'টি কোন নতুন জিনিস নয়। তাদের পূর্বে ফযীলাতুস শায়েখ হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ সাহেব এবং তাঁরও পূর্বে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহ এবং আল্লামা রশীদ রিদা তাসমিয়া এবং যবেহ ছাড়াই খৃষ্টানদের যবেহকৃত পশু হালাল সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে তাদের সবার যুক্তি প্রমাণ প্রায় একই রকম। কিন্তু এসব যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের দেখা উচিত আসল সমস্যাটা কি?

প্রাণীজ খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের আরোপিত শর্ত ও সীমারেখা

পশু-পাখীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদ যেসব শর্ত ও সীমারেখা আরোপ করেছে এবং সহীহ হাদীসসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

---

১. এ কথাটা বাস্তবতার পরিপন্থী। মসীহ্-এর নামে কোন পশু যবেহ করাটা পরিষ্কারভাবে 'মা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহ্'-এর সংজ্ঞার আওতায় এসে যায়। সুতরাং তা হালাল হওয়ার পক্ষে বিশেষজ্ঞ আলেমদের অধিকাংশ কি করে একমত হতে পারেন? 'আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে চার মাযহাবের যে মত উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ আবু হানীফা (রহ) বলেন, আহলে কিতাবদের কেউ যবেহ করার সময় যদি মসীহ্- এর নাম নেয় তাহলে এটা খাওয়া হালাল নয় (পৃ.৭২৬)। মালেকীগণ আহলে কিতাবের যবেহকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত আরোপ করেন যে, তা যবেহ করার সময় গাইরুল্লাহর নাম নেয়া হয়নি (পৃ.৭২৭)। শাফিঈগণ মুসলমানদের যবেহকৃত পশু সম্পর্কে বলেন, যদি তারা পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামও নেয় এবং এর দ্বারা শিরক করার নিয়্যাত থেকে থাকে, তাহলে তাদের এই পশুর গোশত হারাম হয়ে যাবে (পৃ.৭২৯)। হাম্বলীগণ বলেন, খৃষ্টানরা যবেহ করার সময় মসীহ্-এর নাম নিলে তাদের যবেহকৃত পশু হালাল হবে না (পৃ.৭৩০)। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন চার মাযহাব হারাম হওয়া সম্পর্কে একমত, তখন সেই অধিকাংশ আলেম কারা-যারা এটাকে হালাল বলছেন? (গ্রন্থকার)

যে সব জিনিস খাওয়া হারাম

সর্বপ্রথম শর্ত যা কুরআন মজীদ আরোপ করেছে তা হচ্ছেঃ মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে তা হারাম। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সূরা আনআম (১৪৫ আয়াত) এবং সূরা নাহলে (১১৫ আয়াত) এই হুকুম এসেছে এবং মদনী সূরাগুলোর মধ্যে সূরা বাকারা (১৭৩ আয়াত) এবং সূরা মায়েদায় (৩ আয়াত) এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সূরা মায়েদা যা আহকাম সম্পর্কিত সর্বশেষ সূরা–আরো দু'টি বিষয় সংযোজন করেছে। এক, কেবল স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীই হারাম নয়, বরং যেসব পশু শ্বাসরুদ্ধ করে অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে পড়ে গিয়ে অথবা ধাক্কা লেগে মারা গেছে অথবা কোন হিংস্র প্রাণী ছিন্নভিন্ন করেছে–তা সবই হারাম। দুই, যে পশু মুশরিকদের বেদীতে যবেহ করা হয়েছে তাও হারাম নির্দেশের অধীনে ما اهل لغير الله به আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–চাই তা গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা হোক বা না হোক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাধা, মাংসভোজী হিংস্র জন্তু এবং থাবাযুক্ত শিকারী পাখীও এই হারাম জিনিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেন। বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে তা প্রমাণিত (বিস্তারিত জানার জন্য 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থের 'কিতাবুল আতঈমা ওয়াস সাইদি ওয়াল যাবায়েহ' অধ্যায় পাঠ করুন)।

যবেহ করার জন্য তাযকিয়া শর্ত

কুরআন মজীদ দ্বিতীয় শর্ত এই বর্ণনা করেছে যে, কেবল তাযকিয়াকৃত পশুই হালাল। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ......وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ - (ايت ٣)

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁদ পড়ে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে মারা গেছে, যা কোন হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করেছে– কিন্তু জীবিত পেয়ে যবেহ করার

সুযোগ হয়েছে তা ব্যতীত–এবং যা কোন আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে–তা সবই তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে" (সূরা মায়েদাঃ ৩)।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তাযকিয়া করার কারণে যে পশুর মৃত্যু হয়েছে তা এই হারামের নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। তাযকিয়া ছাড়া অন্য যে কোন পন্থায় মারা গেলে তার ওপর হারাম নির্দেশ কার্যকর হবে। কুরআন মজীদে 'তাযকিয়া' শব্দের কোন ব্যাখ্যা করা হয়নি। অভিধানসমূহও এর পন্থা নির্ধারণে খুব একটা সাহায্য করছে না। এজন্য শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সুন্নাতে এর দু'টি পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

এক, পশু আমাদের কাবুতে নেই। যেমন বন্য পশু যা পালিয়ে যাচ্ছে, অথবা পাখী যা উড়ে যাচ্ছে। অথবা তা আমাদের কাবুতে আছে ঠিকই কিন্তু কোনভাবেই রীতিমত যবেহ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে যবেহ করার পন্থা এই যে, কোন ধারালো জিনিস দিয়ে পশুর দেহ এমনভাবে জখম করে দিতে হবে যাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণেই পশুর মৃত্যু ঘটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পন্থাটির নির্দেশ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ امرر الدم بما شئت। "যে জিনিস দিয়েই পার রক্ত প্রবাহিত করে দাও" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

দুই, পশু আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং আমরা নিজেদের মর্জিমত তা যবেহ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত পন্থায় যবেহ করতে হবে। সুন্নাতে এই পন্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উট এবং এ ধরনের পশু নহর করতে হবে। গরু–ছাগল এবং এ ধরনের পশু যবেহ করতে হবে। নহর এই যে, পশুর কণ্ঠনালীতে বর্শার মত ধারালো ও সূঁচালো জিনিস খুব জোরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এতে রক্তের ফোয়ারা ছুটবে এবং রক্ত ঝরতে ঝরতে অবশেষে পশুটি রক্তশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। উট যবেহ করার এই পদ্ধতি আরব বিশ্বে খুবই প্রসিদ্ধ। কুরআন মজীদেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। فصل لربك وانحر সুন্নাতে নববী থেকে জানা যায়, আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতিতেই উট যবেহ করতেন। এ হল নহর সম্পর্কিত আলোচনা।

এখন থাকল যবেহ। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ এসেছেঃ

عن ابى هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل

بن ورقة الخزاعى على جمل اورق فى فجاج منى الا ان الذكاة

فى الحلق واللبة، ولا تعجلوا الانفس ان تزهق (دارقطنى)

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের মওসুমে বুদাইল ইবনে অরাকাকে একটি ধূসর বর্ণের উটে করে মিনার পাহাড়ী রাস্তায় নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠানঃ যবেহ করার স্থান হচ্ছে কণ্ঠনালী এবং গলার মধ্যবর্তী স্থান।[১] যবেহকৃত জন্তুর প্রাণ সহজে এবং দ্রুত বের করে দাও। (দারু কুতনী)

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن

الذبيحة ان تفرس (طبرانى)

২. ইবনে আব্বাস (রহ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবেহ করার সময় মেরুদন্ড পর্যন্ত কেটে ফেলতে নিষেধ করেছেন–(তাবারানী)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি মুরসাল বর্ণনা নকল করেছেন। তাতে আছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان تنخع الشاة اذا ذبحت

৩. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম "বকরী যবেহ করার সময় এর মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে নিষেধ করেছেন।"

এসব হাদীস এবং নবী যুগ ও সাহাবী যুগের কর্মপন্থার ভিত্তিতে হানাফী, শাফিঈ এবং মালেকীদের মতে যবেহ করার জন্য কণ্ঠনালী এবং ঘাড়ের শিরাহমূহ কাটতে হবে (আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, ১ম খন্ড, পৃ. ৭২৫–৩০)

সংকট অবস্থায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যবেহ করার এই তিনটি পদ্ধতি যা কুরআন মজীদের নির্দেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীসে বলে দেয়া

১. অর্থাৎ ঘাড়ের দিক থেকে যবেহ করবেনা। কারণ এতে প্রথমেই মেরুদন্ড কেটে যাবে। বরং গলার দিকে যবেহ করতে হবে যেদিকে কণ্ঠনালী রয়েছে।

হয়েছে–তাতে পশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় না, বরং এর মস্তিষ্ক এবং দেহের মধ্যেকার সম্পর্ক শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। স্পন্দন এবং কম্পনের ফলে এর দেহের প্রতিটি অংশের রক্ত বের হয়ে আসে এবং এই রক্ত প্রবাহই এর মৃত্যুর কারণ হয়। এখন যেহেতু কুরআন নিজের এ নির্দেশের কোন ব্যাখ্যা করেনি এবং কুরআনের ধারকের পক্ষ থেকে এই ব্যাখ্যা প্রমাণিত আছে এজন্য মানতেই হবে যে, "ইল্লা মা যাক্কাইতুম"–এর অর্থ উল্লেখিত যবেহই হবে। যে পশুকে যবেহ করার এই শর্ত পূর্ণ না করেই ধ্বংস করা হয়েছে তা হালাল নয়।

উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও কুরআন মজীদে তাযকিয়ার আরো একটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে–প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশু তার মালিকের জন্য শিকারকে সংরক্ষণ করবে। এই অবস্থায় শিকার যদি শিকারী পশুর আঘাতে মারা যায় তাহলে এটা যবেহকৃত বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ
اللّٰهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. (المائدة: آيت ٤)

"যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছ–যেসব জন্তুকে খোদার দেয়া ইলমের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাক–এরা যেসব প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে রাখবে তাও তোমরা খেতে পার" (সূরা মায়েদাঃ ৪)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেনঃ

فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد
قتل ولم ياكل منه فكله وان اكل فلا تاكل - (بخارى - مسلم)

"যদি তা শিকারকে তোমার জন্য সংরক্ষণ করে এবং তুমি তা জীবিত অবস্থায় পাও তাহলে এটা যবেহ কর। কিন্তু শিকার যদি তুমি এমন অবস্থায় পাও যে, তোমার কুকুর এর জীবন সংহার করেছে কিন্তু এর কোন অংশ খায়নি তাহলে তুমি এটা খেতে পার। কিন্তু কুকুর যদি তা থেকে খেয়ে থাকে তাহলে তুমি এটা খাবে না'' –(বুখারী, মুসলিম)।

وان اكل منه فلا تاكل فانما امسك على نفسه - (بخارى، مسلم، احمد)

"কুকুর যদি শিকার থেকে কিছুটা খেয়ে থাকে তাহলে এ শিকার তুমি খেও না। কেননা সে নিজের জন্য তা শিকার করেছে"

–(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)।

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (بخاری ومسلم)

"তুমি তোমার প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর দিয়ে যে শিকার করেছ তা যদি জীবিত অবস্থায় পেয়ে যবেহ করতে সক্ষম হয়ে থাক, তাহলে তুমি এটা খাও" –(বুখারী)।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশু কর্তৃক তার মালিকের জন্য শিকার মেরে নিয়ে আসাটা কুরআনের দৃষ্টিতে যাকাতের (যবেহ) শর্ত পূর্ণ করে। এজন্য তা مَا أَكَلَ السَّبُعُ আয়াতের হারামের আওতা থেকে পৃথক হয়ে" إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ –এর নির্দেশের ব্যতিক্রমের আওতায় এসে যায়। কিন্তু কুরআন এ নির্দেশ কেবল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশুর জন্যই বর্ণনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশের আওতা থেকে এমন পশুকেও বহিষ্কার করে দেন যা– পোষা কিন্তু শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। অতএব এর ওপর অন্য কোন প্রাণীকে কিয়াস করে তার ছিন্নভিন্ন করা পশুর গোশত জায়েয করার কোন দিক বের করা যেতে পারে না। 'প্রশিক্ষণহীন কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার তুমি যদি জীবিত পেয়ে তা যবেহ করার সুযোগ পাও তাহলে এটা খেতে পার'– হাদীসের এ বক্তব্য চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয় যে, তাযকিয়া (যবেহ) ব্যতীত অন্য যে কোন পন্থায় কোন প্রাণী হত্যা করা হলে তা মৃত প্রাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

যবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তাসমিয়ার শর্ত

কুরআন মজীদে তৃতীয় যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। এ নির্দেশকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিবাচকভাবে বলা হয়েছেঃ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ -

(الأنعام ، آيت ١١٨)

"যেসব জন্তুর ওপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে – তোমরা তার গোশত খাও যদি তোমরা তার আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক" (সূরা আনআমঃ ১১৮)।

নেতিবাচকভাবে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (الانعام آيت ١٢١)

"আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তার গোশত খেওনা। তা খাওয়া ফাসেকী কাজ" (সূরা আনআমঃ ১২১)।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুর সাহায্যে শিকারকৃত প্রাণীর ব্যাপারেও হেদায়াত দান করা হয়েছেঃ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ - (المائدة، آيت ٤)

"এরা যেসব জন্তু তোমাদের জন্য ধরে রাখবে তা তোমরা খেতে পার। অবশ্য এর ওপর আল্লাহর নাম নিতে হবে।[৪] 'আল্লাহর আইন ভঙ্গ করাকে ভয় কর, হিসাব নিতে আল্লাহর দেরী হয় না' (সূরা মায়েদাঃ ৪)।

তাছাড়া আমরা আরো দেখতে পাই কুরআন অনেক জায়গায় 'যবেহ' শব্দটি ব্যবহারই করেনি, বরং এর পরিবর্তে "পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া" বাক্যাংশ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেঃ

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ

مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ - (الحج: ٢٨)

"যেন তাদের জন্য এখানে রাখা কল্যাণসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেই জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয় (যবেহ করে), যা তিনি তাদের দান করেছেন" (সূরা হজ্জঃ ২৮)।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ - (الحج: ٣٤)

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কোরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যেন তারা সেই জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয় (যবেহ করে), যা তিনি তাদের দান করেছেন" (সূরা হজ্জঃ ৩৪)।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ - (الحج: ٣٦)

৪) কিসের ওপর আল্লাহর নাম নেবে? হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা সামনে আসছে।

"অতএব এগুলোকে দাঁড় করিয়ে এর ওপর আল্লাহর নাম নও (যবেহ কর)" (সূরা হজ্জঃ ৩৬)।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - (الانعام: ١١٨)

"যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে পশু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হয়েছে) তার গোশত খাও"

(সূরা আনআমঃ ১১৮)।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - (الانعام: ١٢١)

"যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি (অর্থাৎ যেসব জন্তু আল্লাহর নাম না নিয়েই যবেহ করা হয়েছে) তার গোশত খেওনা"

(সূরা আনআমঃ ১২১)।

যবেহ করার জন্য 'তাসমিয়া' পরিভাষাটির যুগপৎ ব্যবহার প্রমাণ করে, কুরআনের দৃষ্টিতে যবেহ এবং তাসমিয়া সমার্থবোধক। তাসমিয়া ব্যতীত কোন জন্তু হালাল হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তাসমিয়া হালাল জন্তুর মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই শামিল।

এখন দেখা যাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ এবং শক্তিশালী সনদ সূত্রে যেসব হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা যবেহ-এর জন্য তাসমিয়ার কি শরঈ মর্যাদা প্রকাশ করে। হাতেম তাঈর পুত্র আদী (রা) সেই ব্যক্তি যিনি অধিকাংশ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। রসূলুল্লাহ (স) এ সম্পর্কে তাকে যেসব আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته

حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكله .....

واذا رميت سهمك فاذكر اسم الله (بخارى ومسلم)

"যখন তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তোমার কুকুর ছাড় তখন আল্লাহর নাম নও। কুকুর যদি তোমার জন্য শিকার ধরে রাখে এবং তুমি তা জীবিত অবস্থায় পাও তাহলে এটা যবেহ করে নাও। তুমি যদি তা এমন অবস্থায় পাও যে, কুকুর তা হত্যা করে ফেলেছে, কিন্তু এর কোন অংশ খায়নি–

তাহলে তুমি এটা খেতে পার। যখন তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহর নাম স্মরণ কর'' (বুখারী, মুসলিম)।

وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما
صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل-

"তুমি তীরের সাহায্যে যে জন্তু শিকার কর এবং এর ওপর আল্লাহর নাম নিয়েছ– তা খাও। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে জন্তু শিকার কর এবং এর ওপর আল্লাহর নাম নিয়েছ– তা খাও।''

امرر الدم بم شئت واذكر اسم الله - (ابو داود، نسائی)

"যে জিনিস দিয়েই চাও রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর'' –(আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله عليه
فكل مما امسك عليك- (ابو داود- احمد)

"যে কুকুর অথবা বাজ পাখীকে তুমি প্রশিক্ষণ দিয়েছ, অতপর তা শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছ এবং এর ওপর আল্লাহর নাম নিয়েছ তা তোমার জন্য যে শিকার ধরে রাখে তা খাও''

(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)।

আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে আমার কুকুর ছেড়ে দেই, অতপর শিকারের কাছে পৌঁছে অন্য কোন কুকুর দেখতে পাই এবং আমি জানতে না পারি যে, কোন্ কুকুরটি শিকার হত্যা করেছে–তাহলে এ অবস্থায় কি করা যাবে? তিনি বললেনঃ

فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره-

"তা খেওনা। কেননা তুমি তোমার নিজের কুকুরের ওপর তাসমিয়া পড়েছ, অন্য কুকুরের ওপর তাসমিয়া পড়নি''

(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)।

আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এই পরিষ্কার এবং চূড়ান্ত নির্দেশ বর্তমান থাকার পর এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা যে,

"শরীআতে যবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তাসমিয়া শর্ত এবং যে জন্তুকে আল্লাহর নাম নেয়া ব্যতিরেকেই হত্যা করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম।" এ ধরনের পরিষ্কার আয়াত এবং হাদীসের মাধ্যমেও যদি কোন নির্দেশ প্রমাণিত না হয় তাহলে আমাদের বলে দেয়া হোক কোন নির্দেশ প্রমাণিত হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত কি ধরনের আয়াত বা হাদীসের প্রয়োজন?

তাসমিয়া সম্পর্কে ফিকহবিদদের অভিমত

ফিক্হ ভিত্তিক মাযহাবগুলোর মধ্যে হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের ঐক্যমত অনুযায়ী যে পশু যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেয়া পরিত্যাগ করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম। অবশ্য ভুলবশতঃ আল্লাহর নাম পরিত্যক্ত হলে কোন ক্ষতি নেই। হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, যুহরী, আতা, তাউস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, আবু মালেক, আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ এবং রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমানেরও এই মত বর্ণিতআছে।

অপর দল বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তাসমিয়া ছুটে যাক অথবা ভুলে পরিত্যক্ত হোক–উভয় অবস্থায়ই যবেহকৃত প্রাণী হারাম হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), নাফে, শা'বী এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের এই মত। আবু সাওর এবং দাউদ যাহেরী এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম নাখঈর মতে ভুলে তাসমিয়া পরিত্যাজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া মাকরূহ তানযীমা।

ইমাম শাফিঈর মত এই যে, যবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তাসমিয়া মূলতঃ শর্ত নয়। যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া অবশ্যই শরীআত অনুমোদিত একটি সন্নাত তরীকা। তা সত্ত্বেও যদি ইচ্ছায় অথবা ভুলে আল্লাহর নাম না নেয়া হয়, তবুও উভয় অবস্থায় যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা) এবং মুজতাহিদদের মধ্যে ইমাম আওযাঈ ছাড়া আর কারো এই মত ছিল না। যদিও কোন কোন রিওয়ায়াতে ইবনে আব্বাস (রা), আতা ইবনে আবী রিবাহ, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালেকের সাথে এই মত সংযুক্ত করা হয়েছে –কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত মত এর পরিপন্থী।

তাসমিয়া ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে শাফিঈ মাযহাবের দলীল এবং এর দুর্বলতা

এই রায়ের সপক্ষে শাফিঈ মাযহাবের প্রথম দলীল এই যে, لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ আয়াতে 'ওয়া' অক্ষরটিকে সংযোগ অব্যয়ের অর্থে ব্যবহার করা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী। কেননা আয়াতের প্রথম অংশে জুমলা ফেলিয়া এনশায়া এবং দ্বিতীয় অংশে জুমলা এসমিয়া খবরিয়া। এ রকম দু'টি ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সংযোগ (আতফ) শুদ্ধ হতে পারে না।

এই দলীলে তারা 'ওয়া' অক্ষরটিকে অবস্থা জ্ঞাপক ওয়া সাব্যস্ত করে আয়াতের অর্থ করেনঃ "যে পশু আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা খেওনা এই অবস্থায় যে, তা ফিসকের আওতায় পড়ে যায়।" অতপর সূরা আনআমের ১৪৫ নম্বর আয়াতের সাহায্যে তারা 'ফিসক'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাতে বলা হয়েছেঃ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (অথবা ফিসক যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে)। এভাবে তারা আয়াতের এই তাৎপর্য নির্ধারণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশতই কেবল হারাম। আল্লাহর নাম না নেয়াতে তা হারাম সাব্যস্ত হয় না।

কিন্তু এটা খুবই দুর্বল ব্যাখ্যা। এর ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

এক, আয়াতের অর্থ এতটা হালকা নয় যা এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বানানো হয়েছে। আয়াতটি পাঠ করার সাথে সাথেই উল্লেখিত অর্থের দিকে মন নিজে নিজে ধাবিত হয় না। অবশ্য কেউ যদি প্রথমেই এই এরাদা করে নেয় যে, তাসমিয়া ছাড়া যবেহকৃত প্রাণী হালাল করতেই হবে-তাহলে সহজেই আয়াতের এই অর্থ করা যেতে পারে।

দুই, জুমলা ফেলিয়া এনশায়ার ওপর জুমলা এসমিয়া খবরিয়াকে আতফ করা যদি বালাগাতের পরিপন্থী হয়, তাহলে বাক্যের হালিয়া অংশের মধ্যে 'ইন্না' এবং লাম তাকীদের ব্যবহারই বা কোন্ বালাগাত অনুযায়ী হয়েছে? শাফিঈরা যা বলেন, আল্লাহ তাআলার বক্তব্য যদি তাই হত তাহলে তিনি هو فسق বলতেন, وانه لفسق বলতেন না।

তিন, দলীল নেয়ার জোশে জুমলা ফেলিয়া এনশায়ার ওপর জুমলা এসমিয়া খবরিয়ার আতফকে বালাগাতের পরিপন্থী বলতে গিয়ে তারা পূর্ণ আয়াতটি মনে রাখতে পারেননি। আয়াতটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ـ

"আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তার গোশত খেওনা। এটা ফাসেকী কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সংগী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নের উন্মেষ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।" (সূরা আনআমঃ ১২১)।

এই আয়াতে وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ –এর ওয়া অক্ষরকে যদি ওয়া হালিয়াও ধরে নেয়া হয়, তবে জুমলা ফেলিয়া এনশায়ার ওপর জুমলা এসমিয়া খবরিয়াকে আতফ করেও বাঁচা যাচ্ছেনা। কেননা এর পরের বাক্যাংশ নিশ্চিতরূপে জুমলায়ে খবরিয়া। তাকে কোন মতেই হালিয়া বানানো যেতে পারে না এবং এর আতফ নিশ্চিতরূপে জুমলা এনশায়ার ওপর পড়ছে।

তাছাড়া কুরআন মজীদে এ ধরনের বাক্যরীতির উদাহরণ এই একটাই নয়। বহু স্থানে এভাবে জুমলা ফেলিয়া এনশায়ার ওপর জুমলা এসমিয়া খবরিয়াকে আতফ করা হয়েছে। যেমনঃ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور آیت ۴)

"অতএব তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করনা। তারা ফাসেক" (নূর ঃ ৪)।

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة آیت ۲۲۱)

"তোমরা মুশরিক নারীদের কখনো বিয়ে করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী একটি মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষা অনেক ভাল যদিও শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাক। তোমরা নিজেদের কন্যাদের মুশরিক পুরুষদের নিকট বিয়ে দিওনা –যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চ বংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল। যদিও এই ব্যক্তিকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাক"

(সূরা বাকারাঃ ২২১)।

এখন নিজেদের বালাগাতের ওপর পুনর্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন অথবা প্রকাশ্যভাবে বলে দিন কুরআনের বাকরীতি বালাগাতের পরিপন্থী। এটা এজন্য যে, কুরআনের যেসব জায়গায় জুমলা ফেলিয়া এনশায়া এবং জুমলা এসমিয়া খবরিয়ার মাঝখানে 'ওয়া' অক্ষর এসেছে সেখানে আতফকে হালিয়া বানানো সম্ভব নয়।

চার, উল্লেখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় "সেই জন্তু খেওনা যা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, এই অবস্থায় যে, নিশ্চিতরূপে তা ফিসক হয়ে গেছে, কেননা তা যবেহ করার সময় গাইরুল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে–এই পশুকে হারাম করাই যদি আসল উদ্দেশ্য হত যা গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ কি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায় না? এ অবস্থায়–যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা খেওনা,—এরূপ বলার মূলত কোন অর্থই হয় না। এর পরিবর্তে যে জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে, তার গোশত খেওনা——শুধু এতটুকু বললেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একথার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করতে পারে যে, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলার শেষ পর্যন্ত কি প্রয়োজন ছিল?

পাঁচ, যদি 'ওয়া' অক্ষরকে حالیہ ও মেনে নেয়া হয় তাহলে وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ –এর ব্যাখ্যা এক দূরবর্তী আয়াতের অংশ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ – এর মাধ্যমে করার কোন কারণ বর্তমান নেই। অবশেষে আমরা এই আয়াতের 'ফিসক' শব্দকে আভিধানিক অর্থে কেন ব্যবহার করবনা? শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'নাফরমানী', আনুগত্য

থেকে সরে দাঁড়ানো।" এক্ষেত্রে আয়াতের সহজ সরল অর্থ দাঁড়ায়ঃ যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার গোশত খেওনা, কেননা তা ফিস্ক (অর্থাৎ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা জেনেবুঝে হুকুমের পরিপন্থী কাজ করার ওপরই ফিসক শব্দের প্রয়োগ হয়। ভুলবশতঃ হুকুম পরিত্যক্ত হলে সে ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রযোজ্য হয়না)। এই ব্যাখ্যা শাফিঈদের ব্যাখ্যার ওপর অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। কারণ একদিকে এই ব্যাখ্যা কুরআনের এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরদিকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের একটা পূর্ণ অংশ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه অর্থহীন হয়ে পড়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

শাফিঈ মাযহাবের লোকেরা নিজেদের মতের সমর্থনে দ্বিতীয় যে দলীল পেশ করে থাকেন তা এই যে, একদল লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, বাইরের কিছু সংখ্যক লোক (যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে) আমাদের এখানে গোশত বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। আমাদের জানা নেই, তারা পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কিনা, আমরা কি এই গোশত খেতে পারি? রসূলুল্লাহ (স) এর জবাবে বলেন, سموا عليه انتم وكلوا তোমারা নিজেরা এর ওপর আল্লাহর নাম লও এবং খাও।" (এই হাদীসটি বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে)।

এই হাদীস থেকে শাফিঈগণ এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবেহ করার সময় তাসমিয়া বলা ওয়াজিব নয়, কেননা তা যদি ওয়াজিব হত তাহলে রসূলুল্লাহ (স) সন্দেহের ক্ষেত্রে এই গোশত খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

কিন্তু মূলত এ হাদীসও শাফিঈদের দাবীর বিরুদ্ধেই যায়। এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তাসমিয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং জ্ঞাত বিষয় ছিল। একারণেই নওমুসলিমরা গ্রাম থেকে গোশত নিয়ে আসলে সাহাবাগণ এই গোশতের বিধান সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে আসেন। তাসমিয়া যদি বাধ্যতামূলক না হত তাহলে এটা জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রশ্নই বা কেন উঠল। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তাও এই মতকে শক্তিশালী করে। তাঁদের ধারণা যদি সঠিক না হত এবং গোশত হালাল-হারাম হওয়ার

ব্যাপারে তাসমিয়া পড়া বা না পড়ায় মূলত কোন প্রভাব না থাকত তাহলে রসূলুল্লাহ (স) তাদের সরাসরি বলে দিতেন, যবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তাসমিয়া শর্ত নয়। তোমরা যে কোন ধরনের গোশত খেতে পার-যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হোক বা না হোক। কিন্তু এর পরিবর্তে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা খেয়ে নাও।

এই কথার যুক্তিসম্মত অর্থ যা একজন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকের বুঝে আসতে পারে তা হচ্ছেঃ প্রথমত মুসলমানদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত সম্পর্কে তোমাদের বুঝা উচিত যে, তা যথারীতি যবেহ করা হয়ে থাকবে এবং নিশ্চিন্তে তা খেয়ে নেয়া উচিত। কিন্তু তোমাদের মনে যদি সংশয় থেকেই যায় তাহলে এটা দূর করার জন্য তোমরা নিজেরা বিসমিল্লাহ পড়ে নাও। প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানদের প্রতিটি যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে যা শহর এবং গ্রামের দোকানসমূহে পাওয়া যায়–মানুষ কি করে তা অনুসন্ধান করে বেড়াতে পারে এবং শরীআত কি করে তাদের এটা যাচাই করার জন্য বাধ্য করে যে, সে কি হালাল জন্তু যবেহ করে নিয়ে এসেছে না হারাম জন্তু? যবেহ করেছে কি করেনি? যবেহকারী নও মুসলিম না পুরাতন মুসলমান? সে যবেহ সম্পর্কিত শরীআতের যাবতীয় নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত কিনা?

স্থূল দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রতিটি জিসিনকে সঠিকই মনে করা উচিত। তবে তা ভ্রান্ত হওয়ার কোন প্রমাণ সামনে এসে গেলে ভিন্ন কথা। প্রমাণ ছাড়া যে সন্দেহ মনের মধ্যে সৃষ্টি হবে একে কোন জিনিস বর্জন করার কারণে পরিণত করার পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে এ ধরনের সন্দেহ দূর করে দেয়া উচিত। উল্লেখিত হাদীস থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়। তাসমিয়া বাধ্যতামূলক না হওয়ার কোন দলীল এ হাদীসে নেই।

শাফিঈগণ এক তাবিঈর মুরসাল রিওয়ায়াতের মাধ্যমে অনুরূপ দুর্বল দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ 'মারাসীলে' নকল করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر انه ان ذكر
لم يذكر الا اسم الله،

"মুসলমানদের যবেহকৃত প্রাণী হালাল, সে আল্লাহর নাম নিক বা না নিক। সে যদি নাম নেয় তাহলে পরিষ্কার কথা হচ্ছে সে আল্লাহর নামই নেবে।"

প্রথমত এ হাদীস একজন অখ্যাত তাবিঈর মুরসাল রিওয়ায়াত। বিভিন্ন আয়াত এবং মরফু ও মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণিত হাদীসমূহের মাধ্যমে যে জিনিস বাধ্যতামূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে ঐচ্ছিক প্রমাণ করার মত ওজন এই হাদীসের কখনো হতে পারেনা। তাছাড়া এটাও দেখার বিষয় যে, এই বর্ণনাটি যদি চূড়ান্তভাবে সহীহও হয়, তারপরও বাস্তবিকই কি এর দ্বারা তাসমিয়া বাধ্যতামূলক না হওয়া প্রমাণিত হয়? সর্বাধিক যে কথা এ হাদীস থেকে প্রকাশ পায় তা শুধু এতটুকুই যে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহর নাম নেয়া ছাড়াই পশু যবেহ করে বসে, তাহলে এটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাসমিয়া পরিত্যক্ত হয়েছে না বলে বরং ভুলবশতঃ তাসমিয়া পরিত্যক্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা উচিত। এবং এটাই মনে করা উচিত যে, যদি সে যবেহ করার সময় নাম নিত তাহলে আল্লাহর নামই উচ্চারণ করত, গাইরুল্লাহর নাম নয়। এর ভিত্তিতে তার যবেহকৃত জন্তুকে হালাল মনে করে খেয়ে নেবে।

যেসব লোক যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার মোটেই সমর্থক নয় এবং যাদের জীবনদর্শনও এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী– তাদের যবেহকৃত প্রাণীও মুসলমানদের জন্য হালাল হওয়া এবং যবেহ করার সময় মূলতই খোদার নাম নেয়া জরুরী নয়–উল্লেখিত হাদীস থেকে এরূপ বক্তব্য কি করে বের করা যেতে পারে? এ হাদীসের বক্তব্য নিয়ে যতই টানাহেঁচড়া করা হোক না কেন–তা থেকে উল্লেখিত ধরনের তাৎপর্য বের করার কোনই সুযোগ নেই।

শাফিঈ মাযহাবের ফিকহবিদগণ তাসমিয়াকে 'বাধ্যতামূলক নয়' প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন –তার সমস্ত পূঁজি হচ্ছে এই।

যদি কোন ব্যক্তি তাকলীদের শপথ করে বসে যায়, তাহলে তার পক্ষেই এসব যুক্তি প্রমাণকে অটল মনে করা সম্ভব। কিন্তু আমার বুঝে আসেনা– যে ব্যক্তি এসব যুক্তির পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই করবে সে কি কখনো এটা অনুভব না করে থাকতে পারে যে, তাসমিয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার বিপক্ষে এগুলো কত হালকা প্রমাণ?

অতএব কোন পশুর গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে কুরআন এবং সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে যেসব শর্ত প্রমাণিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. তা এমন জিনিস হবে না যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সরাসরিভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

২. এগুলোর তাযকিয়া (যবেহ) করা হয়েছে।

৩. তা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।

যে গোশতের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত পূরণ না হবে তা তাইয়্যেবাতের (পবিত্র) বাইরে এবং খাবায়েসের (অপবিত্র জিনিস) অন্তর্ভুক্ত। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য তার ব্যবহার জায়েয নয়।

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যবীহা প্রসংগ

এখন দেখার বিষয় হচ্ছে বিশেষভাবে আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীস থেকে কি হুকুম প্রমাণিত হয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ - (المائدة : ٥)

"আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিস হালাল করে দেয়া হল। আহলে কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল" (সূরা মায়েদাঃ ৫)।

এই আয়াতের শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবদের খাদ্য ভান্ডারের যেসব খাবার আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে–তা কেবল পবিত্র খাবারের অন্তর্ভুক্ত জিনিসগুলো। আমাদের জন্য যেসব জিনিস কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসসমূহের দৃষ্টিতে খাবায়েস (নাপাক), যেগুলো আমরা নিজেদের ঘরে অথবা অন্য কোন মুসলমানের ঘরে নিজেরাও খেতে পারিনা এবং অন্যকেও খাওয়াতে পারিনা সেসব জিনিস যখন খৃষ্টান অথবা ইহুদীদের খাবার টেবিলে আমাদের সামনে রাখা হবে, তখন তা আমাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে–আয়াতের অর্থ তা নয় এবং তা হতেও পারে না। এই সহজ সরল এবং পরিষ্কার ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে যদি কোন ব্যক্তি ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করতে চায় তাহলে সে সর্বাধিক চারটি কথা বলতে পারেঃ

একঃ গোশত হালাল অথবা হারাম হওয়া সম্পর্কে সূরা নাহল, সূরা আনআম, সূরা বাকারা এবং স্বয়ং এই সূরা মায়েদায় যেসব আয়াত রয়েছে

তা সবই উল্লেখিত আয়াতটির দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অন্য কথায়, কুরআনে এটা এমন এক আয়াত এসে গেছে যা কেবল আকস্মিক আঘাতে বা দুর্ঘটনায় নিহত প্রাণীই নয়, বরং মৃতজীব, শূকর, রক্ত, গাইরুল্লাহর জন্য মানত সব কিছুকেই সাধারণভাবে হালাল করে দিয়েছে। কিন্তু এই রহিত করণের জন্য কিয়ামত পর্যন্তও কোন শরঈ অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করা সম্ভ হবে না। এই দাবীর অযথার্থতা সম্পর্কে সর্বাধিক পরিষ্কার প্রমাণ এই যে, গোশত সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত তিনটি শর্ত স্বয়ং এই সূরা মায়েদায় এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আয়াতের সাথেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা বলতে পারে যে, একই বাক্যের পরপর তিনটি সংযুক্ত অংশের মধ্য থেকে শেষ অংশটি প্রথম দুটি বাক্যাংশের রহিতকারী হয়ে থাকে?

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা যায় যে, এই আয়াত কেবল তাযকিয়া এবং তাসমিয়াকে মানসূখ করেছে, শূকর, মৃতজীব, রক্ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম হওয়ার হুকুম মানসূখ করেনি। কিন্তু আমাদের জানা নেই, এই দুই ধরনের নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এবং এদের একটির মানসূখ হওয়া ও অপরটি বহাল থাকার ক্ষেত্রে শুধু একটা মৌখিক দাবী ছাড়া কোন দলীল কারো কাছে মওজুদ আছে কি? যদি কারো কাছে এরূপ কোন প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে বিসমিল্লাহ বলে তা পেশ করুন।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এই করা যেতে পারে যে, এই আয়াত মুসলমানদের খাদ্যসামগ্রী এবং আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। মুসলমানদের খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত শর্তগুলো বহাল থাকবে, কিন্তু আহলে কিতাবদের খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে এসব শর্ত অবশিষ্ট থাকবে না এবং তারা আমাদের সামনে যে খাবারই পরিবেশন করবে তা স্বাধীনভাবে খেয়ে নিতে পারব।

এই ব্যাখ্যার সমর্থনে বড় জোর যে দলীল পেশ করা যেতে পারে তা কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানতেন আহলে কিতাবরা কি খায়। অতএব তিনি এটা জানা সত্বেও যখন আমাদেরকে তাদের সেখানে

আহার করার অনুমতি দিয়েছেন– তার অর্থ এই যে, তারা যা কিছুই খায় তা সবই আমরাও তাদের সেখানে খেতে পারি। চাই তা শূকর হোক, অথবা মৃতজীব, অথবা গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা জন্তু, অথবা আকস্মিক আঘাতে মরে যাওয়া প্রাণীই হোক।

কিন্তু এই দলীলের শিকড় স্বয়ং সেই আয়াতই কেটে দিচ্ছে যে আয়াত থেকে এ দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। এ আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে– আহলে কিতাবদের ওখানে তোমরা কেবল পাক জিনিসগুলোই খেতে পার। তাইয়্যেবাত (পাক পবিত্র) শব্দটিকে অস্পষ্ট থাকতেও দেয়া হয়নি, বরং পূর্বের দুটি বৃহৎ আয়াতে খোলাখুলিভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাইয়্যেবাত কি জিনিস।

চতুর্থ ব্যাখ্যা এই করা যেতে পারে যে, আহলে কিতাবদের এখানে কেবল শূকর খাওয়া যাবেনা, বাকি সব কিছুই খাওয়া যাবে। অথবা শূকর, মৃতজীব, রক্ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা জিনিস আমরা খেতে পারবনা, কিন্তু তাযকিয়া (যবেহ) এবং তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) ছাড়া যে গোশত পরিবেশন করা হয় তা আমরা খেতে পারি।

কিন্তু দুই নম্বর ব্যাখ্যার মত এটাও একটা যুক্তিপ্রমাণ বিহীন দাবী। কোন বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা শরীআত ভিত্তিক প্রমাণ এ ব্যাপারে পেশ করা যেতে পারে না যে, কুরআনের নির্দেশের মধ্যে এই পার্থক্য কিসের ভিত্তিতে করা হয় এবং আহলে কিতাবদের খাবার আসরে একটি নির্দেশ কেন বহাল থাকে এবং দ্বিতীয়টি কেন প্রত্যাহৃত হয়? যদি এই পার্থক্য এবং ব্যতিক্রমের সপক্ষে কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে বলে দেয়া হোক তা কোন্ স্থান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে? যদি হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে কোন্ হাদীস থেকে? যদি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল এর ভিত্তি হয়ে থাকে তাহলে তাও পেশ করা হোক।

আহলে কিতাবদের যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে ফিকহবিদদের অভিমত

এই প্রসঙ্গে হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাবের মত এই যে, আমাদের নিজেদের এখানে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাতে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে– আহলে কিতাবদের ওখানেও আমাদের খাওয়া-

দাওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক একই শর্ত আরোপিত হবে। তাযকিয়া এবং তাসমিয়া পরিত্যাজ্য কোন গোশত আমরা নিজেদের এখানেও খেতে পারবনা এবং ইহূদী–খৃষ্টানদের ওখানেও খেতে পারব না (আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা, ১ম খন্ড, পৃ. ৭২৬–৩০)।

শাফিঈগণ বলেন, ইহূদী এবং খৃষ্টানরা যদি গায়ারুল্লাহর নামে যবেহ করে, তাহলে এটা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করে, তাহলে তাদের এই যবেহকৃত প্রাণী আমরা খেতে পারি। কেননা যবেহ করার সময় তাসমিয়া পাঠ করা ওয়াজিব নয়, মুসলমানদের জন্যও নয় এবং কিতাবধারীদের জন্যও নয়–(ঐ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩)। এই অভিমতের দুর্বলতা আমরা উপরে প্রমাণ করে এসেছি। এজন্য এর ওপর পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

মালেকীগণ যদিও যবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তাসমিয়াকে শর্ত হিসাবে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তারা বলেন, আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রজোয্য নয়। তারা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম না নিলেও তাদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল (ঐ, ২য় খন্ড, পৃ. ২২)। এই মতের সমর্থনে শুধু এই দলীল পেশ করা হয় যে, খাইবারের যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহূদী নারীর পাঠানো গোশত খেয়েছিলেন। এটা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছিল কি না তা তিনি জিজ্ঞেস করেননি।

কিন্তু এই ঘটনা যদি আহলে কিতাবদের তাসমিয়ার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম করার দলীল হতে পারতো–তা কেবল এই অবস্থায় যে, যখন এ কথা প্রমাণ করা যেত যে, ঐ যুগে আরবের ইহূদীরা আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করত এবং রসূলুল্লাহ (স) তা জানা সত্ত্বেও তাদের গোশত খেয়ে নিয়েছেন। তিনি ঐ গোশত খাওয়ার সময় তাসমিয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলেননি–শুধু এতটুক কথা তাসমিয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে আহলে কিতাবদের ব্যতিক্রম হওয়ার দলীল হতে পারে না। এও সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর যুগের ইহূদীদের সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল যে, তারা আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করে থাকে। এজন্যই তিনি নির্দ্বিধায় তাদের নিয়ে আসা গোশত খেয়ে নিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা)–র বক্তব্য ছিল এই যে, طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ لَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ

আয়াতকে মানসূখ করে দিয়েছে এবং আহলে কিতাবদেরকে এই হুকুম থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাহী)। কিন্তু এটা ইবনে আব্বাস (রা)–র নিজস্ব ব্যাখ্যা, এটা কোন মরফু হাদীস নয়। এটা ইবনে আব্বাসের একক মত। অপর কোন সাহাবী এই ব্যাখ্যায় তাঁর সহগামী হননি। তাছাড়া তিনি এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নির্দেশ করেননি যে, এই আয়াতটি ঐ আয়াতকে কেন মানসূখ করল এবং শুধু ঐ আয়াতটি মানসূখ করেই কেন থেমে গেল, পানাহার সম্পর্কিত অন্য সব শর্ত কেন মানসূখ করল না?

আতা, আওযাঈ, মাকহূল এবং লাইস ইবনে সা'দের মত এই যে, উল্লেখিত আয়াত مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা প্রাণী হালাল করে দিয়েছে। আতা বলেন, আহলে কিতাবদের এখানে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা প্রাণী খেতে পারি। আওযাঈ বলেন, তোমরা যদি নিজ কানেও শুনে থাকে যে, কোন খৃষ্টান ঈসা মসীহের নামে শিকারের কুকুর ছেড়েছে–তাহলে এর হত্যা করা শিকার খেয়ে নাও। মাকহূল বলেন, খৃষ্টানরা নিজেদের গীর্জায় অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে পশু যবেহ করে থাকে–তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই (আহকামুল কুরআন,আবু বাক্‌র জাস্‌সাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫)।

কিন্তু এতবড় কথার দলীল কেবল এটুকুই যে, আহলে কিতাবগণ গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে–তা আল্লাহ তাআলার জানা ছিল। এরপরও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের খাবার তোমাদের জন্য হালাল। অথচ আল্লাহ তাআলার এও তো জানা ছিল যে, আহলে কিতাবদের মধ্যে খৃষ্টানরা শূকর খায় এবং মদ পান করে। তাহলে ঐ আয়াত থেকে তাদের ওখানে মুসলমানদের শূকর খাওয়া এবং মদ পান করা হালাল হওয়ার নির্দেশ কেন বের করা যাবেনা?

উল্লেখিত মাযহাবসমূহের মধ্যে আমাদের মতে কেবল হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাবের মতই সহীহ এবং শক্তিশালী। অবশিষ্ট মতগুলোর মধ্যে কোন মত যদি কেউ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে নিজের দায়িত্বেই তা করবে। কিন্তু উপরের আলোচনায় যেমন দেখানো হয়েছে যে, উল্লেখিত কারণ এবং দলীলগুলো এতই দুর্বল যে, তার ভিত্তিতে কোন হারামকে হালাল এবং

কোন ওয়াজিবকে বাধ্যতামূলক নয় বলে প্রমাণ করা খুবই কষ্টকর। এজন্য আমি কোন খোদাভীরু ব্যক্তিকে এই পরামর্শ দিতে পারি না যে, সে উল্লেখিত মতামতগুলোর কোন একটির আশ্রয় নিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাধ্যমে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া শুরু করে দেবে। পরিশেষে দু'টি কথার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন রয়েছেঃ

একঃ কোন কোন সময় ছোট প্রাণী- যেমন মোরগ, কবুতর ইত্যাদি যবেহ করার সময় সামান্য অসতর্কতার কারণে মাথা কেটে ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একদল ফিক্‌হবিদ বলেছেন, এই ধরনের যবেহকৃত প্রাণী খেতে কোন দোষ নেই। এখন এই কথাটাকে ভিত্তি বানিয়ে বর্তমান কালের কোন কোন আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, যেখানে সমস্ত পশু যবেহ করার পন্থা এই হয় যে, একটি মেশিন একই আঘাতে সবগুলো পশুর মাথা কেটে নিক্ষেপ করে-- সেখানেও তাযকিয়ার শর্ত পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু ফিক্‌হবিদদের এই মতকে দলীলের উৎস বানিয়ে তা থেকে এমন নির্দেশ বের করা, যা সরাসরি কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নির্দেশের পরিবর্তন করে দেয়-- তা কোন সঠিক পন্থা নয়। তাযকিয়া সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ আমরা উপরে উল্লেখ করে এসেছি এবং যেসব নসের উপর এই নির্দেশের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাও উল্লেখ করেছি। এখন এটা কি করে জায়েয হতে পারে যে, কতিপয় ফিক্‌হবিদ যদি কখনো অনিচ্ছায় কোন নির্দেশের পরিপন্থী ঘটনা ঘটে যাওয়ার ক্ষেত্রে লোকদের কোন সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটাকে মৌলিক আইন হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং তাযকিয়া সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ রহিত করে দেয়া হবে?

দুই ঃ দ্বিতীয় কথা এই যে, ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, এবং বিলকুল ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমান এবং আহলে কিতাবদের প্রতিটি যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে এরূপ খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন নেই যে, তা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে কিনা। অবশ্য যদি ইতিবাচকভাবে জানা যায় যে, কোন পশু যবেহ করবার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাহলে এটা খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ। এই মাসআলার ভিত্তিতে মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে গোশত পাওয়া যায় তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার কি প্রয়োজন আছে? আহলে কিতাবরাই তো যবেহ করেছে। তা তোমরা নিশ্চিন্তে খেয়ে নাও-যেভাবে মুসলিম দেশসমূহে

মুসলমান কসাইদের কাছ থেকে গোশত খরিদ করে নির্দ্বিধায় খেয়ে থাক। কিন্তু একথা কেবল সেই অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে যখন আমরা আহলে কিতাবদের কোন দল অথবা তাদের কোন জনবসতি সম্পর্কে জানতে পারবো যে, তারা নীতিগতভাবে এবং আকীদাগতভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করার পক্ষপাতী। কিন্তু যেসব লোকের সম্পর্কে আমরা জানি যে, আদতেই তারা হারাম-হালালের সীমারেখার কোন সমর্থনই করেনা এবং তারা নীতিগতভাবেও এটা স্বীকার করেনা যে, পশু হালাল বা হারাম হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ অথবা গাইরুল্লাহর নাম নেয়া বা না নেয়ার কোন দখল আছে-তাদের যবেহ করা জন্তু নিশ্চিত মনে খেয়ে নেয়ার পেছনে শেষ পর্যন্ত কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে?

তরজমানুল কুরআন
এপ্রিল ১৯৫৯

মৌলিকমানবাধিকার

(এটা মূলত একটা বক্তৃতা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লাহোরের রোটারী ক্লাবে এই বক্তৃতা দেন। মাওলানা খলীল আহমাদ হামেদী তা লিপিবদ্ধ করেন)।

মৌলিক অধিকার কোন নতুন ধারণা নয়

আমাদের মুসলমানদের সম্পর্কে বলা যায়, "মৌলিক মানবাধিকার" মতবাদ আমাদের জন্য কোন নতুন জিনিস নয়। হতে পারে অন্যদের দৃষ্টিতে এই অধিকারের ইতিহাস সম্মিলিত জাতিসংঘের মহাসনদ থেকে, অথবা ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কারটা (Magna Carta) থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এই মতবাদের সূচনা অনেক পূর্বে হয়েছে। এখানে আমি মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আলোকপাত করার পূর্বে "মানবীয় অধিকার" মতবাদের সূচনা কি করে হল তা সংক্ষেপে বলে দেয়া জরুরী মনে করি।

মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠছে কেন?

দুনিয়াতে মানুষই এমন এক জীব যার সম্পর্কে স্বয়ং মানুষের মধ্যেই বারবার প্রশ্ন উঠছে তার মৌলিক অধিকার কি? বাস্তবিকপক্ষে এ এক আশ্চর্য ধরনের কথা। মানবজাতি ছাড়া দুনিয়ায় বসবাসরত অন্যান্য মাখলুকাতের অধিকার স্বয়ং প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তারা তা ভোগ করে যাচ্ছে। এজন্য তাদেরকে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়না। কিন্তু মানুষই এমন মাখলুক যার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, তার অধিকারসমূহ কি? এবং তাদের এ অধিকার নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনুরূপভাবে এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই বিশ্বে এমন কোন প্রকার সৃষ্টি নেই যা তার নিজস্ব শ্রেণীভুক্ত অপর সদস্যের সাথে সেই ব্যবহার করছে যা মানুষ তার সমগোত্রের সাথে করছে। বরং আমরা তো দেখছি জীব-জন্তুর কোন শ্রেণী এমন নেই যা অপর শ্রেণীর ওপর নিছক আনন্দ উপভোগ অথবা প্রভুত্ব করার জন্য আক্রমণ করছে।

প্রাকৃতিক বিধান যদিও এক ধরনের জীবকে অপর ধরনের জীবের খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে কিন্তু তা কেবল খাদ্যের সীমা পর্যন্তই হস্তক্ষেপ করে। এমন কোন হিংস্র জন্তু নেই যা খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া অথবা এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়ার পর বিনা কারণে অন্যান্য প্রাণী হত্যা করে যাচ্ছে। মানুষ তার সমগোত্রীয়দের সাথে যে আচরণ করছে জীব-জন্তুর মধ্যে কোন প্রাণীই তার সমগোত্রীয়দের সাথে তদ্রূপ আচরণ করে না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এটা খুব সম্ভব তারই ফল। মানুষ দুনিয়াতে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ত জ্ঞান ও আবিষ্কার শক্তিরই চমৎকারিত্ব।

বাঘেরা আজ পর্যন্ত কোন সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেনি। কোন কুকুর আজ পর্যন্ত অন্যান্য কুকুরগুলোকে গোলামে পরিণত করেনি। কোন ব্যাঙ আজ পর্যন্ত অন্য ব্যাঙদের বাকশক্তি হরণ করেনি। কেবল মানুষই যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করে তখন নিজের সগোত্রীয়দের ওপরই জুলুম শুরু করে দেয়। দুনিয়াতে মানব জাতির গোড়াপত্তন হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত পশুরা এতো মানুষ হত্যা করেনি যতগুলো মানুষের জীবন কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষে ছিনিয়ে নিয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ অন্য মানুষের অধিকারের কোন তোয়াক্কা করে না। এ ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ তাআলাই মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তার নবী রসূলদের মাধ্যমে মানবীয় অধিকার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করেছেন। মানবজাতির অধিকার নির্ধারণকারী মূলতঃ মানুষের স্রষ্টাই হতে পারেন। সুতরাং মহান স্রষ্টাই মানুষের অধিকারসমূহ বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশ

মানবাধিকারের ইসলামী মেনিফেষ্টোর দফাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বর্তমান যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

১. ইংল্যান্ডের রাজা জন ১২১৫ খৃষ্টাব্দে যে ম্যাগনা কারটা জারি করেন তা মূলতঃ ছিল তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ফল। রাজা এবং পারিষদবর্গের মধ্যে এর মর্যাদা ছিল একটি চুক্তিপত্রের সমতুল্য। অধিকন্তু তা পারিষদবর্গের

স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের অধিকারের কোন প্রশ্ন এখানে ছিল না। পরবর্তীকালে লোকেরা এর মধ্যে এমন অর্থ আবিষ্কার করে যে, তা এই সনদ প্রণয়নকারীদের সামনে পাঠ করা হলে তারা হয়রান হয়ে যেত। সপ্তদশ শতকের পেশাদার আইনবিদরা তার মধ্যে আবিষ্কার করল যে, বিচার বিভাগের অযথা কয়েদ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা এবং কর আঁরোপ করার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অধিকার ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের এই সনদের মধ্যে দেয়া হয়েছে।

২. টম. পেনের (Paine Thomas-1737-1809) 'মানবাধিকার' (Right of man) নামক পুস্তিকা পাশ্চাত্যবাসীদের চিন্তাধারায় ব্যাপক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। তার এই পুস্তিকা (১৭৯১) পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মানবাধিকারের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যক্তি আসমানী কোন ধর্মের সমর্থক ছিলেন না। আর তার যুগটাও ছিল আসমানী ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ। এজন্য পাশ্চাত্যের জনগণ মনে করে বসল আসমানী ধর্মগুলোতে মানবাধিকার সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই।

৩. ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে "মানবাধিকার ঘোষণা" (Declaration of the Rights of man) যা ১৭৮৯ সালে প্রকাশ পায়। এটা অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন এবং বিশেষ করে রুশোর "সামাজিক আচরণ তত্ত্বের" (Social contact theory) ফল। এতে জাতীয় সরকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মালিকানার স্বাভাবিক অধিকার সমর্থন করা হয়েছে। এতে ভোট দানের অধিকার, আইন প্রণয়ন এবং কর আরোপ করার এখতিয়ারের ওপর জনমতের নিয়ন্ত্রণ, বিচার বিভাগ কর্তৃক অপরাধের কারণ অনুসন্ধান (Trail by Jury) ও পর্যালোচনা ইত্যাদির সমর্থন করা হয়েছে।

ফ্রান্সের আইন পরিষদ বিপ্লব যুগে মানবাধিকারের উক্ত ঘোষণাপত্র এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেছিল যে, যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে তখন এটা তার ভূমিকায় সংযোজন করা হবে এবং গোটা সংবিধানে এর ভাবধারা ও প্রাণসত্তাকে উজ্জীবিত রাখা হবে।

৪. আমেরিকার (USA) সংবিধানের দশটি সংশোধনীতে বৃটিশ গণতান্ত্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল মানবাধিকারের প্রায় সবগুলো ধারাই গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলো ১৯৪৮ সালে বেগোটা সম্মেলনে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত যে ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী।

৬. জাতিসংঘ (UNO) গণতান্ত্রিক দর্শনের অধীনে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো ইতিবাচক ও সংরক্ষণমূলক অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করে। পরিশেষে তা "মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র" নামে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করে। এতে গণহত্যা বা অন্য যে কোন উপায়ে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধনের চেষ্টাকে (genocide) আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পুনরায় ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণহত্যার প্রতিরোধ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং ১৯৫১ সনের ১২ জানুয়ারী তা কার্যকর হয়। তাতে গণহত্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ কোন জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা এর কোন একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নিম্নে উল্লেখিত যে কোন পন্থা অবলম্বন করাঃ

১. এই ধরনের কোন সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করা।

২. তাদেরকে কঠোর দৈহিক অথবা মানসিক শাস্তি দেয়া।

৩. উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ধরনের কোন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় এমন পরিস্থিতি চাপিয়ে দেয়া যা তাদের দৈহিক অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংসকর হবে।

৪. এই সম্প্রদায়ের বংশধারা রোধ করার জন্য স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. জবরদস্তীমূলকভাবে এই সম্প্রদায়ের সন্তানদের অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানান্তর করা।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর যে "মানবাধিকারের মহাসনদ" পাশ করা হয় তার ভূমিকায় অন্যান্য সংকল্পের সাথে মোটামুটিভাবে এও প্রকাশ করা হয় যে, "মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মানবজাতির মান-সম্মান ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের সমঅধিকারের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য।"

অনন্তর উক্ত ভূমিকায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মানবাধিকারের প্রতি এহতেরাম ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে মৌলিক স্বাধিকার প্রদানের কাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ।"

অনুরূপভাবে উক্ত সনদের ৫৫ ধারায় জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র বলছেঃ "জাতিসংঘ পরিষদ মানবাধিকার এবং সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বব্যাপী সম্মান এবং এর সংরক্ষণে ব্যাপকতা আনয়ন করে।"

এই ঘোষণাপত্রের কোন একটি অংশ নিয়েও কোন দেশের প্রতিনিধিই দ্বিমত পোষণ করেননি। দ্বিমত পোষণ না করার কারণ ছিল এই যে, এটা ছিল সাধারণ মূলনীতিসমূহের ঘোষণা এবং প্রকাশ মাত্র। কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা কারো ওপর আরোপ করা হয়নি। এটা এমন কোন চুক্তি নয় যার ভিত্তিতে স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্রগুলো এর আনুগত্য করতে বাধ্য হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ হতে পারে। তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, এটা একটা মানদন্ড যে পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু কোন কোন দেশ এর সপক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে।

এখন দেখুন এই ঘোষণাপত্রের ছত্রছায়ায় সারা দুনিয়াব্যাপী মানবতার একেবারে প্রাথমিক অধিকারসমূহের নির্বিচার হত্যা চলছে। স্বয়ং সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার দাবীদার এবং দুনিয়ার নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর অভ্যন্তরে মানবাধিকারের নির্বিচার গণহত্যা চলছে। অথচ তারাই এই সনদ পাশ করিয়েছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, (এক) পশ্চিমা জগতের হাতে মানবাধিকারের ধারণার দুই তিন শতাব্দী পূর্বের কোন ইতিহাস নেই। (দুই) আজ যদিও এসব অধিকারের উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু তার পিছনে কোন সনদ (Sanction) এবং কোন কার্যকরকারী শক্তি (Authority) নেই। বরং এটা শুধু চিত্তাকর্ষক অভিলাষ মাত্র। এর বিপরীতে ইসলাম কুরআন মজীদে মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র দিয়েছে এবং যার সংক্ষিপ্তসার নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে ঘোষণা করেছেন তা উল্লেখিত সনদগুলোর তুলনায় অধিক প্রাচীন এবং ঈমান, নৈতিকতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনুসরণ করতে মুসলিম উম্মাহ

একান্তই বাধ্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বাস্তবে তা কার্যকর করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম মানুষকে যেসব অধিকার দান করেছে এখন আমি তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

জীবনের মর্যাদা এবং বাঁচার অধিকার

কুরআন মজীদে দুনিয়ার সর্বপ্রথম হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ছিল মানবজাতির ইতিহাসের সর্বপ্রথম দুর্ঘটনা যাতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবন সংহার করেছে। এ সময় প্রথম বারের মত মানুষকে তাদের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধের শিক্ষা দেয়ার এবং প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। কুরআনে এই ঘটনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۔ (٥-٣٢)

"যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ অথবা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখল সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখল" (সূরা মায়েদা ঃ ৩২)

কুরআন মজীদ উল্লেখিত আয়াতে একটি মাত্র মানুষকে হত্যা করার অপরাধকে গোটা মানব জগতকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ গণ্য করেছে এবং এর বিপরীতে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাকে গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমান গণ্য করেছে। 'আহ্ইয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবিত করা। অন্য কথায় বলা যায়, যে ব্যক্তি মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল সে তাকে জীবন্ত করার কাজ করল। এই প্রচেষ্টাকে সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমতুল্য সৎকাজ বলে গণ্য করা হয়েছে।

এই মূলনীতি থেকে দু'টি বিষয়কে ব্যতিক্রম করা হয়েছেঃ

এক, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তাকে কিসাসের আওতায় মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

দুই, কোন ব্যক্তি জমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে তাকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এসব অবস্থা ছাড়া মানুষের জীবনকে ধ্বংস করা যেতে পারে না।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তার এই নীতিমালা মানবেতিহাসের সূচনা লগ্নেই আল্লাহ তাআলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। মানব জাতি সম্পর্কে এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে, অন্ধকারের মধ্যেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং নিজের সমজাতীয় প্রাণীদের হত্যা করতে করতে কোন এক পর্যায়ে সে চিন্তা করল মানুষ খুন করা উচিত নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সংশয়ের ওপর ভিত্তিশীল। কুরআন আমাদের বলছে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির গোড়াপত্তন থেকেই তাদের পথপ্রদর্শন করে আসছেন। তিনি মানুষকে মানুষের অধিকারের সাথেও যে পরিচয় করিয়েছেন তাও এই পথপ্রদর্শনের মধ্যে শামিল রয়েছে।

অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা

দ্বিতীয় যে কথা কুরআন থেকে জানা যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং রুগ্নদের ওপর কোন অবস্থায়ই হাত উঠানো জায়েয নয়। চাই সে নিজের জাতির হোক অথবা শত্রু পক্ষের। কিন্তু এদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যথায় তাদের ওপর অন্য কোন অবস্থায় হাত তোলা নিষেধ। এই মূলনীতি কেবল নিজের জাতির জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির সাথেই এই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে ব্যাপক পথনির্দেশ দান করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা যখন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন তারা গোটা বাহিনীকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতেনঃ শত্রুদের ওপর আক্রমণকালীন অবস্থায় কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর হাত তোলা যাবে না।

স্ত্রীলোকদের মান সম্ভ্রমের হেফাজত

কুরআন থেকে আমরা আরো একটি মূলনীতি জানতে পারি এবং হাদীসেও তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছেঃ যে কোন অবস্থায় নারীদের সতীত্ব, পবিত্রতা ও মান সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ

যুদ্ধের মাঠে যদি শত্রু পক্ষের কোন নারী সামনে পড়ে যায় তাহলে কোন মুসলিম সৈনিকের জন্য তার গায়ে হাত তোলা জায়েয নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে যেনা ব্যভিচার সাধারণত হারাম তা যে কোন স্ত্রীলোকের সাথেই করা হোক, চাই সে নারী মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম, নিজ সম্প্রদায়ের হোক অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের, মিত্র রাষ্ট্রের হোক অথবা শত্রু রাষ্ট্রের।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

একটি মৌলনীতি হচ্ছে এই যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় খাদ্য দান করাতে হবে, উলংগ ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় কাপড় দিতে হবে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যে কোন অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে, চাই তারা শত্রু হোক অথবা বন্ধু। এটা চিরন্তন (Universal) অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দুশমনদের সাথেও আমরা এই ব্যবহার করব। শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে তাকে ক্ষুধার্ত, উলংগ না রাখা আমাদের জন্য ফরজ। যদি সে আহত অথবা রুগ্ন হয় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার

কুরআন করীমের স্থায়ী নীতি এই যে, মানুষের সাথে আদল ও ইনসাফ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ اعْدِلُوا۟ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (৫:৮)

"কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেন এতটা উত্তেজিত না করে (যার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার কর। বস্তুত খোদাভীতির সাথে এর গভীর নৈকট্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে"

–(সূরা মায়েদাঃ ৮)।

এ আয়াতে ইসলাম এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মানুষ, ব্যক্তি, সমাজ, জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে যে কোন অবস্থায় ইনসাফ করতে হবে। আমরা বন্ধুদের সাথে ন্যায় ইনসাফ করব এবং শত্রুদের ক্ষেত্রে এই নীতি বিসর্জন দেব ইসলামে তা চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ।

সৎ কাজে সহযোগিতা অসৎ কাজে অসহযোগিতা

কুরআন মজীদের নির্ধারিত আরেকটি মূলনীতি হচ্ছেঃ সৎ কাজে এবং অধিকার পৌছে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে হবে এবং খারাপ কাজ ও জুলুমের ক্ষেত্রে কারুরই সহযোগিতা করা যাবে না। নিজের ভাইও যদি খারাপ কাজ করে তবে আমরা তার সহযোগিতা করব না। আর ভাল কাজ যদি দুশমনরাও করে তাহলে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। মহান আল্লাহ বলেনঃ

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"ন্যায় ও খোদাভীতিমূলক কাজে সবাই সহযোগিতা কর এবং যা সীমালংঘনমূলক ও গুনাহের কাজ তাতে কারো সহযোগিতা কর না"
–(সূরা মায়েদাঃ ২)।

'বির' শব্দের অর্থ কেবল সৎকাজই নয়, বরং আরবী ভাষার এ শব্দটি 'হক পৌছে দেয়ার' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে, তাকওয়া ও খোদাভীতির কাজে আমরা প্রত্যেকেরই সহযোগিতা করব। এটা কুরআনের স্থায়ী মূলনীতি।

সমতা

আরো একটি মূলনীতি যা কুরআন মজীদ জোরেসোরে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে সব মানুষ সমান। যদি কারো প্রাধান্য থেকে থাকে তাহলে এটা নির্ধারিত হবে চরিত্র ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানুষ! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে এজন্য বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক খোদাভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত"
–(সূরা হুজুরাতঃ ১৩)।

এ আয়াতে প্রথম কথা বলা হয়েছে, গোটা মানব জাতি একই মূল থেকে উৎসারিত। বংশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য মানব জগতে ভাগাভাগির জন্য মূলত কোন যুক্তিযুক্ত কারণই নয়।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, আমরা এই জাতিগত বন্টন কেবল পরিচয় লাভের জন্য করেছি। অন্য কথায়, এক গোষ্ঠী, এক গোত্রের এবং এক জাতির লোকদের অন্যদের ওপর এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা নিজেদের অধিকারের তালিকা দীর্ঘায়িত করবে এবং অন্যদের তালিকা সংকুচিত করবে। আল্লাহ তাআলা এই যে পার্থক্য করেছেন, পরস্পরের দৈহিক কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন বানিয়েছেন, ভাষায় পার্থক্য রেখেছেন, এসব কিছু গৌরব ও অহংকারের জন্য নয়, বরং পারস্পরিক স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করার জন্যই তা করেছেন। যদি সমস্ত মানুষ একই রকম হত তাহলে পার্থক্য করা যেত না, এদিক থেকে এই বিভক্তি প্রকৃতিগত, কিন্তু অন্যদের অধিকার আত্মসাত করা এবং অনর্থক স্বাতন্ত্রবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সম্মান ও গৌরবের ভিত্তি নৈতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেছেন।

لا فضل لعربي على اعجمى ولا لاعجمى على عربي ولا لاحمر
على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ولا فضل
للانساب-

"কোন অনারবের ওপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন আরবের ওপরও কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। বংশের ভিত্তিতেও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

অর্থাৎ দীনদারী, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়। এমন তো নয় যে, কোন ব্যক্তিকে রূপা দিয়ে, কোন ব্যক্তিকে পাথর দিয়ে আর কোন ব্যক্তিকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, বরং সমস্ত মানুষ এক।[১]

---

১. ফেরাউনী ব্যবস্থাকে কুরআন মজীদ যেসব কারণে বাতিল সাব্যস্ত করেছে তার একটি এই যে; إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ
"নিশ্চয়ই ফেরাউন জমীনের বুকে দুর্বিনীত হয়ে পড়েছিল এবং দেশের জনগণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তাদের একদলকে (বনী ইসরাঈল) সে এতটা দুর্বল করে দিয়েছিল যে....।" (সূরা কাসাসঃ ৪)।

অর্থাৎ, ইসলাম এই নীতির পোষকতা করে না যে, কেন সমাজে মানুষকে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণী অথবা শাসক ও শাসিত শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হবে।

পাপাচার থেকে বাঁচার অধিকার

আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া যাবে না এবং কোন ব্যক্তিকে যদি খারাপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে এই নির্দেশ পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলকও নয় এবং জায়েযও নয়। যদি কোন অফিসার তার অধীনস্থ কর্মচারীকে নাজায়েয কাজ করার নির্দেশ দেয় অথবা কারো ওপর হাত তোলার নির্দেশ দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অধীনস্থ কর্মচারীর জন্য তার উর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালন করা বা তার আনুগত্য করা মোটেই জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق স্রষ্টা যেসব জিনিসকে নাজায়েয ঘোষণা করেছেন এবং অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন–সেগুলো করার জন্য কেউ কাউকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখে না। কোন নির্দেশদাতার জন্যও এরূপ কাজের নির্দেশ দেয়া জায়েয নয় এবং এ ধরনের নির্দেশ পালন করাও কারো পক্ষে জায়েয নয়।

জালেমের আনুগত্য করতে অস্বীকার করার অধিকার

ইসলামের একটি মহান নীতি এই যে, কোন জালেমের আনুগত্য দাবী করার অধিকার নেই। কুরআনে করীমে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)–কে নেতৃপদে নিয়োগ করে বললেনঃ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا "আমি তোমাকে লোকদের ইমাম নিযুক্ত করেছি।" তখন হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে আরজ করলেনঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي "আমার বংশধরদের জন্যও কি এই ওয়াদা?" আল্লাহ তাআলা জবাবে বললেনঃ لا ينال عهدي الظالمين "জালেমদের ক্ষেত্রে আমার এ ধরনের ওয়াদা নেই" (সূরা বাকারাঃ ১২৪)। ইংরেজী ভাষায় Letter of Appointment –এর যে অর্থ এখানে 'আহদুন' শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এর অর্থ নিয়োগপত্র। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'জালেমদের এরূপ কোন নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি যার ভিত্তিতে সে অন্যদের আনুগত্য দাবী করতে পারে।[১০]

---

১. অবাধ ব্যক্তার জন্য এই আয়াত সামনে রাখুন ১- وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (٢٦:١٥١)

٢- وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (١٨:٢٨) ٣- وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (١٦:٣٦)

ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, কোন জালেম ব্যক্তির মুসলমানদের নেতা হওয়ার অধিকার নেই। যদি এরূপ ব্যক্তি নেতা হয়ে যায় তাহলে তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়, তাকে শুধু সহ্য করা যেতে পারে মাত্র।

রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে একটি বড় অধিকার ইসলাম এই নির্দিষ্ট করেছে যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি জাতীয় সরকারের অংশীদার। সবার পরামর্শক্রমে সরকার গঠন হতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

"আল্লাহ তাআলা তাদের অর্থাৎ ঈমানদারদের জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর বুকে খেলাফত দান করবেন" (সূরা নূরঃ ৫৫)। এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আমরা কতিপয় লোককে নয় বরং গোটা জাতিকে খেলাফত দান করব। রাষ্ট্র কোন এক ব্যক্তির বা এক বংশের বা এক শ্রেণীর নয়, বরং গোটা জাতির জন্য এবং সমগ্র জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার গঠনহবে।

কুরআনে বলা হয়েছে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (সূরা শূ'রাঃ ৩৮)। অর্থাৎ "এই রাষ্ট্র পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে"। এ ব্যাপারে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিষ্কার বক্তব্য মওজুদ রয়েছেঃ "মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতিরেকে তাদের ওপর রাজত্ব করার অধিকার কারো নেই। তারা যদি সম্মত হয় তাহলে তাদের ওপর রাজত্ব করা যাবে। আর যদি রাজী না হয় তাহলে তা করা যাবে না। এই নির্দেশের আলোকে ইসলাম একটি 'গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থার নীতি' নির্ধারণ করে।

٤- وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ - (١١: ٥٩) وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (٣: ١٥٩)

অর্থাৎ ১। যারা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই লাগামহীন লোকদের আনুগত্য করনা" (শুআরাঃ ১১৫)। ২। "যে ব্যক্তির দিলকে আমার স্মরণশূন্য করে দিয়েছি তার আনুগত্য করনা"-(কাহ্ফঃ ২৮)। ৩। "তাগুতের বন্দেগী থেকে দূরে থাক" (নাহ্লঃ ৩৬)। ৪। "এবং সেই আদ জাতি যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাঁর রসূলদের অমান্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেক অবাধ্য স্বৈরাচারীর নির্দেশের অনুসরণ করেছিল" (হূদঃ ৫৯)।

এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী আমাদের ওপর রাজতন্ত্র চেপে রয়েছিল। ইসলাম আমাদের এ ধরনের রাজতন্ত্রের অনুমতি দেয়নি। বরং এটা ছিল আমাদের আহাম্মকির ফল।

ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ

ইসলামের একটি মূলনীতি এই যে, ইনসাফ ব্যতিরেকে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, لا يوسر رجل في الاسلام الا بحق - "ইসলামের নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে না।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আদল ও ইনসাফের সেই দর্শনই কায়েম হয় যাকে আধুনিক পরিভাষায় Judicial process of law (বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রণালী) বলা হয়। অর্থাৎ কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে হলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন, প্রকাশ্য আদালতে তার বিচারকার্য পরিচালনা এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া কোন কার্যক্রমের ওপর আদলের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায় না। এতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে, অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে বন্দী করে রাখা ইসলাম অনুমোদন করেনি। ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার এবং বিচার বিভাগের জন্য ইনসাফের দাবী পূর্ণ করা কুরআন অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে।

ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। কুরআন আমাদের সামনে ব্যক্তি মালিকানার চিত্র তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢-١٨٨)

"তোমরা বাতিল পন্থায় একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করনা"

(বাকারাঃ ১৮৮)।

কুরআন, হাদীস এবং ফিক্হ অধ্যয়নে জানা যায়, অপরের সম্পদ ভোগ করার কোন্ কোন্ পন্থা ভ্রান্ত। ইসলাম এসব পন্থা অস্পষ্ট রাখেনি। এই মূলনীতির আলোকে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অবৈধ পন্থায় মাল হস্তগত করা যাবে না। কোন ব্যক্তি বা সরকারের এ অধিকার নেই যে, সে আইন ভংগ করে এবং ইসলামী শরীআত কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত পন্থাসমূহ ব্যতিরেকে কারো মালিকানার ওপর হস্তক্ষেপ করবে।

মানসম্ভ্রমের হেফাজত

মান সম্মান ও ইজ্জত আব্রুর হেফাজত করার মৌলিক অধিকার মানুষের রয়েছে। সূরা হুজুরাতে এই অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা মওজুদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

١- لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ

"তোমাদের একদল অপর দলকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে পারবে না।"

٢- وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ -

"তোমরা একে অপরকে নিকৃষ্ট উপাধিতে ডেকনা।"

٣- وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"একে অপরের দোষ চর্চা করনা।" (আয়াতঃ ১১, ১২)।

অর্থাৎ, মানুষের মান–সম্মানের প্রতি আঘাত করার যতগুলো পন্থা রয়েছে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে কোন ব্যক্তি চাই উপস্থিত থাক বা না থাক–তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা যাবে না, তাকে নিকৃষ্ট উপাধি দেয়া যাবে না, তার ক্ষতি করা যাবে না এবং তার দোষ চর্চা (গীবত) করা যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, কেউ তার ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং হাতের দ্বারা অথবা জবানের দ্বারা তার ওপর কোনরূপ বাড়াবাড়ি করতে পারবে না।

গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার

ইসলামের মৌলিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি লোক ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সূরা নূরে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছেঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا -

"নিজের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ কর না।"

সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছেঃ لَا تَجَسَّسُوا - "গোয়েন্দাগিরি কর না" (২৭ নং আয়াত)। –(১২)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ অন্যের ঘরে উকি মারার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই। যে কোন ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, সে তার নিজের ঘরে অপরের শোরগোল, উকিঝুকি এবং অনুপ্রবেশ থেকে নিরাপদ থাকবে। তার সংসারের শান্তি–

শৃংখলা ও পর্দাপুশিদা রক্ষা করার অধিকার তার রয়েছে। এমনকি কোন ব্যক্তির চিঠিপত্রের ওপর অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করারও অধিকার নেই, পড়া তো দূরের কথা। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার পূর্ণরূপে হেফাজত করে এবং পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দেয় যে, অন্যের ঘরের মধ্যে উকিঝুঁকি মারা যাবে না। কারো ডাক বা চিঠিপত্র দেখা যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, সে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত আছে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় কারো পিছনে অযথা গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামী শরীআতে জায়েয নেই।

জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার

ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি এই যে, যে কোন ব্যক্তি জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার রাখে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (٤:١٤٨)

"মানুষ খারাপ কথা বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা"–(সূরা নিসাঃ ৪৮)।

অর্থাৎ, জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সোচ্চার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বর্তমান যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Expression) বলা হয়, কুরআন তা অন্য পরিভাষায় বর্ণনা করে। কিন্তু দেখুন, তুলনামূলকভাবে কুরআনের দর্শন কত উন্নত। কুরআনের বাণী হচ্ছেঃ "সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা" এবং "অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ" করা কেবল মানুষের অধিকারই নয়, বরং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (٣:١١٠)

"তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম দল যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ"

(সূরা আলে ইমরানঃ ১১০)।

কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং হাদীসের পথনির্দেশ মোতাবেকও মানুষের কর্তব্য হচ্ছেঃ সে লোকদের ভাল কাজ করার কথা বলবে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদের প্রতিরোধ করবে। যদি কোন খারাপ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং এর মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা করা ফরজ। যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর না হয় এবং মূলোৎপাটনের চিন্তা ভাবনা না করা হয় তাহলে উল্টা গুনাহ হবে। ইসলামী সমাজকে পাকপবিত্র রাখা মুসলমানদের ওপর ফরজ। এ ক্ষেত্রে যদি মুসলমানদের কণ্ঠরোধ করা হয় তাহলে এর চেয়ে বড় আর জুলুম হতে পারে না। যদি কেউ ভাল কাজের প্রতিরোধ করে তাহলে সে কেবল একটি মৌলিক অধিকারই হরণ করেনি, বরং একটি ফরজ আদায় করতে বাধা দিচ্ছে। সমাজের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে মানুষের সব সময় এ অধিকার থাকতে হবে। কুরআন মজীদ বনী ইসরাঈল জাতির অধপতনের কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তর মধ্যে একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ـ

"তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখত না-(সূরা মাইদা ঃ ৭৯)।

অর্থাৎ যদি কোন জাতির মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার মত কোন লোক নেই তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতির মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে তা একটি শূন্য ঝুড়ির মত হয়ে যায় যা তুলে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়। এই জাতির আল্লাহর গযবে নিপতিত হওয়ার আর কোন ঘাটতি অবশিষ্ট থাকে না।

বিবেক ও চিন্তা—বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলাম মানব জাতিকে "لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ" "দীনের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই" (বাকারাঃ ২৫৬)-এর মূলনীতি দান করেছে। এর অধীনে সে প্রতিটি মানুষকে কুফর অথবা ঈমান, এর যে কোন একটি পথ অবলম্বন করার এখতিয়ার দিয়েছে। ইসলামে যদি শক্তির প্রয়োগ থেকে থাকে তাহলে দু'টি প্রয়োজনে। এক, ইসলামী ব্যবস্থা, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং দুষ্কৃতি ও বিচ্ছিন্নতার মূলোৎপাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

লক্ষ্য ও আকীদা বিশ্বাসের স্বাধীনতাই ছিল মূল্যবান অধিকার যা অর্জন

করার জন্য মক্কার ১৩ বছরের বিপদ সংকুল যুগে মুসলমানরা মার খেয়ে খেয়ে হকের কলেমা সমুন্নত করেছে। অবশেষে তাদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেই ছেড়েছে। মুসলমানরা তাদের এ অধিকার যেভাবে অর্জন করেছে, অনুরূপভাবে অন্যদের জন্যও এর পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেছে। মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, অথবা কোন জাতিকে নির্যাতন করে করে কালেমা পড়তে বাধ্য করেছে ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত বর্তমান নেই।

ধর্মীয় মানসিক নির্যাতন থেকে সংরক্ষণ

ইসলাম এটা কখনো সমর্থন করে না যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরের বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবহার করবে, একে অপরের ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করবে। কুরআন মজীদে প্রতিটি ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার ধর্মীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "এসব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়া যাদেরকে মাবুদ বানিয়ে ডাকে তোমরা তাদের গালাগালি করনা"–(সূরা আনআমঃ ১০৮)। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা, যৌক্তিক পন্থায় সমালোচনা করা অথবা মতভেদ ব্যক্ত করা তো বাক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মনে কষ্ট দেয়ার জন্য অভদ্র ভাষায় কথা বলা মোটেও সমীচীন নয়।

সভা সংগঠন করার অধিকার

বাক স্বাধীনতার দার্শনিক ফলশ্রুতিতেই সভা সমিতি করার অধিকারের সূত্রপাত হয়। মতবৈষম্যকে মানব জীবনের একটি বাস্তব সত্য হিসেবে কুরআন বারবার ঘোষণা করেছে। তাহলে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? সব লোক একই মত পোষণ করে কিভাবে একত্রিত হতে পারে? একই মূলনীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী একটি জাতির মধ্যেও বিভিন্ন মাযহাব (School of thoughts) হতে পারে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য পরস্পরের কাছাকাছিই থাকবে। কুরআনের বাণীঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (٣-١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে"–(সূরা আল ইমরানঃ ১০৪)।

কর্মময় জীবনে যখন 'কল্যাণ', 'ন্যায়' এবং 'অন্যায়'–এর ব্যাপক ধারণার মধ্যে পার্থক্য সূচীত হয় তখন জাতির মৌলিক অখন্ডতা অটুট রেখেও তার মধ্যে বিভিন্ন চৈন্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়ে থাকে। একথা কাংখিত মানের যত নিচেই হোক দল–উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটছেই। সুতরাং আমাদের এখানে কথাবার্তায়, ফিক্‌হ ও আইন–কানুন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রেও মতবিরোধ হয়েছে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন দল–উপদল অস্তিত্ব লাভ করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী সংবিধান এবং মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দল–উপদলগুলোর সভা–সমিতি করার অধিকার আছে কি? এই প্রশ্ন সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা)–র সামনে খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের পর উঠেছিল। তিনি তাদের সংগঠন ও সভাসমিতি করার অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি খারিজীদের বলেন, "তোমরা যতক্ষণ তরবারির সাহায্যে নিজেদের মতবাদ অন্যের ওপর চাপাতে চেষ্টা না করবে তোমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।"

একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না

ইসলামে যে কোন ব্যক্তিকে কেবল নিজের কার্যকলাপ এবং নিজের অপরাধের জন্যই জবাবদিহি করতে হয়। অপরের কার্যকলাপ ও অপরাধের জন্য তাকে গ্রেফতার করা যায় না। কুরআন এই নীতি নির্ধারণ করেছে যেঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (٦-١٦٣)

"কোন ভার বহনকারীই অপর কারো ভার বহন করতে বাধ্য নয়"

– (সূরা আনআমঃ ১৬৪)।

অপরাধ করবে দাড়িওয়ালা আর গ্রেফতার হবে গোঁফওয়ালা, ইসলামী আইনে এই ধরনের কোন সুযোগ নেই।

সন্দেহের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার এ অধিকার রয়েছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে

কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, কারো বিরুদ্ধে কিছু অবগত হলে তদন্ত করে নাও। এরূপ যেন না হতে পারে যে, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে কোন পদক্ষেপ নিয়ে বস। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ (৪৯-৬)

"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে এলে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে"–(সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

উপরন্তু কুরআনে এ হেদায়াতও দান করা হয়েছেঃ

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ (৪৯:১২)

"খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক।" (সূরা হুজুরাত ১২)।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে সেই মৌলিক অধিকার যা মানব জাতিকে ইসলাম দান করেছে। এর দর্শন সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ যা মানুষকে তার জীবনের সূচনাতেই বলে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্তমান সময়েও দুনিয়াতে মানবাধিকারের যে ঘোষণা (Declaration of Human Rights) প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার কোন প্রকারের স্বীকৃতি এবং কার্যকর হওয়ার শক্তি নেই। ব্যস একটি উন্নত মানদন্ড পেশ করা হয়েছে, কিন্তু এই মানদন্ড অনুযায়ী কাজ করতে কোন জাতিই বাধ্য নয়। এটা এমন কোন শক্তিশালী চুক্তিপত্রও নয় যা গোটা জাতির কাছ থেকে এই অধিকার আদায় করে দিতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপার এই যে, তারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের হেদায়াতের আনুগত্যকারী আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মৌলিক অধিকারসমূহের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র হতে চায় তাকে এ অধিকারগুলো অবশ্যই লোকদের কাছে পৌছে দিতে হবে। মুসলমানদেরও এ অধিকার দিতে হবে এবং অমুসলমানদেরও। এ ক্ষেত্রে এমন কোন চুক্তিপত্রের প্রয়োজন নেই যে, অমুক জাতি আমাদের যদি এই এই অধিকার দেয় তাহলে আমরাও তাদের দেব। বরং মুসলমানগণকে এ অধিকার দিতেই হবে–শত্রুকেও মিত্রকেও।

খিলাফত প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর অভিমত

রাজনীতি প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্র দর্শন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই তাঁর এ অভিমত ব্যাপৃত ছিল। কোন কোন মৌলিক বিষয়ে তাঁর অভিমত অন্যান্য ইমামদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। এখানে আমরা প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর মতামত পেশ করব।

–(খিলাফত ও মুলূকিয়াত)।

সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রচিন্তার যে কোন দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হোক না কেন তাতে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এ দর্শন অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব কার, কার জন্য এ সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করা হবে? এই সার্বভৌম সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর অভিমত ছিল তাই যা ইসলামের স্বীকৃত মৌলিক মতবাদ। অর্থাৎ সত্যিকার সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলা। রসূল তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহ এবং রসূলের বিধান হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ বিধান যার মুকাবিলায় আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে না। যেহেতু তিনি (আবু হানীফা) মূলতঃ একজন আইনজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়টিকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্ত না করে আইনের ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ

> আল্লাহর কিতাবে কোন বিধান পেয়ে গেলে আমি তাই দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরি। আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে রসূলের সুন্নাহ এবং তাঁর সেই সব বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে নির্ভরযোগ্য লোকদের সূত্রে প্রসিদ্ধ। আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে কোন বিধান না পেলে রসূলুল্লাহ (স)–এর সাহাবীদের উক্তির (অর্থাৎ তাদের ইজমা বা সর্বসম্মত মতের) অনুসরণ করি। আর তাঁদের মতভেদের ক্ষেত্রে যে সাহাবীর উক্তি খুশি গ্রহণ করি, আর যে সাহাবীর উক্তি খুশি বর্জন করি। কিন্তু এঁদের উক্তির বাইরে গিয়ে কারো উক্তি গ্রহণ করিনা। .....অন্যদের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ ইজতিহাদের অধিকার যেমন তাদের আছে,

তেমনি আমারও আছে –(আল–খাতীত আল–বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১৩ খ; পৃ. ৩৬৮; আল–মাককী, মানাকিবুল–ইমামিল আযাম আবী হানীফা; ১খ, পৃ. ৮৯; আয–যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহে (পৃ. ২০)।

আল্লামা ইবনে হাযম (রহ) বলেনঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ)– এর সকল সহচর এ ব্যাপার একমত যে, তাঁর মাযহাব এই ছিল যে, "কোন যঈফ (দুর্বল) হাদীসও পাওয়া গেলে তার মুকাবিলায় কিয়াস এবং ব্যক্তিগত মত পরিত্যাগ করা হবে" (আয–যাহাবী, পৃ. ২১)।

এ থেকে একথা নিসন্দেহে প্রতিভাত হয় যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ (Final Authority) মনে করতেন। তাঁর আকীদা ছিল এই যে, আইনানুগ সার্বভৌমত্ব (Legal soverengnty) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। তাঁর মতে কিয়াস এবং ব্যক্তিগত রায় দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র সেই সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কোন নির্দেশ বর্তমান নেই। রসূল (স)–এর সাহাবীদের ব্যক্তিগত মতকে অন্যদের মতের উপর তিনি যে অগ্রাধিকার দিতেন তার কারণও মূলতঃ এই ছিল যে, সাহাবীদের সম্পর্কে এই সম্ভাবনা বর্তমান আছে যে, তাদের জ্ঞানে রসূলুল্লাহ (স)–এর কোন নির্দেশ থেকে থাকবে এবং তাই তাঁর বক্তব্যের উৎস। তাই যেসব ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তিনি যে কোন এক সহাবীর উক্তি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করতেন, আপন মত মতো সকল সাহাবীর উক্তির পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কারণ এতে অজ্ঞাতসারে সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ হওয়ার আশংকা ছিল। অবশ্য তাদের উক্তির মধ্যে কার উক্তি সুন্নাহর নিকটতর হতে পারে কিয়াসের মাধ্যমে তিনি তা নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন। ইমামের জীবদ্দশায়ই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি কিয়াসকে নস (স্পষ্ট বিধান)–এর ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু এ অভিযোগ খন্ডন করে তিনি বলেনঃ

> "আল্লাহর শপথ। যে ব্যক্তি বলে, আমরা কিয়াসকে নস–এর উপর অগ্রাধিকার দেই–সে মিথ্যা বলে এবং আমাদের উপর মনগড়া অপবাদ আরোপ করে। আচ্ছা! নস–এর পরও কি কিয়াসের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে?" (আশ–শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১খ, পৃ. ৬১, আল–মাতবাআতুল আযহারিয়্যা, মিসর, ৩য় সং, ১৯২৫ খৃ.)।

একদা খলীফা আল-মানসূর তাঁকে লিখেন, আমি শুনেছি যে, আপনি কিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেন। উত্তরে তিনি লিখেন,

"আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিকট যে তথ্য পৌছেছে তা সত্য নয়। আমি সর্বাগ্রে আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করি, অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের উপর, এরপর আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)-এর ফয়সালার উপর, অতপর অবশিষ্ট সাহাবীদের ফয়সালার উপর। অবশ্য তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলে আমি কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য নেই" -(শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১খ, পৃ. ৬২)।

খিলাফত অনুষ্ঠিত হওয়ার সঠিক পন্থা

খিলাফত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত ছিল এই যে, প্রথমে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের পর চাপের মুখে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) আদায় করা খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন বৈধ পন্থা নয়। আহ্‌লুর-রায় (সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রদানের যোগ্য লোক সমষ্টি)-এর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে অনুষ্ঠিত খিলাফতই যথার্থ। এমন এক সংকটাপন্ন সময়ে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন,যখন তা মুখে উচ্চারণকারীর ঘাড়ে মস্তক অবশিষ্ট থাকার কোন কল্পনাই করা যেত না। আল-মানসূরের সচিব রবী ইবনে ইউনূসের বর্ণনামতেঃ তিনি ইমাম মালেক (রহ), ইবনে আবী যেব (রহ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-কে ডেকে এনে বলেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের মধ্যে আমাকে এই রাজত্ব দান করেছেন, এ ব্যাপারে আপনাদের কি মত? আমি কি এর যোগ্য?

ইমাম মালেক (রহ) বলেন, "আপনি এর যোগ্য না হলে আল্লাহ তাআলা তা আপনার উপর সোপর্দ করতেন না।"

ইবনে আবী যেব বলেন, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দুনিয়ার রাজত্ব দান করেন। কিন্তু আখেরাতের রাজত্ব তিনি এমন ব্যক্তিকে দান করেন-যে তা অন্বেষণ করে এবং এজন্য তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন। আপনি আল্লাহর আনুগত্য করলে আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার নিকটবর্তী হবে। অন্যথায় তাঁর অবাধ্যাচরণ করলে তাঁর অনুগ্রহ আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আসল কথা এই যে, আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে ব্যক্তি নিজে খিলাফত হস্তগত করে তার মধ্যে কোন তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নেই।

আপনি এবং আপনার সহায়তাকারীগণ আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে দূরে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত। এখন আপনি যদি আল্লাহর নিকট শান্তি কামনা করেন, পূত-পবিত্র কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেন তবে এ জিনিস আপনার ভাগ্যে জুটবে। অন্যথায় আপনি নিজেই নিজের উদ্দেশ্যের বলি হবেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেন, ইবনে আবী যেব যখন উপরোক্ত কথাগুলো বলছিলেন তখন আমি ও মালেক নিজ নিজ কাপড় গুটাচ্ছিলাম এই আশংকায় যে, হয়ত এখনই তার গর্দান যাবে এবং তাঁর রক্তের ছিটা আমাদের কাপড়ে পড়বে।

অতপর মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনার কি মত? তিনি জবাবে বলেনঃ

"সত্যের সন্ধানী নিজের দীনের খাতিরে ক্রোধ সংবরণ করে। আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করলেই আপনি স্বয়ং জানতে পারবেন যে, আপনি চাচ্ছেন আমরা আপনার ভয়ে আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কথা বলি এবং আমাদের বক্তব্য জনসমক্ষে আসুক। তারা জানুক আমরা কি বলি। সত্য কথা এই যে, আপনি এমন পন্থায় খলীফা হয়েছেন যে, আপনার খিলাফতের ব্যাপারে ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ লোকদের মধ্য হতে দুজন লোকের ঐক্যমতও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ মুসলমানদের সর্বসম্মতি ও পরামর্শক্রমেই খিলাফতের পদে সমাসীন হওয়া যায়। দেখুন! ইয়ামনের অধিবাসীদের বায়আত না আসা পর্যন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দীর্ঘ ছয় মাস ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।"

উপরোক্ত বক্তব্য রেখে তিনজন ইমামই উঠে চলে যান। পরপরই মানসূর রবীকে তিন থলে দিরহাম সহ তিন ইমামের নিকট তাকে প্রেরণ করেন। তাকে তিনি বলে দেন, মালেক তা গ্রহণ করলে তাকে তা দিয়ে দেবে। কিন্তু আবূ হানীফা ও ইবনে আবী যেব তা গ্রহণ করলে তাদের শিরশ্ছেদ করবে। ইমাম মালেক (রহ) এই উপঢৌকন গ্রহণ করেন। রবী যখন ইবনে আবী যেব-এর নিকট পৌছলেন তখন তিনি বলেন, আমি স্বয়ং মানসূরের জন্য যে অর্থ হালাল মনে করি না, তা নিজের জন্য কি করে হালাল মনে করতে পারি? ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেন, আমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলেও আমি এই

অর্থ স্পর্শ করব না। এই বিবরণ শুনে মানসূর বলেন, এ অনমনীয় মনোভাব ও আত্মনির্ভরশীলতা তাদের দুজনের প্রাণ রক্ষা করেছে। [১]

খিলাফতের পদের যোগ্য হওয়ার শর্তাবলী

ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর যুগ পর্যন্ত খিলাফতের পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়ার শর্তাবলী ততটা সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি যতটা পরবর্তী কালের গবেষক আল–মাওয়ারদী ও ইবনে খালদূন প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। কারণ এর অধিকাংশই তখন প্রায় বিতর্কহীনভাবে স্বীকৃত ছিল। যথা, মুসলিম হওয়া, পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া (দাস না হওয়া), জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, সুষ্ঠ বিবেক–বুদ্ধির অধিকারী এবং দৈহিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য দুটি জিনিস তখনই আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানার প্রয়োজন ছিল। একঃ অত্যাচারী, পাপাচারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তি বৈধ খলীফা হতে পারে কি না? দুইঃ খিলাফতের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া প্রয়োজন কি না?

স্বৈরাচারী ও পাপাচারীর ইমামত (নেতৃত্ব)

ফাসেকের নেতৃত্ব সম্পর্কে ইমাম সাহেবের অভিমতের দুটি দিক রয়েছে যা ভালভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। তিনি যে সময়ে এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন, বিশেষত ইরাকে এবং সাধারণভাবে গোটা মুসলিম জাহানে তা ছিল দুই চরমপন্থী মতবাদের মারাত্মক দ্বন্দ্ব–সংঘাতের যুগ। একদিকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, যালেম–ফাসেকের নেতৃত্ব একেবারেই নাজায়েয–সম্পূর্ণ অবৈধ। এই নেতৃত্বের অধীনে মুসলমানদের কোন সামাজিক–সামগ্রিক কাজ নির্ভুল ও যথার্থ হতে পারে না। অপর দিকে বলা হচ্ছিল যে, যালেম–ফাসেক যে কোন ভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জেঁকে বসুক না কেন, তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নেতৃত্ব ও খিলাফত সম্পর্ণ বৈধ হয়ে যায়। এই দুই চরমপন্থী মতামতের মাঝামাঝি ইমাম আজম (রহ) এক অতি ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত পেশ করেন যার বিস্তারিত বিবরণ এইঃ

---

১. আল–কারদারী, মানাকিবুল ইমাম আজাম, ২খ, পৃ. ১৫–১৬। আল–কারদারীর এই বর্ণনায় এমন একটি বিষয় উল্লেখ আছে –যা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হইনি। তা এই যে, ইয়ামনবাসীদের বায়আত না আসা পর্যন্ত হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) ছয় মাস পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন।

আল-ফিকহুল আকবার-এ তিনি বলেন, "সৎ অসৎ যে কোন মুমিন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া জায়েয"

-(মুল্লা আলী আল-কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯১)।

ইমাম তাহাবী (রহ) আকীদাতুত তাহাবিয়া গ্রন্থে হানাফী মতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেনঃ "এবং হজ্জ ও জিহাদ মুসলমানদের উলিল-আমর (সরকারী কর্তৃপক্ষ)-এর অধীনে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সেই উলিল-আমর সৎ হোক বা অসৎ, ভালো হোক বা মন্দ। কোন জিনিস এসব কাজ বাতিল করতে পারে না, আর না তার অব্যাহত ধারা বন্ধ করতে পারে"-(ইবনে আবিল-ইয আল-হানাফী, শারহুত-তাহাবিয়া, পৃ. ৩২২)।

এটা আলোচ্য বিষয়ের একটি দিক। অপর দিকটি এই যে, ইমাম সাহেবের মতে খিলাফতের জন্য আদালত (ন্যায়নিষ্ঠা) অপরিহার্য শর্ত। কোন যালেম-ফাসেক ব্যক্তি বৈধ খলীফা, কাযী (বিচারক), শাসক বা মুফতী হতে পারে না। যদি সে তা বনে যায় তবে তার নেতৃত্ব বাতিল ও অবৈধ এবং তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, এই ব্যক্তি কার্যত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানগণ তার অধীনে তাদের সামাজিক জীবনে যেসব কাজ শরীআতের বিধান অনুযায়ী আঞ্জাম দেবে তা জায়েয ও বৈধ হবে, তার নিয়োগকৃত কাযী বা বিচারক ন্যায়ত যেসব ফয়সালা করবে তা কার্যকর হবে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু বাকর আল-জাসসাস তাঁর আহ্কামুল কুরআন (কুরআনের বিধান) গ্রন্থে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

"সুতরাং কোন জালেম ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির নবী বা নবীর খলীফা হওয়া জায়েয নয়। তার জন্য কাযী বা এমন কোন পদাধিকারী হওয়া বৈধ নয়-যার ভিত্তিতে দীনের ব্যাপারে তার কথা গ্রহণ করা লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। যেমন মুফতী, অথবা সাক্ষ্যদাতা বা মহানবী (স)-এর হাদীস বর্ণনাকারী (রাবী) হওয়া। لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ("আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়"-সূরা বাকারাঃ ১২৪) আয়াত থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, দীনের ব্যাপারে যে লোকই নেতৃত্ব কর্তৃত্বলাভ করে তার সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত।.... এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফাসক-পাপাচারীর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব বাতিল। সে খলীফা হতে পারে না। আর কোন ফাসেক যদি নিজেকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত করে বসে তাহলে জনগণের উপর

তার আনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। এ কথাই মহানবী (স) বলেছেন যে, "স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নাই।" পূর্বোক্ত আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসেক ব্যক্তি বিচারপতি (জজ-মেজিস্ট্রেট) হতে পারে না। সে বিচারক হলেও তার রায় কার্যকর হতে পারে না। এমনিভাবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তার বর্ণিত মহানবী (স)-এর কোন হাদীস গ্রহণ করা যায় না। সে মুফতী হলে তার ফতোয়া মান্য করা যেতে পারে না"- (১খ, পৃ. ৮০)।

সামনে অগ্রসর হয়ে আল-জাসসাস স্পষ্ট করে বলেন যে, এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাব। অতপর তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর উপর এটা কত বড় যুলুম যে, তাঁর উপর ফাসেকের ইমামত ও নৈতৃত্ব বৈধ করার অপবাদ চাপানো হচ্ছেঃ

"কেউ কেউ ধারণা করে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে ফাসেকের ইমামত ও খিলাফত বৈধ। .....উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মিথ্যা কথা না বলা হলে তবে এটা নিশ্চিত এক ভ্রান্ত ধারণা। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তিনি বলতেন, কেবল তিনিই নন, ইরাকের ফকীহ্দের মধ্যে যাঁদের বক্তব্য প্রসিদ্ধ, তাঁরা সকলেই একথা বলতেন যে, কাযী (বিচারক) স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ হলে কোন যালেম তাকে নিযুক্ত করলেও তার ফয়সালা সঠিকভাবে কার্যকর হয়ে যাবে। আর এসব ফাসেক নেতাদের পাপকর্ম সত্ত্বেও তাদের ইমামতিতে নামায জায়েয হবে। এ মত যথাস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু তার দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা যায় না যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) ফাসেক ব্যক্তির ইমামত (নেতৃত্ব) জায়েয (বৈধ) প্রমাণ করেন"-(আহ্কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৮০-৮১)। শামসুল আইম্মা সারাখসীও আল-মাবসূত-এ ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর এই মত বর্ণনা করেছেন, ১খ, পৃ. ১৩০)।

ইমাম যাহাবী ও আল-সুওয়াফফাক আল-মাক্কী উভয়ই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি উধৃত করেছেনঃ

"যে ইমাম ফাই অর্থাৎ জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ব্যবহার করে, অথবা অন্যায় নির্দেশ দেয় তার ইমামত বাতিল, তার নির্দেশ বৈধ নয়"-(আয-যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহে, পৃ. ১৭; আল-মাক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা, ২খ, পৃ. ১০০)।

এসব বক্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) খারিজী ও মুতাযিলাদের বিপরীতে "আইনত" (De Jure) ও "কার্যতঃ" (De Facto)- এর মধ্যে পার্থক্য করেন। খারিজী ও মুতাযিলাদের অভিমত অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য ইমামের অনুপস্থিতিতে মুসলিম সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে পড়া অবধারিত। হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে না, জুমুআ ও জামাআতও থাকবে না, বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না, মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক-কোন কাজই বৈধভাবে চলবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এ ভ্রান্তির সংশোধন এভাবে করেছেন যে, আইনানুগ ইমাম যদি সহজলভ্য না হয় তবে যে ব্যক্তিই কার্যত মুসলমানদের ইমাম হবে, তার অধীনে মুসলমানদের সমাজ জীবনের পুরো ব্যবস্থাই বৈধভাবে চলতে থাকবে, সেই ইমামের কর্তৃত্ব যথাস্থানে বৈধ না হলেও।

মুতাযিলা ও খারিজীদের এই চরম পন্থার বিপরীতে মুরজিয়া এবং স্বয়ং আহলুস-সুন্নার কোন কোন ইমাম আরেক চরম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) মুসলমানদেরকে তা এবং তার পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। তারাও 'কার্যত' ও 'আইনত'-এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। ফাসেকের 'কার্যত' কর্তৃত্বকে তারা এমনভাবে বৈধ প্রতিপন্ন করেছিলেন যেন তা-ই 'আইনত' সঠিক। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হওয়ার ছিল যে, মুসলমানরা অত্যাচারী, অনাচারী ও দুরাচারী শাসনকর্তাদের রাজত্বে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যাবে। তার পরিবর্তনের চেষ্টা তো দূরের কথা, তার চিন্তাও ত্যাগ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এ ভ্রান্ত ধারণার সংশোধনের জন্য পূর্ণ শক্তিতে এই সত্যের ঘোষণা দেন যে, এমন লোকদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে বাতিল।

খিলাফতের পদের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত এই ছিল যে, কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) হতে হবে-(আল-মাসউদী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯২)। এটা কেবল তাঁরই মত নয়, বরং সমস্ত আহ্লুস-সুন্নার সর্বসম্মত অভিমত ছিল তাই (আশ-শাহ্রাস্তানী, কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল, ১খ, পৃ. ১০৬; আবদুল কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফারক বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৩৪০)। এর কারণ এই ছিল না যে, শরীআতের দৃষ্টিতে ইসলামী

খিলাফত কেবলমাত্র একটি গোত্রের সাংবিধানিক অধিকার। বরং এর আসল কারণ ছিল সেই সময়ের পরিস্থিতি যখন মুসলমানদের সংঘবদ্ধ রাখার জন্য খলীফাকে কুরাইশ বংশীয় হওয়া জরুরী ছিল। ইবনে খালদূন একথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল আরবগণ। আর আরবদের সর্বাধিক ঐক্যবদ্ধ করা কুাইশদের খিলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। অপর কোন গোত্রের লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের সম্ভাবনা এত অধিক ছিল যে, খিলাফত ব্যবস্থাকে এ আশংকার মধ্য নিক্ষেপ করা সমীচীন ছিল না"

(আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ১৯৫-৯৬)।

এ কারণে মহানবী (স) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ইমাম হবে কুরাইশদের মধ্য থেকে-(ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩ খ, পৃ. ৯৩, ৯৬, ৯৭; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৩ খ, পৃ. ১২৯, ১৮৩, ৪ খ, পৃ. ৪২১, আল-মাতবাআতুল মাইমানিয়্যা, মিসর ১৩০৬ হি.; মুসনাদে আবী দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নং ৯২৬, ২১৩৩, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি. সংস্করণ)। অন্যথায় এই পদ অ-কুরাইশীদের জন্য নিষিদ্ধ হলে ইন্তেকালের সময় খলীফা হযরত উমার (রা) বলতেন না যে, "হুযাইফা (রা)-র মুক্তদাস সালেম জীবিত থাকলে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার প্রস্তব করতাম"- (আত-তাবারী, ৩য় খ, পৃ. ১৯২)। মহানবী (স)-ও কুরাইশদের মধ্যে খিলাফতের পদ সীমিত রাখার হেদায়াত দিতে গিয়ে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, যতদিন তাদের মধ্যে কতিপয় বিশেষ গুণাবলী বর্তমান থাকবে ততদিন তাদের জন্য এ পদ নির্দিষ্ট থাকবে-(ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩ খ, পৃ. ৯৫)। এ থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, এসব গুণাবলীর অবর্তমানে অ-কুরাইশী ব্যক্তির জন্যও খিলাফতের পদ বৈধ হতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও সকল আহ্‌লুস সুন্নার মত এবং সেই সকল খারিজী ও মুতাযিলার মতের মধ্যে এটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য-যারা অ-কুরাইশীর জন্য সাধারণভাবেই খিলাফতের বৈধতা প্রমাণ করে, বরং এক ধাপ অগ্রসর হয়ে অ-কুরাইশীকে খিলাফতের অধিক হকদার প্রতিপন্ন করে। তাদের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব ছিল গণতন্ত্রের-তার পরিণতি বিচ্ছিন্নতাই হোক না কেন। কিন্তু আহ্‌লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআত গণতন্ত্রের সাথে সাথে রাষ্ট্রের স্থিতি ও সংহতির কথাও চিন্তা করতেন।

বাইতুল–মাল (সরকারী কোষাগার)

সমকালীন খলীফাদের যে বিষয়ের উপর ইমাম আবূ হানীফা (রহ) সবচেয়ে বেশী আপত্তি করতেন–রাষ্ট্রীয় ধন ভান্ডারের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং জনগণের মালিকানাধীন সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ ছিল তার অন্যতম। তাঁর মতে অন্যায় নির্দেশ এবং বাইতুল–মালের খিয়ানত কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব বাতিল ও অবৈধ করার মত গর্হিত কাজ। ইমাম যাহাবীর উধৃতি দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে একথা উল্লেখ করেছি। বিদেশী রাষ্ট্র থেকে খলীফার নিকট যেসব উপহার–উপঢৌকন আসত, তাও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা তিনি জায়েয মনে করতেন না। তাঁর মতে এসব হচ্ছে সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য, খলীফা বা তার খান্দানের প্রাপ্য নয়। তাঁর মতে, সে যদি মুসলমানদের খলীফা না হত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি ও প্রচেষ্টার বদৌলতে খলীফার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত না হত তবে কোন ব্যক্তিই ঘরে বসে এসব উপঢৌকন লাভ করতে পারত না–(আস–সারাখসী, শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১খ, পৃ. ৯৮)। তিনি বাইতুল–মাল থেকে খলীফার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং দানদক্ষিণায়ও আপত্তি করতেন। যেসব কারণে তিনি খলীফাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না–এটাও ছিল তার অন্যতম কারণ।

খলীফা মানসূরের সাথে যখন তাঁর ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল তখন একবার মানসূর তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি আমার হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করেন না কেন? তিনি উত্তরে বলেন, "আমীরুল–মুমিনীন কখন নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আমাকে উপঢৌকন দিয়েছেন যে, আমি তা ফেরত দিয়েছি? আপনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে উপঢৌকন দিলে আমি নিশ্চিত তা গ্রহণ করতাম। আপনি তো আমাকে মুসলমানদের বাইতুল–মাল থেকে দিয়েছেন। অথচ তাদের সম্পদে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তাদের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধও করি না যে, একজন সৈনিকের অংশ পাব। আর তাদের সন্তানদের অন্তর্ভূক্তও নই যে, সন্তানের অংশ পাব, আর না ফকীরদের অন্তর্ভূক্ত যে, ফকীরের প্রাপ্য অংশ পাব"–(আল–মাক্কী, ১খ., পৃ. ২১৫)।

কাযীর (বিচারপতির) পদ গ্রহণ না করায় মানসূর যখন তাঁকে তিরিশ ঘা বেত্রাঘাত করেন এবং তাঁর সমস্ত শরীর রক্ত রঞ্জিত হয়ে যায় তখন খলীফার চাচা আবদুস সামাদ ইবনে আলী তাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করে বলেন, তুমি এ কী করেছ, নিজের বিরুদ্ধে এক লাখ তরবারি উত্তোলন করিয়েছ। ইনি

ইরাকের ফকীহ, বরং গোটা প্রাচ্যের ফকীহ। মানসূর এতে লজ্জিত হয়ে প্রতি বেত্রাঘাতের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম হিসাব করে ইমামের নিকট তিরিশ হাজার দিরহাম প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে বলা হয়, তা গ্রহণ করে দানখয়রাত করে দিন। উত্তরে তিনি বলেন, তার নিকট কোন হালাল সম্পদও কি আছে?"-(ঐ, পৃ. ২১৫-২১৬)।

এর কাছাকাছি সময়ে উপর্যুপরি নির্যাতন ভোগ করতে করতে যখন তাঁর অন্তীম সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ওসিয়াত করেন যে, বাগদাদ শহরের পত্তনের জন্য মানসূর জনগণের মালিকানাধীন যেসব এলাকা জবরদখল করে নিয়েছিলেন সেই এলাকায় যেন তাঁকে দাফন না করা হয়। তাঁর এই ওসিয়াতের কথা শুনে মানসূর চিৎকার করে বলে উঠেন, "আবূ হানীফা! জীবনে-মরণে তোমার সমালোচনা থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে" -
(ঐ, ২খ, পৃ. ১৮০)।

শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অভিমত এই ছিল যে, বিচার বিভাগ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ, চাপ ও প্রভাব থেকে শুধু মুক্তই হবে না, বরং বিচারককে এতখানি ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে যে, স্বয়ং খলীফাও যদি জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে তিনি যেন তার উপরও নিজের নির্দেশ কার্যকর করতে পারেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি যখন নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে, সরকার আর তাঁকে বেঁচে থাকতে দেবে না, তখন তিনি নিজের শাগরিদদের সমবেত করে একটি ভাষণ দেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও এ ভাষণে তিনি নিম্নোক্ত কথাও বলেনঃ

"খলীফা যদি এমন কোন অপরাধ করে যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, তবে মর্যাদার দিক থেকে তার নিকটতম কাযী (প্রধান বিচারপতি)-কে তার উপর স্বীয় নির্দেশ কার্যকর করতে হবে"-(ঐ, ২খ, পৃ. ১০০)।

বানূ উমাইয়্যা ও আব্বাসীদের শাসনামলে তাঁর কোন সরকারী পদ বিশেষত কাযীর পদ গ্রহণ না করার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, তিনি এদের রাজত্বে কাযীর উপরোক্ত মর্যাদা দেখতে পাননি। শুধু এতটুকুই নয় যে, সেখানে খলীফার উপর আইনের বিধান প্রয়োগের সুযোগ ছিল না, বরং তাঁর আশংকা ছিল যে, তাঁকে স্বৈরাচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তাঁর দ্বারা অন্যায়

সিদ্ধান্ত করানো হবে এবং তাঁর ফয়সালায় কেবল খলীফাই নয়, বরং রাজপ্রাসাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্য ব্যক্তিরাও হস্তক্ষেপ করবে।

বানূ উমাইয়্যাদের শাসনামলে সর্বপ্রথম ইরাকের গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে উমার ইবনে হুবায়রা তাঁকে সরকারী পদ গ্রহণে বাধ্য করে। এটা ১৩০ হিজরীর কথা। তখন ইরাকে উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের এমন এক ঘনঘটা দেখা দেয় যা মাত্র দুই বছরের মধ্যে উমাইয়্যাদের সিংহাসন উল্টে দেয়। এ সময় ইবনে হুবায়রা বিশিষ্ট ফকীহগণের সমর্থন নিয়ে তাদের প্রভাব দ্বারা কার্য উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তাই সে ইবনে আবী লায়লা, দাউদ ইবনে আবিল হিন্দ, ইবেন শুবরুমা প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমদের ডেকে এনে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করে। অতপর সে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-কে ডেকে বলে, আমার সীলমোহর আপনার হাতে অর্পণ করছি। আপনার সীল না লাগা পর্যন্ত কোন নির্দেশ জারী হবে না, আপনার অনুমোদন ব্যতীত ট্রেজারী থেকে কোন অর্থ বাইরে যাবে না। তিনি দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এং বেত্রাঘাতের হুমকি দেয়া হয়। অপরাপর ফকীহগণ ইমাম সাহেবকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, নিজের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমরাও এ পদ গ্রহণে অসন্তুষ্ট, কিন্তু বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছি। আপনিও তা গ্রহণ করুন। তিনি উত্তরে বলেন, "সে কোন ব্যক্তির হত্যার নির্দেশ দেবে, আর আমি তাতে সীলমোহর প্রদান করব-এটা তো দূরের কথা-সে যদি আমাকে ওয়াসিতের মসজিদের দরজা গণনার দায়িত্বও দেয় আমি তা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নই। আল্লাহর শপথ! এ কাজে আমি অংশ নেব না।"

এই সুবাদে ইবনে হুবায়রা তাঁর সামনে অন্যান্য পদও পেশ করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অতপর সে তাঁকে কূফার কাযী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শপথ করে বলে যে, এবার আবূ হানীফা তা প্রত্যাখ্যান করলে আমি তাকে চাবুক মারব। ইমাম সাহেবও শপথ করে বলেন, পার্থিব জীবনে তার চাবুকের ঘা সহ্য করা আমার জন্য আখেরাতের শাস্তি ভোগ করার তুলনায় অধিক সহজ। আল্লাহর শপথ! সে আমাকে হত্যা করলেও আমি তা গ্রহণ করব না। অবশেষে সে তাঁর মাথায় বিশ বা তিরিশ ঘা চাবুক মারে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী সে দশ-এগার দিন ধরে তাঁকে দৈনিক দশ ঘা চাবুক মারে। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতিতে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাকে জানানো হয় যে, লোকটি মারাই যাবে। তখন ইবনে হুবায়রা বলে, আমার

নিকট থেকে সময় চেয়ে নেয়ার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেয়ার মতও কি কেউ নেই? তার এ উক্তি ইমাম সাহেবকে জানানো হলে তিনি বলেন, বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য আমাকে মুক্তি দাও। এ কথা শুনেই ইবনে হুবায়রা তাঁকে মুক্ত করে দেয়। তিনি কূফা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আসেন। উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে তিনি তথা থেকে আর ফিরে আসেননি (আল-মাক্কী, ২খ, পৃ. ২১, ২৪; ইবনে খাল্লিকান, ৫খ, পৃ. ৪১; ইবনে আবদিল বার, আল-ইন্তিকা, পৃ. ১৭১)।

এরপর আব্বাসীদের শাসনামলে আল-মানসূর তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেন। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। মানসূরের বিরুদ্ধে নফসে যাকিয়্যা এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহে ইমাম সাহেব প্রকাশ্যে তাদের সহযোগিতা করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মানসূরের মনে খটকা লেগে যায়। ঐতিহাসিক আয-যাহাবীর ভাষায়, মানসূর তাঁর বিরুদ্ধে রাগে ও ক্ষোভে বিনা আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছিল (মানাকিবুল ইমাম, পৃ. ৩০)। কিন্তু তাঁর মত প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর হস্তক্ষেপ করা মানসূরের জন্য সহজ ছিল না। তার জানা ছিল যে, এক ইমাম হুসাইন (রা)-র হত্যা উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে কতটা ঘৃণার সঞ্চার করেছিল এবং তার পরিণতিতে কত সহজে তাদের ক্ষমতার ভিত ধ্বসে পড়ে। তাই তাঁকে না মেরে বরং স্বর্ণের জিঞ্জিরে আবদ্ধ রেখে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা মানসূর শ্রেয় মনে করেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সামনে বারবার কাযীর পদ পেশ করেন, এমনকি তাঁকে গোটা আব্বাসী সাম্রাজ্যের কাযিউল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি) নিয়োগের প্রস্তাবও দেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান (আল-মাক্কী, ২ খ, পৃ. ১৭২, ১৭৩, ১৭৮)। শেষ পর্যন্ত মানসূর আরও বেশী পীড়াপীড়ি করলে ইমাম সাহেব তাকে উক্ত পদ গ্রহণ না করার কারণ জানিয়ে দেন। একদা আলোচনা প্রসংগে একান্ত নরম সুরে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেনঃ

"আপনার উপর এবং আপনার শাহযাদা ও সিপাহসালারদের উপর আইন জারী করার মত সাহস যার আছে কেবল সেই ব্যক্তি এ পদের যোগ্য হতে পারে। এমন সাহস আমার নেই। আপনি যখন আমাকে ডেকে পাঠান তখন আপনার নিকট থেকে ফিরে আসার পরই আমার দেহে প্রাণ ফিরে আসে"
-(ঐ, ১খ, পৃ. ২১৫)।

আর একবার কড়া কথাবার্তা হয়। তখন তিনি খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, "আল্লাহর শপথ! সন্তুষ্টি সহকারেও যদি আমি এ পদ গ্রহণ করি তবুও আপনার আস্থাভাজন হতে পারব না। আর কোথায় অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে তা কবূল করব। কোন ব্যাপারে যদি আমার ফয়সালা আপনার বিরুদ্ধে যায়, আর আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন যে, তোমার সিদ্ধান্ত পরবর্তন কর, নইলে আমি তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারব, তখন আমি ফোরাতে ডুবে মরা কবূল করব, কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। তা ছাড়া আপনার তো অনেক সভাসদও রয়েছে........তাদের কেউ এমন বিচারক আশা করবে যিনি আপনার খাতিরে তাদেরও সমীহ করবেন"

–(ঐ, ২খ, পৃ. ১৭০; আল–খাতীব, ১৩ খ, পৃ. ৩২০)।

এসব কথা শুনে মানসূরের যখন বিশ্বাস হল যে, এ লোকটি সোনার পিঞ্জীরায় আবদ্ধ হতে প্রস্তুত নয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ঝাপিয়ে পড়েন। তাঁকে চাবুক মারা হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করে পানাহারের ভীষণ কষ্ট দেয়া হয়, একটি গৃহে নযরবন্দী করে রাখা হয়–যেখানে কারো কারো মতে স্বাভাবিক মৃত্যু আর কারো মতে বিষ প্রয়োগে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। (আল–মাক্কী, ২ খ, পৃ. ১৭৩, ১৭৪, ১৮২; ইবনে খাল্লিকান, ৫ খ, পৃ. ৪৬; আল–ইয়াফিঈ, মিরআতুল জানান, পৃ. ৩১০)।

মত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার

ইমাম সাহেবের মতে মুসলিম সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের বিরাট গুরুত্ব ছিল এবং এর জন্য কুরআন ও সুন্নায় "আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহ্য়ু আনিল–মুনকার" (সত্য–ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিছক 'মত প্রকাশ' একান্ত অযথার্থ হতে পারে, হতে পারে বিপর্যয় সৃষ্টিকর, নীতি–নৈতিকতা এবং মানবতা বিরোধীও হতে পারে, যা কোন আইন ব্যবস্থা বরদাশত করতে পারে না। কিন্তু অন্যায় কার্য থেকে নিবৃত্ত করা এবং ন্যায়ানুগ কাজ করতে বলা একটি সত্যিকার অর্থেই মত প্রকাশ। ইসলাম এই পরিভাষা গ্রহণ করে মত প্রকাশের সকল পন্থার মধ্যে এটিকে বিশেভাবে জনগণের কেবল অধিকারই প্রতিপন্ন করেনি, বরং এটাকে জনগণের কর্তব্য বলেও নির্দিষ্টকরেছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এই অধিকার ও এই কর্তব্যের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তাঁর সময়কার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং তা ফরয হওয়া সম্পর্কেও লোকেরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় একদিকে মুর্জিয়ারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার দ্বারা জনগণকে পাপ কাজে প্ররোচিত করতে থাকে, অপর দিকে 'হাশবিয়া' নামে আর একটি ফেরকা মনে করে যে, সরকারের বিরুদ্ধে "ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ" আরেকটি ফেতনা। তৃতীয়তঃ উমাইয়্যা ও আব্বাসী সরকার গায়ের জোরে শাসক গোষ্ঠীর ফিস্‌ক-ফজুর (অনাচার) ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত মুসলমানদের প্রাণশক্তি নির্মূল করেছিল। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এই প্রাণশক্তি পুনর্জীবিত করতে এবং এর সীমা চিহ্নিত করতে প্রয়াস পান। আল-জাসসাস-এর বর্ণনা মতে, ইবরাহীম আস-সায়েগ (খুরাসানের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ফকীহ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম সাহেব বলেনঃ

"আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহ্‌য়ু আনিল-মুনকার" ফরয এবং ইকরামার সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-র সনদে তাঁকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসও স্মরণ করিয়ে দেনঃ "একে তো হামযা ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রা) শহীদদের মধ্যে সকলের চেয়ে উত্তম, আর দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি স্বৈরাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সত্য কথা বলে, অন্যায় কার্য থেকে নিবৃত্ত করে এবং এ অপরাধে প্রাণ হারায়।" ইবরাহীমের উপর তাঁর এ কথার এত বিরাট প্রভাব পড়েছিল তিনি খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করে আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুসলিম খুরাসানী (মৃত্যু ১৩৬/৭৫৪ সাল)-কে তার যুলুম-নির্যাতন ও নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত আবূ মুসলিম তাঁকে হত্যা করে (আহ্‌কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৮১)।

নফসে যাকিয়্যার ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদিল্লাহ (১৪৫/৭৬৩ সাল)-এর বিদ্রোহকালে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর নিজ কর্মপন্থা এই ছিল যে, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন জানাতেন এবং আল-মানসূরের বিরোধিতা করতেন। অথচ মানসূর তখন কূফায় অবস্থানরত ছিলেন। ইবরাহীমের সামরিক বাহিনী বসরা থেকে কূফার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং শহরে সারা রাত কারফিউ থাকত। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র যুফার ইবনুল হুযাইল-এর বর্ণনা মতে,

এই সংকটকালে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) খুব জোরেশোরে ও প্রকাশ্যে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। এমনকি একদিন আমি তাকে বললাম, মনে হয় আমাদের সকলের গলায় রজ্জু না বাঁধা পর্যন্ত আপনি নিবৃত্ত হবেন না (আল-খাতীব, ১৩ খ, পৃ. ৩৩০; আল-মাক্কী, ২ খ, পৃ. ১৭১)।

১৪৮ হি. ৭৬৫ খৃ. সালে মাওসিল-এর অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। এর আগের এক বিদ্রোহের পর মানসূর তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, ভবিষ্যতে পুনরায় বিদ্রোহ করলে তাদের "জানমাল হরণ" তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। তারা পুনরায় বিদ্রোহ করলে মানসূর প্রসিদ্ধ ফকীহগণকে যাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-ও ছিলেন-ডেকে জিজ্ঞেস করেনঃ চুক্তি অনুযায়ী তাদের জানমাল হরণ আমার জন্য হালাল হবে কি না? অপরাপর ফকীহ্গণ চুক্তির অজুহাত দিয়ে বলেন, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিলে তা আপনার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ। অন্যথায় যে শাস্তি ইচ্ছা আপনি তাদের দিতে পারেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) নীরব ছিলেন। মানসূর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি মত? তিনি উত্তরে বলেন, "মাওসিলবাসীরা আপনার জন্য এমন জিনিস বৈধ করেছে যা তাদের নিজস্ব নয় (অর্থাৎ তাদের জীবন)। আর আপনি তাদেরকে এমন শর্ত গ্রহণে বাধ্য করেছেন যার অধিকার আপনার ছিল না। বলুন, "কোন স্ত্রীলোক যদি বিবাহ ছাড়াই নিজেকে কারো জন্য হালাল করে দেয় তবে কি সে হালাল হয়ে যাবে?" কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বলে, "আমাকে হত্যা কর তবে কি তাকে হত্যা করা ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে?" মানসূর জবাব দেন, "না।" ইমাম সাহেব বলেন, "তাহলে আপনি মাওসিলের অধিবাসীদের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকুন। তাদের হত্যা করা আপনার জন্য হালাল নয়।"

তাঁর এ জবাব শুনে মানসূর অসন্তুষ্ট হয়ে ফকীহদের সভা বাতিল করে দেন। অতপর আবূ হানীফা (রহ)-কে তিনি একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, "আপনি যা বলেছেন তা-ই সঠিক। কিন্তু এমন কোন ফতোয়া দেবেন না যাতে আপনাদের নেতার উপর আঘাত আসতে পারে এবং বিদ্রোহীদের দুঃসাহস বেড়ে যেতে পারে"-(ইবনুল আছীর, ৫খ, পৃ. ২৫; আল-কারদারী, ২খ, পৃ. ১৭; আল-মাবসূত, ১০ খ, পৃ. ১২৯, গ্রন্থকার ইমাম সারাখসী)।

বিচার বিভাগের বিরুদ্ধেও তিনি স্বাধীন মত ব্যক্ত করতেন। কোন আদালত ভুল রায় দিলে–তাতে আইন বা নীতিমালার যে কোন ভুল থাকলে তিনি তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন। তাঁর মতে আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, আদালতকে ভুল ফয়সালা করতে দেয়া হবে। এই অপরাধে একবার তাঁকে সাময়িকভাবে ফতোয়া দানে বিরত রাখা হয়।

–(আল–কারদারী, ১খ, ১৬০, ১৬৫, ১৬৬; ইবনে আবদিল বার, আল–ইন্তিকা, পৃ. ১২৫, ১৫৩; আল–খাতীব, ১৩ খ, পৃ. ৩৫১)।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, বৈধ নেতৃত্ব ও তার ন্যায়পরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধেও কেউ যদি মুখ খোলে এবং নেতাকে গালি দেয় অথবা তাকে হত্যার হুমকিও দেয় তবুও তাকে শাস্তি প্রদান বা আটক করা তাঁর মতে বৈধ নয়। যতক্ষণ না সে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তিনি আলী (রা)–র একটি ঘটনা প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ঘটনাটি এইঃ

তাঁর খিলাফতকালে পাঁচ ব্যক্তিকে এজন্য আটক করা হয় যে, তারা কুফায় তাঁকে প্রকাশ্যে গালি দিচ্ছিল এবং তাদের একজন বলেছিল, আমি তাঁকে হত্যা করব। আলী (রা) তাদের মুক্তির নির্দেশ দিলে তাঁকে বলা হল, লোকটি তো আপনাকে হত্যার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। তিনি বলেন, শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করার কারণে আমি কি তাকে হত্যা করব? বলা হল, সে তো আপনাকে গালিও দিয়েছে। তিনি উত্তর দেন, ইচ্ছা করলে তোমরাও তাকে গালি দিতে পার।

অনন্তর তিনি সরকার বিরোধীদের ব্যাপারে হযরত আলী (রা)–এর সেই ঘোষণা প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যা তিনি খারিজীদের সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেনঃ "আমরা তোমাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেব না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ থেকেও বঞ্চিত করব না–যতক্ষণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন শসস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ না কর" (আস–সারাখসী, মাবসূত, ১০ খ, পৃ. ১২৫)।

স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসংগ

মুসলমানদের নেতা যালেম–ফাসেক ও স্বৈরাচারী হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Revolt) করা যায় কি না? এটা ছিল তৎকালীন যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্বয়ং আহ্‌লুস–সুন্নাহ ওয়াল–জামাআতের মধ্যেও এ বিষয়ে

মতভেদ ছিল। আহ্‌লুল–হাদীসের এক বিরাট দলের মতে কেবলমাত্র মৌখিকভাবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং তার সামনে সত্য কথা প্রকাশ করতে হবে; কিন্তু বিদ্রোহ করা যাবে না যদিও সে অন্যায়ভাবে খুনখারাবি করে, জনগণের অধিকার হরণ করে এবং প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয়–(আল–আশআরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, ২ খ, পৃ. ১২৫)।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর মত ছিল এই যে, যালেম শাসকের কর্তৃত্ব কেবল বাতিলই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা যেতে পারে এবং করা উচিৎ। তবে শর্ত হচ্ছে–একটি সফল ও স্বার্থক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকতে হবে, যালেম ও ফাসেক নেতৃত্বের পরিবর্তে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বিদ্রোহের ফল কেবল প্রাণহানি ও শক্তিক্ষয় হবে না। আল্লামা আবূ বাক্‌র আল–জাসসাস (রহ) এই মতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

"যালেম–অত্যাচারী ও জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর মাযহাব প্রসিদ্ধ। এ কারণে ইমাম আওযাঈ (রহ) বলেছেন, আমরা আবূ হানীফার সকল কথা সহ্য করেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি তরবারি সহ অবতীর্ণ হয়েছেন (অর্থাৎ যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থক হয়েছেন)। আর তা ছিল আমাদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার। আবূ হানীফা (রহ) বলতেন, "আমর বিল–মা'রূফ ওয়া নাহ্‌য়ু আনিল মুনকার" প্রথমত মুখের দ্বারা ফরয। কিন্তু এই সহজ পন্থা অবলম্বন সম্ভব না হলে তরবারির সাহায্যে তা করা ওয়াজিব

(আহ্‌কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৮১)।

অন্যত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহ)–এর উধৃতি দিয়ে তিনি স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর একটি কথা নকল করেছেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন প্রথম আব্বাসী খলীফার শাসনামলে আবূ মুসলিম খুরাসানী যুলুম–নির্যাতনের একশেষ করেছিল। সেই সময় খুরাসানের প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌ ইবরাহীম আস–সায়েগ (রহ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে "আমর বিল–মা'রূফ ওয়া নাহ্‌য়ু আনিল–মুনকার"–এর বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে ইমাম সাহেব নিজে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের নিকট এই আলোচনার বিষয় উল্লেখপূর্বক বলেনঃ

"আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহ্য়ু আনিল-মুনকার" ফরয হওয়ার বিষয়ে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত হলে তৎক্ষণাত ইবরাহীম বলেন, হস্ত প্রসারিত করুন আপনার হাতে বায়আত হব। একথা শুনে আমার চোখের সামনে দুনিয়াটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি আরয করলাম-তা কেন? তিনি বলেন, তিনি আমাকে আল্লাহ্‌র একটি অধিকারের দিকে আহবান জানান আর আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। অবশেষে আমি তাকে বললাম, কোন ব্যক্তি একাকি এ কাজের জন্য দাঁড়ালে মারা পড়বে এবং লোকদেরও কোন ফায়দা হবে না। অবশ্য সে যদি কোন সৎ সাহায্যকারী পেয়ে যায় এবং নেতৃত্বের জন্যও এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যে আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তবে তারপর কোন প্রতিবন্ধক থাকার কতা নয়। অতপর ইবরাহীম যখনই আমার নিকট আসতেন এ কাজের জন্য আমাকে এমন চাপ দিতেন যেমন কোন কঠোর মহাজন ঋণ আদায়ের জন্য করে থাকে। আমি তাকে বলতাম, এটা কোন এক ব্যক্তির কাজ নয়। নবীগণেরও এক্ষমতা ছিল না, যতক্ষণ এজন্য আসমান থেকে নির্দেশ আসেনি। এ ফরয অন্যান্য সাধারণ ফরযের মত নয়। কোন সাধারণ ফরয এক ব্যক্তিও আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু এটা এমন এক কাজ যে, কোন ব্যক্তি একা এজন্য দাঁড়ালে নিজের জান হারাবে এবং আমার আশংকা হচ্ছে যে, সে নিজের প্রাণ সংহারে সহায়তার অপরাধে অপরাধী হবে। অতপর সে যখন মারা যাবে তখন অন্যরাও এ বিপদ মাথা পেতে নিতে পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে।

(আহ্‌কামুল-কুরআন, ২খ, পৃ. ৩৯)।

বিদ্রোহ প্রসংগে ইমাম সাহেবের ব্যক্তিগত কর্মপন্থা

উপরের আলোচনা থেকে এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবের মৌলিক দৃষ্টিভংগি স্পষ্টই জানা যায়। কিন্তু তাঁর সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে তিনি কি কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন তা বিশ্লেষণ করে না দেখা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিভংগি পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়।

যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহ

বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা হচ্ছে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহের ঘটনা। শীয়াদের যায়দিয়া ফেরকা নিজেদেরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত দাবী করে। ইনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর পৌত্র এবং ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির

(রহ)–এর ভাই। তিনি স্বীয় যুগের বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন আলেম, ফকীহ, আল্লাহভীরু ও সত্যাশ্রয়ী বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তাঁর জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। ১২০ হি./৭৩৮ খৃ.–এ হিশাম ইবনে আবদুল মালেক যখন খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল–কাসরীকে ইরাকের গভর্নরের পদ হতে বরখাস্ত করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করান তখন এ ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্য হযরত যায়েদ (রহ)–কেও মদীনা থেকে কূফায় তলব করা হয়। দীর্ঘদিন পরে এই প্রথম বারের মত হযরত আলী (রা)–এর বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কূফা আগমন করেন। কূফা ছিল আলী (রা)–এর সমর্থকদের কেন্দ্রস্থল। তাই তাঁর আগমনে হঠাৎ আলাভী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকে। এমনিতে ইরাকের অধিবাসীগণ বছরের পর বছর ধরে উমাইয়্যা বংশের যুলুম–নির্যাতন ভোগ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য তারা দীর্ঘ দিন থেকে আশ্রয় খুঁজছিল। আলী (রা)–এর বংশের একজন সত্যাশ্রয়ী আলেম ও ফকীহকে পেয়ে তারা তাঁকে নিজেদের জন্য অমূল্য সম্পদ মনে করল। কূফার অধিবাসীগণ তাঁকে নিশ্চয়তা দানপূর্বক বলে যে, কূফার এক লক্ষ লোক আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত এবং পনের হাজার লোক বায়আত করে যথারীতি নিজেদের নামও তাদের তালিকাভুক্ত করেছে। ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহ চলাকালে উমাইয়্যা গভর্নর এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। সরকার সতর্ক হয়ে গেছে দেখে যায়েদ (রহ) ১২২ হিজরীর সফর মাসে (৭৪০ খৃ.) উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই বিদ্রোহ করে বসেন। সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে কূফার আলীপন্থী সমর্থকগণ তাঁর সংগ ত্যাগ করে। যুদ্ধের সময় মাত্র ২১৮ ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধ চলাকালে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন এবং প্রাণ ত্যাগ করেন (আত–তাবারী, ৫ খ, পৃ. ৪৮২, ৫০৫)।

এই বিদ্রোহে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর সম্পূর্ণ সহানুভূতি তিনি লাভ করেন। তিনি যায়েদকে আর্থিক সাহায্য দান করেন এবং জনগণকে তাঁর সহযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন (আল–জাসসাস, ১ খ, পৃ. ৮১)। তিনি যায়েদের বিদ্রোহকে রসূলুল্লাহ (স)–এর বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন (আল–মাক্কী, ১ খ, পৃ. ১৬০)। এর অর্থ এই যে, তাঁর মতে তখন রসূলুল্লাহ (স)–এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যেমন সন্দেহাতীত ছিল, ঠিক যায়েদ ইবনে আলীরও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তেমন সন্দেহাতীত। কিন্তু

যায়েদের সহযোগিতা করার জন্য তাঁর নিকট যায়েদের পয়গাম পৌছলে তিনি বার্তাবাহককে জানান, আমি যদি জানতে পারতাম যে, লোকেরা তাঁর সংগ ত্যাগ করবে না, সত্য মনে তাঁর সহযোগিতা করবে তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর সাথে শরীক হয়ে জিহাদ করতাম। কারণ তিনি সত্যবাদী ইমাম। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এরা তাঁর দাদা সায়্যিদিনা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)–এর সাথে যেভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল, তাঁর সাথেও অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অবশ্য অর্থসম্পদ দ্বারা আমি তাঁর সাহায্য করব (আল–মাক্কী, ১ খ, পৃ. ২৬০)। যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি যে নীতিগত মত ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এই শেষোক্ত মতও ছিল তারই অনুরূপ। কূফার আলীপন্থীদের ইতিহাস এবং তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। হযরত আলী (রা)–এর সময় থেকে এরা ক্রমাগত যে চরিত্র–নৈতিকতার পরিচয় দিয়ে আসছিল তার পূর্ণাংগ ইতিহাস সকলের সামনে ছিল। ইবনে আব্বাস (রা)–এর পৌত্র দাউদ ইবনে আলীও কূফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যায়েদকে যথা সময়ে অবহিত করে তাঁকে বিদ্রোহ থেকে বারণ করেন (আত–তাবারী, ৫ খ, পৃ. ৪৮৭, ৪৯১)। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এও জানতেন যে, এ আন্দোলন কেবল কূফায়ই চলছে। উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের আর কোন এলাকায় এমন কোন আন্দোলন নেই। অন্য কোন স্থানে এ আন্দোলনের এমন কোন সংগঠনও নেই যে স্থান থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আর কূফায়ও মাত্র ছয় মাসে এ অপরিপক্ক আন্দোলন দানা বেঁধেছে। তাই সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণ দেখে যায়েদের বিদ্রোহে কোন সফল বিপ্লব সাধিত হবে এমন আশা তিনি করতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করার এটাও অন্যতম সম্ভাব্য কারণ ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর এতটা প্রভাবও ছিল না যে, তাঁর অংশগ্রহণের ফলে আন্দোনের দুর্বলতা কিছুটা দূরীভূত হতে পারে। ১২০ হিজরী পর্যন্ত ইরাকের আহলুর–রায় মাদরাসার নেতৃত্ব ছিল হাম্মাদ (রহ)–এর হাতে। তখন পর্যন্ত আবূ হানীফা (রহ) ছিলেন নিছক তাঁর একজন ছাত্র মাত্র। যায়েদের বিদ্রোহকালে তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের মাত্র দেড়–দুই বছর বা তার চেয়ে কিছু কমবেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন পর্যন্ত তিনি "প্রাচ্যের ফকীহ"–এর মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেননি।

নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিদোহের ঘটনা ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ (নাফসে যাকিয়্যা) ও তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহ। ইনি ছিলেন ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা)-এর বংশধর। ১৪৫ হিজরী/ ৭৬২-৩ খৃ.-এর ঘটনা। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর পুরো প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করেছিল।

তাদের দুই ভাইয়ের গোপন আন্দোলন উমাইয়্যাদের শাসনকাল থেকেই চলে আসছিল। এমনকি এক সময় আল-মানসূরও উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সংগে নাফসে যাকিয়্যার হাতে বায়আত হন (আত-তাবারী, ৬ খ, পৃ. ১৫৫-৬)। আব্বাসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর এরা আত্মগোপন করে এবং সন্তর্পণে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। খুরাসান, আল-জাযীরা, রায়, তাবারিস্তান, ইয়ামন ও উত্তর আফ্রিকায় এদের প্রচারকগণ ছড়িয়ে ছিল। নাফসে যাকিয়্যা হিজাযে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর ভাই ইবরাহীমের কেন্দ্র ছিল ইরাকের বসরায়। ইবনুল আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী কূফায়ও তাঁর সাহায্যার্থে এক লক্ষ তরবারি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল (আল-কামিল, ৫ খ, পৃ. ১৮)। এদের গোপন আন্দোলন সম্পর্কে আল-মানসূর পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন এবং এদের ব্যাপারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ছিলেন। কারণ আব্বাসী দাওয়াতের পাশাপাশি এদের দাওয়াতও চলছিল। আব্বাসী দাওয়াতের ফলে শেষ পর্যন্ত আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সংগঠন আব্বাসী সংগঠনের চেয়ে মোটেই ক্ষুদ্র ছিল না। এ কারণে মানসূর কয়েক বছর যাবত এই আন্দোলন দমনের চেষ্টায় ছিলেন এবং তা প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন।

১৪৫ হিজরীর রজব মাসে নাফসে যাকিয়্যা মদীনা থেকে কার্যত বিদ্রোহ শুরু করলে মানসূর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বাগদাদ শহরের নির্মাণ কাজ পরিত্যাগ করে কূফায় গমন করেন এবং এ আন্দোলনের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য টিকে থাকবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। মানসূর অনেক সময় উদ্ভ্রান্তের মত বলতেন, "আল্লাহর শপথ! কি করি কিছুই মাথায় আসছে না।" বসরা, ফারস, আহওয়ায, ওয়াসিত, মাদায়েন, সাওয়াদ ইত্যাদি স্থান থেকে স্থানীয় সরকারের পতনের খবর আসছিল এবং চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। দীর্ঘ দুই মাস তাঁর পোশাক পরিবর্তনের ও বিছানায় শোয়ার সুযোগ হয়নি, সারা রাত জায়নামাযে কাটিয়ে

দিতেন।[১] কূফা থেকে পলায়নের জন্য তিনি সদা দ্রুতগামী অশ্বযান প্রস্তুত রেখেছিলেন। সৌভাগ্য তাঁর সাথী না হলে এ আন্দোলন তাঁর এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের ভিত উল্টে দিত (আল-ইয়াফিঈ, ১খ, পৃ. ২৯৯)।

এই বিপ্লব চলাকালে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর কর্মপন্থা প্রথমোক্ত বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সেই বিদ্রোহের সময় মানসূর কূফায় অবস্থান করছিলেন, রাতের বেলা শহরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকত-তখন তিনি জোরেশোরে এই আন্দোলনের প্রকাশ্য সমর্থন করেন। এমনকি তাঁর শাগরিদবৃন্দ আশংকা প্রকাশ করেন যে, তাদের সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি জনগণকে ইবরাহীমের সহযোগিতা করার এবং তাঁর হাতে বায়আত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন (আল-কারদারী), ২ খ, পৃ. ৭২; আল-মাক্কী, ২ খ, পৃ. ৮৪)। ইবরাহীমের সাথে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকে তিনি নফল হজ্জের তুলনায় ৫০ বা ৭০ গুণ বেশী মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করতেন (আল-কারদারী, ২ খ, পৃ. ৭১; আল-মাক্কী, ২ খ, পৃ. ৮৩)। আবূ ইসহাক আল-ফাযারী নামক এক ব্যক্তিকে তিনি একথাও বলেন যে, তোমার যে ভাই ইবরাহীমের সহযোগিতা করছেন-কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমার জিহাদের তুলনায় তোমার ভাইয়ের কাজ অনেক উত্তম (আল-জাসসাস, আহ্‌কামুল কুরআন, ১ খ, পৃ. ৮১) আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, ফাতওয়া-ই বাযযাযিয়ার রচয়িতা ইবনুল বাযযায আল-কারদারীর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্‌গণ ইমামের এই বক্তব্য উধৃত করেছেন। এসব বক্তব্যের স্পষ্ট অর্থ এই যে, ইমাম সাহেবের মতে মুসলিম সমাজকে আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের গোলযোগ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা বাইরের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তুলনায় অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝকিপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনি আল-মানসূরের একান্ত বিশ্বাসভাজন জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহতূবাকে নাফসে যাকিয়্যা ও ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে নিবৃত্ত করেন। তাঁর পিতা কাহতূবা ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁর তরবারি আবু মুসলিম-এর দূরদর্শিতা ও রাজনীতির সাথে মিলিত হয়ে আব্বাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

১. আত-তাবারী (৬খ, পৃ. ১৫৫-২৬৩) এই আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। উপরে আমরা তার সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ করেছি।

করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সেনাপতিদের মধ্যে আল-মানসূর তাঁকেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি কূফায় অবস্থান করে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ভক্তে পরিণত হন। একবার তিনি ইমামকে বলেন, আমি এ পর্যন্ত যত পাপ করেছি (অর্থাৎ মানসূরের অধীনে চাকরী করতে গিয়ে আমার হাতে যেসব অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে), তা সবই আপনার জানা আছে। এ সব পাপ মোচনের কি কোন উপায় আছে? ইমাম সাহেব বলেন, "আল্লাহ যদি জানেন যে, তুমি তোমার কার্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত, ভবিষ্যতে কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার জন্য তোমাকে বলা হলে তাকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজে নিহত হতে যদি প্রস্তুত হও, অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহর সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করলে তা হবে তোমার জন্য তওবা।" ইমাম সাহেবের এ উক্তি শুনে হাসান তাঁর সামনেই অঙ্গীকার করেন। এর কিছুকাল পরই নাফসে যাকিয়্যা ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। মানসূর হাসানকে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি এসে ইমামের নিকট তা জানান। ইমাম সাহেব বলেন, "এখন তোমার তওবার পরীক্ষার সময় এসেছে। প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে তোমার তওবা ঠিক থাকবে। অন্যথায় অতীতে যা করেছ তার জন্যও আল্লাহর কাছে ধরা পড়বে এবং এখন যা কিছু করবে, তার শাস্তিও পাবে।" হাসান পুনরায় নতুন করে তওবা করে ইমামকে বলেন, আমাকে হত্যা করা হলেও আমি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। অতএব তিনি মানসূরের নিকট গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আমি এ যুদ্ধে যাবো না। এ পর্যন্ত আমি আপনার আনুগত্য করতে গিয়ে যা কিছু করেছি, তা আল্লাহর আনুগত্য হয়ে থাকলে আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আর তা যদি আল্লাহর অবাধ্যতায় হয়ে থাকে, তা হলে আমি আর অধিক পাপ করতে চাই না।" মানসূর এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে হাসানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। হাসানের ভাই হামীদ এগিয়ে এসে বলেন, "বছর খানেক থেকে তাকে ভিন্নরূপে দেখছি। সম্ভবত তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি এই যুদ্ধে যাব।" পরে মানসূর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এ সকল ফকীহদের মধ্যে হাসান কার নিকট গমন করতো? বলা হলো। আবূ হানীফা (র)-এর নিকট তার বেশীর ভাগ যাতায়াত ছিল। ইমাম সাহেবের এই কর্মপন্থা হুবহু তাঁর নিম্নোক্ত দৃষ্টিভংগীর সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল যে, সফল এবং সৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকলে অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল বৈধই নয়, বরং ওয়াজিব

অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র)–এর কর্মনীতিও ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর পরিপন্থী ছিল না। নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের ঘাড়ে তো মানসূরের বায়আত রয়েছে, এখন আমরা খিলাফতের অপর দাবীদারদের সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি ফতোয়া দিয়ে বলেন, আব্বাসীদের বায়আত জোরপূর্বক গ্রহণ করা হয়েছে। আর জোর যবরদস্তী বায়আত–কসম–তালাক–যাই হোক না কেন তা বাতিল।[১] তাঁর এ ফতোয়ার ফলে অধিকাংশ লোক নাফসে যাকিয়্যার সহযোগী হয়ে পড়ে। পরে ইমাম মালেক (র)–কে ফতোয়ার শাস্তি ভোগ করতে হয়। মদীনার আব্বাসী শাসনকর্তা জাফর ইবনে সুলায়মান তাঁকে চাবুক মারেন এবং তার হস্ত কাঁধ থেকে স্থানচ্যুত হয় (আত–তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৯০; ইবনে খাল্লিকান, ৩ খ, পৃ. ২৮৫; ইবনে কাসীর, আল–বিদায়া ওয়ান–নিহায়া, ১০ খ, পৃ. ৮৪; ইবনে খালদূন ৩ খ, পৃ. ১৯১)।

এই অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (রহ)— এর একার নয়

বিদ্রোহের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাওয়াল জামাআতের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) একাই তাঁর এই মত পোষণ করেন এমন কথা মনে করা ঠিক হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হিজরী প্রথম শতকে শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মত তাই ছিল যা ইমাম আবূ হানীফা (রহ) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার পর হযরত আবূ বাক্‌র (রা) প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেনঃ

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله فلا
طاعة لى عليكم ـ "

"যতক্ষণ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। কিন্তু আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করলে আমার জন্য তোমাদের কোন আনুগত্য নেই" (ইবনে হিশাম, ৪ খ, ৩১১; আল–বিদায়া, ৫ খ, পৃ. ২৮৪)।

---

১. আব্বাসীদের নিয়ম ছিল, বায়আত গ্রহণকালে তারা জনগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন যে, তারা এ বায়আতের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের স্ত্রী তালাক। তাই ইমাম মালেক (রহ) বায়আতের সাথে কসম এবং জোরপূর্বক তালাকের কথাও উল্লেখ করেছেন।

হযরত উমার (রা) বলেনঃ

من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا-

"মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে যে ব্যক্তি কারো বায়আ'ত করে সে এবং যার হাতে বায়আত করা হয়-সে নিজেকে এবং তাকে প্রতারিত করে এবং নিজেকে হত্যার জন্য পেশ করে।[১]

ইয়াযীদের রাজত্বের বিরুদ্ধে হযরত হুসাইন (রা) যখন বিদ্রোহ করেন, তখন অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবীদেরকে দেখেছেন এমন ফকীহ তাবিঈ তো প্রায় সকলেই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা) "একটা হারাম কাজ করতে যাচ্ছেন", কোন সাহাবী বা তাবিঈর এমন উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি। যে সকল ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (রা)-কে বাধা দিয়েছিলেন তাঁরা এই বলে বাধা দিচ্ছিলেন যে, ইরাকবাসী বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনি সফল হতে পারবেন না, এ পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনি কেবল নিজেকে বিপদাশংকার মুখে নিক্ষেপ করবেন। অন্য কথায়, এ ব্যাপারে তাঁদের সকলের মত তাই ছিল, যা পরবর্তীকালে ইমাম আবূ হানীফা (র) ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বয়ং কোন অবৈধ কাজ নয়। কিন্তু এ পদক্ষেপ গ্রহণের আগে দেখতে হবে যে, অসৎ নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে কি না। ইমাম হুসাইন (রা) কূফাবাসীদের উপর্যুপরি পত্রের ভিত্তিতে এ কথা মনে করেছিলেন যে, এত সহযোগী সমর্থক তিনি লাভ করেছেন, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটা সফল বিপ্লব করতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবা তাঁকে বারণ করেন, তাঁদের ধারণা ছিল কূফাবাসীরা তাঁর পিতা হযরত আলী (রা)-র এবং ভ্রাতা হযরত হাসান (রা) সাথে যেসব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাতে তাদের বিশ্বাস করা যায় না। তাই এই সকল সাহাবীদের সাথে ইমাম হুসাইনের

১. এটা বুখারী (কিতাবুল মুহারিবীন, বাব রাজমিল হুবলা মিনায যিনা)-এর বর্ণনার ভাষা। অপর এক বর্ণনায় হযরত উমার (রা)-এর এ শব্দও উক্ত হয়েছেঃ পরামর্শ ব্যতিরেকে যাকে নেতৃপদ দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা তার জন্য হালাল নয় (ফাতহুল বারী, ১২ খ, পৃ. ১২৫)। ইমাম আহমদ হযরত উমার (রা)-এর এ উক্তিও উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে যে ব্যক্তি কোন আমীরের হাতে বায়আত করেছে, তার কোন বায়আত নেই। বায়আত নেই সে ব্যক্তিরও, যার হাতে সে বায়আত করেছে -(মুসনাদে আহমাদ, ১খ, হাদীস নং ৩৯১)।

মতবিরোধ বৈধ ও অবৈধের প্রশ্নে ছিল না, বরং মতভেদ ছিল বাস্তব অবস্থার ব্যাপারে।

তেমনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্যাতনমূলক শাসনামলে আবদুর রহমান ইবেন আশআস বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তৎকালীন সেরা সেরা ফকীহ–সাঈদ ইবনে জুবাইর, আশ–শা'বী, ইবনে আবী লায়লা এবং আল–বুহতুরী তাঁর পাশে দাঁড়ান। আল্লামা ইবনে কাসীরের বর্ণনা মতে আলেম–ফকীহদের এক বিরাট রেজিমেন্ট তাঁর সাথে ছিল। যেসব আলেম তাঁকে সমর্থন জানাননি, তাঁদের কেউই এ কথা বলেননি যে, এ বিদ্রোহ অবৈধ। এ উপলক্ষে ইবনুল আশআস–এর বাহিনীর সম্মুখে এ সকল ফকীহগণ যে ভাষণ দেন তা তাঁর চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে। ইবেন আবি লায়লা বলেনঃ

"ঈমানদারগণ! যে ব্যক্তি দেখে যে, যুলুম–নির্যাতন চলছে, অন্যায়ের দিকে আহ্বান জানান হচ্ছে–সে যদি অন্তরে তাকে খারাপ জানে, তবে সে রেহাই পেয়েছে, মুক্তি লাভ করেছে। মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে প্রতিদান লাভ করেছে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলেমা বুলন্দ করা এবং যালেমদের দাবী পদানত করার জন্য এসব লোকের বিরুদ্ধে তরবারির সাহায্যে বিরোধিতা করে সে লোকই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে, বিশ্বাসের আলোয় অন্তরকে আলোকিত করে। সুতরাং যারা হারামকে হালাল করেছে, উম্মাতের মধ্যে খারাপ পথ উন্মুক্ত করেছে, যারা সত্যচ্যুত, সত্যের পরিচয় যারা রাখে না, যারা অন্যায় পথে কাজ করে, অন্যায়কে যারা অন্যায় বলে স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

আশ–শা'বী (রহ) বলেনঃ

"ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা এ কথা মনে করো না যে, ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা খারাপ কাজ। আল্লাহ্‌র কসম! আমার জানা মতে আজ দুনিয়ার বুকে তাদের চেয়ে বড় কোন যালেম–অত্যাচারী এবং অন্যায় ফয়সালাকারী আর কেউ নেই। নেই এমন কোন দল। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেন কোন প্রকার শৈথিল্য প্রশ্রয় না পায়।"

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ) বলেনঃ

"ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। কারণ শাসনকার্যে তারা যালেম। দীনের কার্যে তারা ঔদ্ধত্যপরায়ণ। তারা দুর্বলকে হেয় প্রতিপন্ন করে নামায বরবাদ করে" (আত–তাবারী, ৫খ, পৃ. ১৬৩)।

পক্ষান্তরে যেসব বুযুর্গ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইবনে আশআস-এর সহযোগিতা করেননি, তাঁরাও এ কথা বলেননি যে, এ লড়াই হারাম। বরং তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, এটা করা কৌশলের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ হাজ্জাজকে তোমাদের উপর শুধু শুধু চাপিয়ে দেননি বরং হাজ্জাজ একটি শাস্তি বিশেষ। সুতরাং তরবারির সাহায্যে আল্লাহর এ শাস্তির মুকাবিলা করো না বরং ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নীরবে তা সহ্য করে যাও। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তার জন্য ক্ষমতা প্রার্থনা কর"

–(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৭ খ, ১৬৪; আল-বিদায় ৯ খ, পৃ. ১৩৫; তাবারী, ৫ খ, পৃ. ১৬৩)।

এ ছিল হিজরী প্রথম শতকের দীনের ধারক ও বাহকদের সাধারণ অভিমত। এ শতকেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ) চক্ষু উন্মীলিত করেন। অতএব তাঁর অভিমতও ছিল তাই, যা ছিল তাঁদের অভিমত। এরপরে হিজরী দ্বিতীয় শতকে সেই অভিমত প্রকাশ পেতে থাকে, অধুনা যাকে জমহুর আহলুস সুন্নাহ্‌র অভিমত বলা হয়। এ অভিমত প্রকাশের কারণ এই ছিল না যে, এর সপক্ষে এমন কিছু অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা প্রথম শতকের মনীষীদের নিকট উহ্য ছিল; বা আল্লাহ না করুন, প্রথম শতকের মনীষীগণ কুরআন-সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে মত গ্রহণ করেছিলেন। বরং মূলত এর দু'টি কারণ ছিল। একঃ স্বৈরাচারী শাসকরা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের কোন পথই উন্মুক্ত রাখেনি। দুইঃ তরবারির জোরে পরিবর্তনের যে সকল চেষ্টা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তার এমন সব পরিণতি প্রকাশ পেতে থাকে, যা দেখে সে পথেও কল্যাণের কোন আশা অবশিষ্ট ছিল না (আরও দ্রষ্টব্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুজুরাত, ১৭ নং টীকা)।

তরজমানুল কুরআন
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খৃ.।

বিদ্রোহ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর নীতি

প্রশ্নঃ "খিলাফত প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর নীতি"–র যা কিছু ব্যাখ্যা আপনি তরজমানুল কুরআনে পেশ করেছেন এবং তাতে যেসব ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উধৃত করা হয়েছে সে সম্পর্কে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তার সাথে একমত হওয়া কঠিন। বিভিন্ন ঘটনা যে ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে তার দ্বারা তরজমানুল কুরআনের পাঠকগণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর নীতি সম্পর্কে মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হতে পারে। বরং তারা ইমাম সাহেবের নীতির মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরিত্য দেখতে পাবেন, যদি তাঁর নীতি সম্পর্কে তাদের সামান্যও ফিক্‌হী জ্ঞান থেকে থাকে। আপনার সামনে একটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দ্বিতীয় কিস্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার বরাত ইবনুল আছীর ও কারদারী ছাড়াও আল–মাবসূত, ১০ খ, পৃ. ১২৯ উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘটনা মাওসিলের অধিবাসীদের বিদ্রোহ সম্পর্কিত। তা আপনি এমন বাচনভংগিতে পেশ করছেন যা পাঠে একজন পাঠক তাকে মুসলিম প্রজাদের বিদ্রোহের সাথে সম্পর্কিত মনে করবে, অন্য কোন অর্থ করবে না। অথচ আল–মাবসূতের বর্ণনা অনুযায়ী তা মুশরিকদের বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত–যারা মাওসিলের অধিবাসী ছিল এবং যাদের সাথে দো আনীকী[1] সন্ধি করেছিলেন। এই ঘটনায় আপনি একথাও বলেছেন যে, মানসূর মাওসিলের অধিবাসীদের থেকে বর্তমান বিদ্রোহ করার পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন তা তাদের জীবন ও সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলঃ "ভবিষ্যতে তারা যদি বিদ্রোহে লিপ্ত হয় তবে তাদের জীবন ও সম্পদ তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে।" এ বিষয়ে মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (রহ) সহ একদল ফকীহ্–এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "চুক্তির আলোকে তাদের জানমাল আমার জন্যও বৈধ হয়ে গেছে কিনা?" আর এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, "মাওসিলবাসীদের

১. দো আনীকী বলতে আব্বাসী খলীফা আল–মানসূরকে বুঝানো হয়েছে। কৃপণ স্বভাবের কারণে তাঁকে দো আনীকী বলা হত। অর্থাৎ পাই পয়সার জন্য জীবন দানকারী–(তরজুমান)।

উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকুন। তাদের রক্ত ঝরানো আপনার জন্য বৈধ নয়।" অথচ আল-মাবসূত গ্রন্থের বাক্য থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এই চুক্তি বিদ্রোহীদের জানমাল হরণ বৈধ বা অবৈধ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, বরং মুশরিক বন্দীদের হত্যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল যাদেরকে বিদ্রোহীরা রেহেন (বন্দী) হিসাবে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করেছিল এবং তারা তাদের হাতে বন্দী হিসাবে ছিল।[১] যেহেতু উভয় পক্ষ চুক্তিপত্রে এই শর্ত নির্দিষ্ট করে রেখেছিল যে, এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের বন্দীদের হত্যা করে তবে শেষোক্ত পক্ষও প্রথমোক্ত পক্ষের বন্দীদের হত্যা করতে পারবে। এবং মাওসিলবাসীরা প্রথমে তাদের হাতে বন্দী মুসলমানদের হত্যা করেছিল, এজন্য আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জেনে নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল যে, আমাদের হাতে বন্দী মুশরিক কয়েদীদের সম্পর্কে আমরা কি করব; যাদেরকে বিদ্রোহীরা আমাদের হাতে সোপর্দ করেছে। এই কয়েদীদের মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ফতোয়া দেন যে, "তাদের জানমাল হরণ করা আপনার জন্য বৈধ নয়।" ইমাম আজম (রহ) মুসলিম প্রজাদের বিদ্রোহ সম্পর্কে স্বয়ং বিদ্রোহীদের ব্যাপারে ঐ কথা বলেননি যে, তাদের হত্যা করা বৈধ নয়।

অনন্তর স্বয়ং বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম আজম (রহ) এই ফতোয়া কি করে দিতে পারেন যে, তাদের হত্যা করা জায়েয নয়, যেখানে "ইমাম সারাখসী (রহ) এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম আজম (রহ)-এর মাযহাব উল্লেখ করেন যে, বিদ্রোহীরা যখন এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার কারণে দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (সে স্বৈরাচারীই হোক না কেন) তবে তাদের হত্যা করা জরুরী।"

فان كان المسلمون مجتمعين على واحد و كانوا آمنين به
والسبيل آمنة فخرج عليه طائفة من المسلمين فحينئذ
يجب على من يقوى على القتال ان يقاتل مع المسلمين الخارجين

"যদি মুসলমানগণ একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকে, শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিরাজিত থাকে এবং রাস্তা-ঘাট নিরাপদ

---

১. এখানে রেহেন অর্থ বন্দী বা কয়েদী নয়, বরং সন্ধি রক্ষার্থে জামিন স্বরূপ প্রদত্ত ব্যক্তিবর্গ-(তরজমানুল কুরআন)।

থাকে,এরপরও মুসলমানদের কোন দল বিদ্রোহ করলে যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১০ খ, পৃ. ১২৪)।

ইমাম সারাখসী (রহ) এই হুকুমের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রামাণ পেশ করেছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেঃ

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ-

"অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক দল যদি অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করে তবে সীমালংঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই কর – যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে"

– (সূরা হুজুরাতঃ ৮)।

কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের মোকাবিলায় ইমাম আজম (রহ) শেষ পর্যন্ত একথা কিভাবে বলার দুঃসাহস করতে পারেন যে, "বিদ্রোহীদের হত্যা করা বৈধ নয়?" এ সম্পর্কে আল্লামা সারাখসী তাঁর আল-মাবসূত গ্রন্থে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা আমি এখানে নকল করার প্রয়োজন মনে করি না। আশা করি আপনি নিজে পুনর্বার ঐ স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এই পত্রের জওয়াবে আপনার প্রবন্ধের সংশোধন করবেন এবং সর্বসাধারণের উপকারার্থে চিঠিখানাও পত্রস্থ করবেন।

উত্তরঃ খুব সম্ভব আপনি ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে আমার প্রবন্ধের এই স্থানটুকু দেখেছেন এবং তাড়াহুড়া করে মত প্রকাশ করেছেন। যে স্থানে এই আলোচনা এসেছে সেখানে আলোচ্য বিষয় এটা ছিল না যে, মাওসিলবাসীদের ব্যাপারে ফিকহী দৃষ্টিভংগী কি ছিল। বরং আলোচ্য বিষয় ছিল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা নির্ভিক ছিলেন- তা তুলে ধরা। এ কারণে আমি এখানে মাওসিলবাসীদের আসল ব্যাপার কি ছিল তা আলোচনা করিনি। আপনি ২৮৪ নং পৃষ্ঠা থেকে ২৯৭ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুরা প্রবন্ধটি দেখে নিলে আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে যে, সেখানে এই আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক।

এখন আপনি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এবং আমি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব। মাওসিলবাসীদের সম্পর্কে ইবনুল আছীর ও আল–কারদারীর বর্ণনা শামসুল আইম্মা সারাখসীর বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। শামসুল আইম্মা বলেন যে, মাওসিলবাসী যারা বিদ্রোহ করে তারা ছিল কাফের। মানসূরের সাথে তাদের এই ঘটনা ঘটেছিল যে, তারা মানসূরের যামিন স্বরূপ রাখা লোকদের হত্যা করেছিল। তাদের সাথে এই চুক্তি হয়েছিল যে, তারা যদি এরূপ করে তবে মানসূরেরও এই অধিকার থাকবে যে, তিনিও তাদের যামিন স্বরূপ রাখা লোকদের হত্যা করবেন। শামসুল আইম্মার বর্ণনা অনুযায়ী মানসূর এই প্রসংগটি ফকীহ্‌দের সামনে পেশ করেন যে, তিনি উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী মাওসিলবাসীদের যামিন স্বরূপ রাখা লোকদের হত্যা করার অধিকারী কিনা? অপর দিকে ইবনুল আছীরের বর্ণনা এই যে, মাওসিলে হাসসান ইবনে মুজালিদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং মানসূর ফকীহ্‌গণের সামনে যে প্রসংগ উত্থাপন করেছিল তা এই ছিল না যে, আমি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারি কিনা, বরং বিষয়টি ছিল এইঃ

ان اهل موصل شرطوا الى انهم لا يخرجون على فان فعلوا حلت دماؤهم واموالهم -

"মাওসিলবাসীরা আমার সাথে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তারা যদি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাদের জান–মালের উপর হস্তক্ষেপ আমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে"।

রক্ত সম্পদ বৈধ হওয়ার অর্থ আপনি স্বয়ং জানেন যে, কারো বিরুদ্ধে শুধু অস্ত্র ধারণই বৈধ হওয়া নয়, বরং তার অর্থ এই যে, যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হই তবে অতঃপর আমার জন্য তাদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা এবং তাদের ধনসম্পদ লুটে নেয়া আমার জন্য বৈধ। মানসূর মূলতঃ এই প্রশ্নই ফকীহ্‌গণের সামনে পেশ করেছিলেন। কতিপয় ফকীহ্ এর জওয়াবে বলেন যে, এসব লোকেরা চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের জান–মাল আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছে। এখন আপনি যদি তা করতে চান করতে পারেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তাকে অবৈধ প্রমাণ করেছেন। আল–কারদারীও প্রায় এরূপ কথাই লিখেছেন। এখন আপনি বলুন, এর উপর আপনার কি অভিযোগ আছে? ইমাম আবূ হানীফা (রহ) –এর দৃষ্টিভংগী কি এই ছিল যে, সরকার মুসলিম বিদ্রোহীদের পরাস্ত করতে পারলে তাদের সমস্ত

প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের পাইকারীভাবে হত্যা করে তাদের সহায়সম্পদ লুটে নেয়ার অধিকারী হয়? একথা উহ্য রেখেই বলুন যে, এই মুসলিম বিদ্রোহীরা পূর্বে এই শর্ত কবুল করে থাকে বা না থাক।

আমার মতে এই প্রসংগে ইবনুল আছীর ও আল-কারদারীর বর্ণনাই সঠিক এবং শামছুল আইম্মার বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। কারণ মানসূরের রাজত্বকালে মাওসিলে না কাফেরদের কোন রাজত্ব ছিল, আর না সেখানকার অমুসলিম নাগরিকদের এতটা শক্তি ছিল যে, তারা আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু আমি যেহেতু এই পুরা ঘটনাটি এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছি-তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর সঠিক মত প্রকাশ করার নির্ভিকতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করার জন্য তিনজন লেখকেরই বরাত দিয়েছি। কারণ এ বিষযে তাদের তিন জনের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে।

প্রশ্নঃ তরজমানুল কুরআনের ১৯৬৩ সালের নভেম্বর সংখ্যায় বিদ্রোহ শীর্ষক বিষয়ে আমার পূর্বেকার চিঠি ও তার যে উত্তর ছাপানো হয়েছে এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উত্তরে আমার সেই অস্থিরতা দূরীভূত হয়নি যা খিলাফত প্রসংগ অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি আমার আবেদন কিছুটা বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে পেশ করব। আশা করি তার জওয়াবও আপনি তরজমানুল কুরআনে প্রকাশ করে অত্র পত্রিকার পাঠকদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

"খিলাফত শীর্ষক বিষয়ে" আপনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর যে নীতি বর্ণনা করেছেন তাতে আপনি "জালেম ফাসেক" -এর ইমামত (নেতৃত্ব) সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমতের তিনটি বৃহৎ দিক পেশ করেছেন। (এক) ইমাম সাহেব না মুতাযিলা ও খারিজীদের মত তার ইমামতকে এই অর্থে বাতিল সাব্যস্ত করেন যে, তার নেতৃত্বে কোন সামগ্রিক কাজ বৈধ পন্থায় সমাধা হতে পারে না এবং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে যাবে; আর না মুরজিয়াদের মত তাকে এরূপ বৈধ ও যথার্থ বলে স্বীকার করেন যে, - মুসলমানগণ তার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে বসে যাবে এবং তার পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না। ইমাম সাহেব বরং এই দুই চরমপন্থী মতের মাঝখানে এই ধরনের ইমামত সম্পর্কে একটি ন্যায়নিষ্ঠ

ও ভারসাম্যপূর্ণ মত পেশ করেন। তা এই যে, তার নেতৃত্বে যাবতীয় সামাজিক ও সামগ্রিক কাজ বৈধ হবে। কিন্তু এই ইমামত স্বয়ং অবৈধ ও বাতিল গণ্য হবে। (দুই) স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মুসলমানের সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার অধিকার থাকবে, বরং এই দায়িত্ব পালন করা সব মুসলমানের কর্তব্য। (তিন) ইমাম আজম (রহ) -এর মতে এ ধরনের জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, এই বিদ্রোহের ফলে যেন বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার সূত্রপাত না হয়, বরং দুষ্কৃতপরায়ন নেতৃত্বের স্থলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। এই অবস্থায় বিদ্রোহ কেবলমাত্র বৈধই নয়, বরং অপরিহার্য।

এ প্রসংগে আমার আবেদন এই যে, ইমাম আবূ হানীফার মতে "জালেম ও ফাসেক" (স্বৈরাচারী ও দুষ্কৃতপরায়ন)-এর ইমামত (নেতৃত্ব) বাতিল এবং "তার সরকারের" "বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা জায়েয" একথা বলায় তাঁর মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না। আমার মতে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাব এই যে, স্বৈরাচারী ও অসৎ ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাবলে যদি জনগণের উপর চেপে বসে-যাকে ফকীহগণের পরিভাষায় মুতাগাল্লিব বলা হয়-এবং তার নির্দেশ গায়ের জোরে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে তবে সে জালেম -ফাসেক যাই হোক, এবং প্রচলিত পন্থায় তার আনুগত্যের শপথ না নেয়া হোক, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তার নেতৃত্বের এই অর্থ করে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করেন যে, তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবৈধ মনে করেন। তিনি যেভাবে তার নেতৃত্বে অন্যান্য সামগ্রিক কার্যাবলী জায়েয ও নির্ভরযোগ সাব্যস্ত করেন, অনুরূপভাবে বিদ্রোহকেও এ ধরনের সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ সাব্যস্ত করেন। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে আমার এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

والامام يصير اماما بالمبايعة من الاشراف والاعيان-
وكذا باستخلاف امام قبله وكذا بالتغلب والقهر كما فى
شرح المقاصد-قال فى المسايرة ويثبت عقد الامامة اما
باستخلاف الخليفة اياه واما ببيعة جماعة من العلماء او من
اهل الرأى والتدبير...... ولو تعذر وجود العلم والعدالة

فمن تصدى للامامة وكان فى صرفه عنها اثارة فتنة لا تطاق
حكمنا بانعقاد امامة كيلا نكون كمن يبنى قصرًا ويهدم مصرًا
...... وتجب طاعة الامام عادلا كان او جائرًا اذا لم
يخالف الشرع فقد علم ان الامام يصير اماما بثلاثة
امور لكن الثالث فى الامام المتغلب - وان لم تكن فيه شروط
الامامة - اهـ (رد المختار ج ۳ ص۴۲۸)

"সম্মানিত ও প্রভাবশালী লোকদের বাইআত হওয়ার মাধ্যমে ইমাম নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী ইমামের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের মাধ্যমেও এবং শক্তিবলে নেতৃপদে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমেও ইমাম হওয়া যায়, – যেমন শারহুল মাকাসিদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মাসাইরা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, খলীফা যদি নিজের স্থলাভিসিক্ত হিসাবে কারো নাম ঘোষণা করেন অথবা একদল আলেম অথবা একদল প্রতিভাবান ব্যক্তি আনুগত্যের শপথ নেয় তবে এভাবেও খলীফা নিযুক্ত হতে পারে...... খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে যদি জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠার অভাব থাকে কিন্তু তাকে খিলাফত থেকে সরিয়ে দিলে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে আমরা এরূপ ব্যক্তির খিলাফত অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে রায় দেই, যাতে আমরা এমন ব্যক্তির মত না হই– যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে কিন্তু গোটা শহর ধ্বসিয়ে দেয়... ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক অথবা জালেম, তার আনুগত্য অপরিহার্য–যতক্ষণ সে শরীআতের বিরুদ্ধে না যায়। এটা জানা কথা যে, ইমাম তিনটি বাক্যের মাধ্যমে নিযুক্ত হন যার মধ্যে তৃতীয়টি জোরপূর্বক ইমাম হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, চাই তার মধ্যে ইমাম হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান না থাক"। (রাদ্দুল মুহতার, ৩ খ, পৃ.৪২৮)।

যাই হোক ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা (আদালাত) বর্তমান থাকা শর্ত, কিন্তু ইমামত সঠিক ও যথার্থ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়, বরং অগ্রাধিকারের জন্য শর্ত। এই কারণে ফাসেকের ইমামতকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলা হয়েছে, অযথার্থ বলা হয়নি।

وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق
الامامة مع الكراهة - اهـ (شامى ج ۱ ص۵۱۲)

"হানাফীগণের মতে ন্যায়নিষ্ঠা-শুদ্ধ ও যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। অতএব ফাসেক ইমামের আনুগত্য অপছন্দনীয় হলেও বৈধ"

– (শামী, ১ খ, পৃ. ৫১২)।

এই বিধানের আওতায় হানাফীগণ জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর ইমামতকে সহীহ্ বলেন।

وتصح سلطنة متغلب للضرورة

"জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর সরকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সঠিক"

–(পূ. গ্রন্থ)।

এই ধরনের ফাসেক সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর নীতি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ويجب ان يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن ابى حنيفة اه

"তার জন্য দোয়া করা অত্যাবশ্যক, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। আবূ হানীফা থেকে এভাবে বর্ণিত আছে।"

এসব উধৃতি ইবনুল হুমাম তাঁর মাসাইরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে একজন ফাসেক ও স্বৈরাচারী শাসকের সরকারের অধীনে যেভাবে দীনের অন্যান্য সামগ্রিক কাজ বৈধ পন্থায় সম্পাদন করা যেতে পারে অনুরূপভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে বিদ্রোহ ও তার পদচ্যুতি উভয়ই বৈধ। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, বিদ্রোহ ও সরকারের উৎখাত যেন বিশৃঙ্খলার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু প্রতি যুগে প্রতিটি বিদ্রোহ তার সাথে অনেক বিপর্যয়সহ আত্মপ্রকাশ করে-এজন্য কতিপয় হানাফী ফকীহ্ এ পর্যন্তও বলেছেন যে,

اما الخروج على الامراء فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين اه (مرقات)

"সরকারী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের ঐক্যমত অনুযায়ী হারাম (অবৈধ), চাই সে ফাসেক অথবা জালেমই হোক না কেন"-(মিশকাত)।

এজন্য এরূপ সরকারের অধীনে মৌখিকভাবে দীনের প্রচারের দায়িত্ব পালন করলেই যথেষ্ট হবে।

মুসলিম বিদ্রোহীদের সম্পর্কে আমি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর দৃষ্টিভংগী যতটা অনুধাবন করতে পেরেছি তা এই যে, যেসব অবস্থায় বিদ্রোহ করা জায়েয নয় সেই অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর মতে যারা বিদ্রোহ করেছে তাদের হত্যা করা বৈধ। অবশ্য যেসব লোক বিদ্রোহীদের সাথে বিদ্রোহে যোগদান করেনি তাদের হত্যা করা বৈধ নয়। চাই তারা শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ অথবা অন্ধই হোক, অথবা অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষই হোক যারা বিদ্রোহীদের সাথে বিদ্রোহে যোগদান করেনি। এর প্রমাণ স্বরূপ হানাফী ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য দেখা যেতে পারে। ইমাম সারাখসী (রহ) তাঁর আল–মাবসূত গ্রন্থের ১০ম খন্ডে ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

فان كان المسلمون مجتمعين على واحد وكانوا آمنين به والسبيل
آمنة فخرج عليه طائفة من المسلمين فحينئذ يجب على
من يقوى على القتال ان يقاتل مع امام المسلمين الخارجين-١٢٤

"মুসলমানগণ যদি একজন শাসকের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকে, শান্তি–শৃংখলার মধ্যে থাকে এবং যাতায়াতের পথও নিরাপদ থাকে, অতঃপর এই শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি দল বিদ্রোহ করে তবে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে সক্ষম তার কর্তব্য হচ্ছে মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা।"

যুদ্ধ অপরিহার্য হওয়ার জন্য ইমাম সারাখসী (রহ) তিনটি দলীল পেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতঃ

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ -

"অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে"–(সূরা হুজুরাতঃ ৯)।

ইমাম সাহেব যুদ্ধ অপরিহার্য হওয়ার সপক্ষে আরও একটি দলীল পেশ করেছেনঃ

ولان الخارجين قصدوا اذى المسلمين واماطة الاذى من

ابواب الدين ـ وخروجهم معصية ففى القيام بقتالهم نهى

عن المنكر وهو فرض ـ

"তা এজন্য যে, বিদ্রোহীরা মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেছে। আর কষ্ট দূরীভূত করা দীনের অঙ্গ এবং তাদের বিদ্রোহ গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অন্যায়ের প্রতিরোধের অন্তর্ভূক্ত এবং তা ফরজ।" তিনি তৃতীয় দলীল এই বর্ণনা করেছেনঃ

ولانهم يهيجون الفتنة قال صلى الله عليه وسلم الفتنة

نائمة لعن الله من ايقظها ـ فمن كان ملعونا على لسان

صاحب الشرع صلعم يقاتل معه اھ ـ

"এবং এজন্য যে, তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। মহানবী (স) বলেনঃ বিশৃংখলা হচ্ছে নিদ্রালু। যে ব্যক্তি তাকে জাগরিত করে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। অতএব যে ব্যক্তি শরীআত প্রণেতার বাণী অনুযায়ী অভিশপ্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।"

উপরোক্ত উধৃতিগুলোর সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। শরীআতের দৃষ্টিতে এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হতে পারে যাদের রক্ত নিরপরাধ নয়। মহানবী (স)–এর নিম্নোক্ত বাণীতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছেঃ

اُمِرْتُ اَنْ اقاتِلَ النّاس حتى يقولوا لا اله الا الله وانّ محمدًا

رسول الله فاذا فعلوا ذالك عصموا منى دماءهم واموالهم الحديث

"আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে–যতক্ষণ না তারা বলেঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রসূল।' যখন তারা এরূপ করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।"

অতএব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যখন বাধ্যতামূলক হল তখন জানা গেল যে, তাদের জীবনের পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা অর্জিত নেই এবং যুদ্ধও বৈধ হবে। এ কারণেই হানাফী ফকীহ্‌গণ নিজেদের গ্রন্থসমূহে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন যে, বিদ্রোহীদের হত্যা করা বৈধ। 'বাদাই ওয়াস সানাই' গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্রোহীদের হত্যা করা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

واما بيان من يجوز قتله منهم ومن لا يجوز فكل من لا يجوز
قتله من اهل الحرب من الصبيان والنسوان والاشياخ
والعميان لا يجوز قتله من اهل البغى ـ لان قتلهم لدفع
شر قتالهم فيختص باهل القتال وهؤلاء ليسوا من اهل
القتال فلا يقتلون الا اذا قاتلوا فيباح قتلهم فى حال
القتال وبعد الفراغ من القتال   اهـ ج ٧، ص ١٤١

"যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্যে যাদের হত্যা করা বৈধ এবং যাদের হত্যা করা বৈধ নয়– এসম্পর্কে বলা যায় যে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও অন্ধদের হত্যা করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বিদ্রোহীদের মধ্যেকার এসব লোকদেরও হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ বিদ্রোহীদের কেবলমাত্র তাদের হত্যাকান্ডের নিকৃষ্টতা বন্ধ করার জন্য হত্যা করা হয়। এজন্য তা যুদ্ধ করার যোগ্য লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এসব লোক যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। অতএব তাদের হত্যাও করা যাবে না। তবে তারা যদি যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করা যাবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বা তার পরেও" (৭ খ, পৃ. ১৪১)।

ফকীহগণের এসব বক্তব্যের আলোকে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর মাযহাব পরিস্কারভাবে এই জানা যায় যে, মুসলিম বিদ্রোহীদের উপর ইসলামী সরকার বিজয়ী হলে সে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী, চাই তারা পূর্বে এই শর্তে বিদ্রোহ করলে মৃত্যুদন্ড ভোগ কবুল করুক বা না করুক। কিন্তু এই যুদ্ধ কেবলমাত্র বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ করা পর্যন্ত চলতে পারে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। অবশ্য তাদের সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল (গনীমত) হিসাবে বন্টন করা যাবে না, বরং যুদ্ধশেষে অথবা অস্ত্র সমর্পণের পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দিতে হবে।

وكذالك ما اصيب من اموالهم يرد اليهم لانه لم يتملك
ذالك المال عليهم لبقاء العصمة بالدار والاحراز فيه اهـ

"অনুরূপভাবে তাদের সম্পদ থেকে যা কিছু লওয়া হবে তা তাদের ফেরত দিতে হবে। কারণ এই সম্পদ দারুল–ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্রে) থাকার

কারণে নিরাপদ এবং তা বিজয়ীর এলাকা হিসাবে গণ্য হবে না" (আল-মাবসূত, ১০ খ, পৃ.১২৬)।

ফকীহগণের এসব বক্তব্যে যদি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে, যেমন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তবে তা বর্তমান থাকতে বুদ্ধিবৃত্তি কি করে এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, মাওসিলে মুসলমানরা বিদ্রোহ করেছিল এবং মানসূরের সাথে যেহেতু তারা এই শর্ত করেছিল যে, ভবিষ্যতে তারা যদি মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাদের জান-মাল তার জন্য হালাল হয়ে যাবে? এজন্য ফকীহ্গণের সামনে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, যুদ্ধশেষে এসব বিদ্রোহীদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে কি না এবং এ সম্পর্কেই মানসূরের বক্তব্যের উপর ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাদের জান-মাল (হরণ) আপনার জন্য বৈধ নয়।

পুনরায় একথা অনেকটা আশ্চর্যজনক মনে হয়, আপনি শামসুল আইম্মা সরাখসীর বর্ণনা শুধু এ কারণে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যে, তাঁর বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিপরীত। অথচ বিদ্রোহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফকীহ্ সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রবীণ ফকীহ্ এবং ইমাম আজমের মত একজন ফিকহ্-এর ইমামের মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ফকীহগণের বক্তব্যের উপরই অধিক নির্ভর করা উচিৎ। কোন মাযহাবের একজন ইমামের ফিকহী মতামত সংকলনের ক্ষেত্রে যতটা ভুল হতে পারে তার তুলনায় ইতিহাসের ঘটনাবলী সুসংবদ্ধ করতে গিয়ে অধিক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ইমাম সারাখসী (রহ) তাঁর আল- মাবসূত গ্রন্থে এই ঘটনা যেভাবে নকল করেছেন-শায়খ ইবনুল হুমামও তাঁর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে (৫ খ, পৃ. ৩৪১) হুবুহু সেভাবে নকল করেছেন। এই দুই ইমামের মোকাবিলায় ইবনুল আছীর অথবা আল-কারদারীর বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া নিশ্চিতই আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞানের বাইরে।

উত্তরঃ বিদ্রোহ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাব সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন সে সম্পর্কে অধিক কিছু বলার পূর্বে আমি চাই যে, আপনি আরও দুই-তিনটি কথার উপর আলোকপাত করুন।

এক, আবূ বাক্র আল-জাসসাস, আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী ও ইবনুল বায্যায আল-কারদারীও হানাফী ফকীহ্দের অন্তর্ভূক্ত কিনা? আপনার

অজ্ঞাত থাকার কথা নয় যে, আবূ বাক্‌র আল্‌-জাস্‌সাস (রহ) প্রবীণ (মুতাকাদ্দিমীন) হানাফী ফকীহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত, আবূ সাহ্‌ল আল -যাজ্জাজ ও আবুল হাসান আল-কারখীর ছাত্র এবং নিজ যুগের (৩০৫-৩৭০ হি.) ইমাম আবূ হানীফা বলে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত তাফসীর "আহ্‌কামুল কুরআন" (কুরআনের বিধান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত) হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হের কিতাবসমূহের মধ্যে গণ্য। আল-মুওয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী (৪৮৪-৫৬৮ হি.)-ও হানাফী ফকীহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আল-কিফতীর বক্তব্য অনুযায়ীঃ

"كانت له معرفة تامة في الفقه والادب-"

"ফিক্‌হ ও সাহিত্যে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন।"

আল-কারদারী ও হানাফী ফকীহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত এবং 'ফতোয়া আল-বায্‌যাযিয়া,' 'আদাবুল ফুকাহা,' এবং আল -মুখতাসার ফী বাইয়ানি তা'লীফাতিল আহ্‌কাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। আমি উপরোক্ত তিনজন ফকীহ্‌-এর গ্রন্থাবলী থেকে হাওয়ালাসহ যা কিছু নকল করেছি, আমি চাই যে, আপনি সেগুলোর মর্যাদা সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করুন।

দুই, হযরত যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা) ও নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনায় ইমাম আজম (রহ)-এর যে ভূমিকা উপরোক্ত তিনজন গ্রন্থকার এবং অপরাপর অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন-তাকে আপনি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য করেন কি না? যদি এসব ঘটনা ভ্রান্ত হয় তবে আপনি কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের সাহায্যে তা প্রত্যাখ্যান করুন। আর যদি তা সঠিক হয়ে থাকে তবে ইমাম আজম (রহ)-এর মাযহাব অনুধাবনের জন্য ঐসব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া যেতে পারে কি না? যাই হোক একথা তো ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মত মহান ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে বিশ্বাস করা যায় না যে, তাঁর ফিকহী অভিমত একরূপ ছিল, আর ভূমিকা ছিল ভিন্নরূপ। অতএব দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মানতে হবেঃ হয় ঐসব ঘটনাই ভুল, অথবা ইমাম সাহেবের মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব তাই হতে পারে যা তাঁর ভূমিকার সাথে সংগতিপূর্ণ।

মাওসিলবাসীদের সম্পর্কে শামসুল আইম্মা সারাখসী যা কিছু লিখেছেন সে সম্পর্কে আমি এতটুকুই বলব যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি আল-কারদারীর।

তিনিও শুধু ঐতিহাসিকই নন, বরং ফকীহ্–ও। আল–কারদারী লিখেন যে, মানসূর ফকীহ্গণের সামনে নিম্নোক্ত প্রশ্ন পেশ করেছিলেনঃ

"اليس صح انه عليه السلام قال المومنون عند شروطهم؟
واهل موصل شرطوا على ان لا يخرجوا على وقد خرجوا على
عاملي وقد حل لي دماءهم"

"একথা কি সঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ 'মুমিনদের সাথে স্থিরিকৃত শর্তাবলীর উপর চুক্তি হবে।' মাওসিলের অধিবাসীগণ এই শর্ত মেনে নিয়েছিল যে, তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। অথচ তারা আমার প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের রক্তপাত আমার জন্য বৈধ হয়ে গেছে।"

জওয়াবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেনঃ

"انهم شرطوا لك ما لا يملكونه يعني دماءهم، فانه قد
تقرر ان النفس لا يجري فيها البذل والاباحة على ان
الرجل اذا قال لآخر اقتلني فقتله تجب الدية، وشرطت
عليهم ما ليس لك لان دم المسلم لا يحل الا باحدى معان
ثلاث فان اخذتهم اخذت بما لا يحل، وشرط الله احق
ان توفي به" (مناقب الامام الاعظم، ج ٢، صفحه ١٦-١٧)

"তারা আপনার সাথে এমন জিনিসের শর্ত করেছে যার মালিক তারা নয়, অর্থাৎ তাদের জীবন। এটা চূড়ান্ত ব্যাপার যে, জীবন কাউকে দান করা যায় না, এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমাকে হত্যা কর এবং সে তাকে হত্যা করল তবে হত্যাকারীর উপর রক্তপণ (দিয়াত) ধার্য হবে। আপনি তাদের সাথে এমন শর্ত করেছেন যার এখতিয়ার আপনার নেই। কারণ মুসলমানদের রক্তপাত তিনটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি ব্যতীত বৈধ হয় না। আপনি যদি তাদের জীবন সংহার করেন তবে তা আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্ত পূরণ করাই অধিক প্রয়োজনীয়"

–(মানাকিবুল ইমাম আল–আজাম, ২ খ, পৃ. ১৬–১৭)।

উপরোক্ত বাক্যে প্রশ্নকর্তা ও মুফতী উভয়ে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে, ঘটনাটি মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

২য় প্রশ্ন ঃ আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি যে, আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, আল মুওয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী ও ইবনুল বাযযায আল-কারদারী নিশ্চিতই ফকীহ্‌গণের মধ্যে গণ্য। অনুরূপভাবে আহ্‌কামুল কুরআন এবং আপনার উধৃত অন্যান্য গ্রন্থবলীও সুপ্রসিদ্ধ কিতাব। কিন্তু তথাপি মর্যাদার বিচারে তাঁদের স্থান ইমাম সারাখসীর অনেক নিচে। অনুরূপভাবে তাঁর আল-মাবসূত গ্রন্থের মর্যাদাও আহ্‌কামুল-কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থর তুলনায় হানাফী বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক উর্ধে। এজন্য ফিকহী বিষয়ে ইমাম আজমের অভিমত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সারাখসীর আল-মাবসূত-এর সিদ্ধান্তই নির্ভরযোগ্য হবে, আহ্‌কামুল কুরআন ইত্যাদির বক্তব্য নয়। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ) মুহাক্‌কিক ইবনে কামাল থেকে ফকীহ্‌গণের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে ইমাম সারাখসীকে তৃতীয় স্তরে স্থাপন করেছেন এবং এই স্তরটি হচ্ছে মুজতাহিদ ফকীহ্‌গণের। তিনি আবূ বাক্‌র আল-জাসসাসকে চতুর্থ স্তরে স্থাপন করেছেন যা কেবল মুকাল্লিদ (অনুগামী) ফকীহ্‌গণের স্তর।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বিদ্রোহ শীর্ষক বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাব তাই নির্ধারিত হবে যা আল- মাবসূত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আহ্‌কামুল কুরআন বা ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে তা নয়।

এখন হযরত যায়েদ ইবনে আলী ইবনিল হুসাইন ও নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনাবলীতে ইমাম আজম (রহ) -এর ভূমিকা সম্পর্কে বলা যায়, ঐতিহাসিক বিচারে আমি তাকে শতকরা একশো ভাগ সঠিক মনে করি। সকল ঐতিহাসিক একমত যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তাদের উভয়ের বিদ্রোহে তাদের সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই বিষয়ের আইনগত অবস্থা ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হানাফী ফিক্‌হের সমস্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এমনকি যাহিরী মাযহাবের গ্রন্থাবলীতেও বিদ্রোহ প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মাযহাব এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ন্যায়নিষ্ঠ শাসক তো দূরের কথা, যালেম, স্বৈরাচারী ও জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা অবৈধ এবং হারাম। অতএব আমাদেরকে পরস্পর বিরোধী এই দুই বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে হবে অথবা একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে বলা যায়, আমরা ফকীহ্গণের স্বীকৃত মূলনীতি সামনে রেখে হানাফী ফকীহ্গণের বর্ণনাকে ঐতিহাসিকদের বর্ণনার উপর এজন্য অগ্রাধিকার দেব যে, মাযহাব (মতামত) নির্ধারণের ব্যাপারে মাযহাবী অভিমত বর্ণনাকারীদের বক্তব্য অধিক নির্ভরযোগ্য। আর ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা ফকীহ্ও যেমন আবূ বাক্র আল-জাসসাস আর-রাযী, আল মুওয়াফ্ফাক আল-মাক্কী ও ইবনুল বাযযায, তাঁরা যেহেতু মর্যাদার দিক থেকে মাযহাবের মূল বর্ণনাকারীদের সমকক্ষ নন, তাই তাদের বর্ণনাও অন্যদের বর্ণনার মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য গণ্য করা যাবে না-চাই ঐতিহাসিক বর্ণনা ও ঘটনাবলী বর্ণনার মূলনীতি অনুযায়ী তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন।

আর আমরা যদি সামঞ্জস্য বিধান করতে চাই তবে আমার বুদ্ধিতে সামঞ্জস্য সাধনের উত্তম পন্থা এই যে, যেহেতু যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহের ঘটনা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ১২২ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনা আপনার লেখা অনুযায়ী ১৪৫ হিজরীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহ) আল্লামা ইবনে কাসীরের বক্তব্য (আল-বিদায়া, ১০ খ, পৃ. ১০৭) অনুযায়ী ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, জীবিত ছিলেন, তাই হতে পারে যে, ইমাম এভাবে নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের পর ইমাম সাহেব কমপক্ষে পাঁচ বছর হানীফা (রহ) শেষ জীবনে নিজের পূর্বের মত পরিবর্তন করে বিদ্রোহ প্রসংগে নতুন মত এভাবে ব্যক্ত করেনঃ "বিদ্রোহ হারাম, জায়েয নয়" এবং তিনি পূর্বতন মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে থাকবেন এবং ঐ সময় হতে ইমাম আযমও অপরাপর মুহাদ্দিসের অনুরূপ এই কথার প্রবক্তা হয়ে থাকবেন যে, " বিদ্রোহ জায়েয নয়, বরং হারাম। সংস্কার ও সংশোধনের জন্য বিদ্রোহের পরিবর্তে সত্য ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।" মোল্লা আলী আল-কারী (রহ) হয়ত এ কারণেই বলে থাকবেনঃ

واما الخروج عليهم فحرم باجماع المسلمين وان كانوا

فسقة ظالمين (مرقات)

"তাদের (প্রশাসকদের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসংগে বলা যায় যে, মুসলমানদের ঐক্যমত অনুয়ায়ী তা হারাম, চাই সে ফাসেক এবং জালেম হোক না কেন" – (মিরকাত)।।

উপরের আলোচনা থেকে যখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিদ্রোহ প্রসংগে ইমাম আজম (রহ)-এর মাযহাব নাজায়েযের পক্ষে এবং মুসলিম

বিদ্রোহীদের শাস্তি ফকীহ্গণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড, যেমন পূর্বের চিঠিতে ফকীহ্গণের উধৃতি পেশ করা হয়েছে। অতএব মাওসিলবাসীদের প্রসংগেও আমার মতে ইমাম সারাখসী ও শায়খ ইবনুল হুমামের বর্ণনাই সঠিক। এই ঘটনা মুশরিক যিম্মীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল, মুসলিম বন্দীদের সাথে নয়। কারণ মুসলিম বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মাযহাব এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, তাঁর মাযহাব এই নয় যে, তাদের হত্যা করা জায়েয নয়, "যদিও আল-কারদারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনা মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে হয়।"

উত্তরঃ আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আমার ধারণা এখন আমার দৃষ্টিভংগী আপনার নিকট উত্তমরূপে প্রতিভাত হবে। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করুন।

আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই বিশেষ প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর কর্মনীতি, আর আপনি যুক্তিপ্রমাণ পেশ করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের বক্তব্যসমূহ উধৃত করেছেন। আপনার মত বিজ্ঞ ফকীহ্-এর সামনে একথা অজ্ঞাত থাকতে পারে না যে, আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত বা কর্মনীতি এবং হানাফী মাযহাব এক জিনিস নয়। আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত কেবল তাঁর বক্তব্য ও কর্মের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। আর হানাফী মাযহাব বলতে ইমাম সাহের ছাড়াও তাঁর সহচরগণের এবং পরের মুজতাহিদ ফকীহ্গণের অভিমতও তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এমন অনেক জিনিস হানাফী মাযহাবভুক্ত হয়েছে যা ইমাম সাহেব বা তাঁর সহচরদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত নয়। এমনকি এই মাযহাবে এমন বিষয়ও বর্তমান আছে যে সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফতোয়া (সমাধান) ইমাম আজম (রহ)-এর বক্তব্যের বিপরীত।

আবূ বাক্‌র আল-জাস্‌সাস, আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী এবং ইবনুল বাযযায (রহ) চাই প্রথম স্তরের ফকীহ না হোন, কিন্তু ঐ স্তরের ফিক্‌হ সম্পর্কে তো অজ্ঞাত হতে পারেন না যে, নিজ মাযহাবের সবচেয়ে বড় ইমামের সাথে অনুসন্ধান ছাড়াই এমন কথা ও কাজ সম্পৃক্ত করবেন যা তাঁর নিশ্চিত অভিমতের পরিপন্থী। বিশেষত আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস (রহ) তো ইমাম আযম (রহ)-এর খুবই নিকটমত যুগের লোক ছিলেন। ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল এবং তাঁর জন্মের মাঝখানে মাত্র ১৫৫ বছরের ব্যবধান। বাগদাদে তিনি প্রবীণ হানাফী আলেমগণের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যাঁদের মাঝে আবূ হানীফা (রহ)-এর চিন্তাগোষ্ঠীর (School of Thoughts)

বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিল। কোন ভুল বক্তব্য যদি গুজবের মত ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত হত তাহলে তিনি হতেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি তাঁর সঠিক–ভ্রান্ত সবকিছু আহ্‌কামুল কুরআনের মত গুরুত্বপূর্ণ ফিক্‌হী গ্রন্থে নকল করে বসতেন। ইমাম আজম (রহ) থেকে এই মত প্রত্যাহারের কথা যদি প্রমাণিত হত তবে সে সম্পর্কেও তিনি অনবহিত থাকতেন না এবং তা গোপনও করতেন না।

ইমাম সাহেবের এই মত প্রত্যাহারের ধারণা এজন্যও যথার্থ নয় যে, তাই যদি হত তবে মানসূর তাঁর জীবনের শত্রু হতেন না, বরং এরপর তো তাঁর ও ইমাম সাহেবের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হত। উপরন্তু কেউ ইংগিতে অথবা পরোক্ষেও একথা নকল করেননি যে, ইমাম সাহেব কখনও নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করাকে ভ্রান্ত মনে করে থাকবেন।

আমার নিকট বিষয়টি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আযম (রহ)–এর অভিমত ও দৃষ্টিভংগী তাই ছিল যা তাঁর নকলকৃত বক্তব্য ও ভূমিকা থেকে প্রমাণিত। অবশ্য হানাফী মাযহাবে পরবর্তী কালে সে মতই স্বীকৃত হয়েছে যা আপনি উল্লেখ করেছেন। এই মত স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) –এর যুগে হাদীসবেত্তাদের একটি দল যে মত পোষণ করতেন (যা আমি ইমাম আওযাঈর বরাতে আমার প্রবন্ধে উল্লেখও উল্লেখও করেছি), হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে ঐ মতই গোটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে গৃহিত হয় এবং এই রায়কে যুক্তিবাদী কালাম শাস্ত্রবিদদের মধ্যে আশআরীগণ (মুতাযিলাদের বিপরীতে) গ্রহণ করে। এই রায়ের জনপ্রিয়তা মূলত চূড়ান্ত দলীলের ভিত্তিতে নয়, বরং বিদ্রোহের ঘটনাবলী থেকে ধারাবাহিকভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এখানে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এ কারণে শরীআতের সার্বিক কল্যাণের দাবি তাই মনে করা হল যা ফকীহ্‌গণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসংগে পরবর্তী কালের ফকীহ্‌গণ যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, প্রথম হিজরী শতকের প্রবীণ ইমাম ও ফকীহ্‌গণের অভিমতও তাই ছিল এরূপ বক্তব্যের পেছনে আমি কোন প্রমাণ খুঁজে পাইনি।

এটাও চিন্তার বিষয় যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে লাহোরে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ইংল্যান্ডের একজন প্রাচ্যবিদ যথারীতি এই অভিযোগ করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি একবার বিকৃত হয়ে যায় তবে তার পরিবর্তনের কোন পন্থা ইসলামে নেই। এ

অভিযোগের সমর্থনে আশআরী ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্যসমূহ পেশ করে তিনি বলেছিলেন, বিকৃতির প্রাদুর্ভাব হওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ্‌গণের এসব বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সত্য কথা তো বলা যেতে পারে কিন্তু কোন সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) –এর অভিমত পেশ করা ব্যতীত আমাদের নিকট এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। এখন তাও যদি ভ্রান্ত হয়ে থাকে তবে আপনি এই অভিযোগের কোন জওয়াব আমাদের বলে দিন।

বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ প্রসংগে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তারা যদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় তবে তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা যেতে পারে এবং তাদের ধনসম্পদও লুণ্ঠন করা যেতে পারে। কিন্তু একথাও কি সত্য যে, তারা যে এলাকায় বিদ্রোহ করে থাকবে সেখানকার সমস্ত লোকের জানমাল হরণ বৈধ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা যেতে পারে? ফিক্‌হী হুকুমের ব্যাখ্যা যদি এই হয় তবে ইয়াযীদ বাহিনী হারার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর মদীনার জনগণের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছে তা বৈধ হওয়া উচিৎ। এর উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও পরবর্তী কালের আলেম ও ফকীহ্‌গণ যে কঠিন আপত্তি উত্থাপন করেছেন–শেষ পর্যন্ত তার কি আইনানুগ মূল্য আছে?

(তরজমানুল কুরআন
নভেম্বর ১৯৬৩/জানুয়ারী ১৯৬৪ খৃ.)

বিবিধ প্রসঙ্গ

মুহাররমের শিক্ষা[১]

প্রতি বছর মুহাররমের সময় শীয়া-সুন্নী নির্বিশেষে কোটি কোটি মুসলমান হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-র শাহাদাতে আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে উদ্দেশ্যে ইমাম শুধু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি, ছোট ছোট কোলের শিশুদেরও কোরবানী করেছিলেন- এই সব ব্যাথা পীড়িতদের মধ্যে খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। মজলুমের শাহাদাত প্রাপ্তির পর তাঁর পরিজনবর্গ এবং তাঁদের সাথে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখ প্রকাশ করবেন, এ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার প্রত্যেক খান্দান এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি মাত্রই প্রকাশ করে থাকে। এর নৈতিক মূল্য খুবই সীমিত। কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এটি শাহাদাত লাভকারীর ব্যক্তিত্বের সাথে তার খান্দান এবং আত্নীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটা স্বাভাবিক পরণতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইমাম হুসাইন (রা)-র এমন কি বিশেষত্ব ছিল যার কারণে সাড়ে তেরশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রতি বছর তাঁর জন্যে মুসলমানদের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠে? তাঁর শাহাদাতের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে যদি ধরেই নেয়া হয়, তাহলে নিছক ব্যক্তিগত প্রীতি ও সম্পর্কের ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার কোনো অর্থ থাকতে পারে না এবং খোদ ইমামের দৃষ্টিতেও এই নিছক ব্যক্তিগত প্রীতির কতটুকুই বা মূল্য হতে পারে? তাঁর উদ্দেশ্যের চাইতে ব্যক্তিত্বকে যদি তিনি বড় মনে করতেন, তাহলে তিনি নিজেকে কোরবানী করলেন কেন? তাঁর কোরবানীই তো একথা প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যক্তিত্বের উপর স্থান দিয়েছেন। তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য যখন আমরা কিছু করলাম না, বরং তার বিপরীত কাজই করে যেতে

---

১. আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত একটি বক্তৃতা। প্রবন্ধকার ১৩৮০ হিজরীর মুহাররম মাসে লাহোরে এক শীয়া আলেমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ ভাষণ দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তা পুনর্বিন্যাস করে মাসিক তরজমানুল কুরআনে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন -(অনুবাদক)।

লাগলাম, তখন নিছক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে শোক প্রকাশ এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে গালিগালাজ করে কিয়ামতের দিন আমরা ইমামের নিকট থেকে কোনো বাহবা লাভেরও আশা রাখতে পারি না। উপরন্তু আমরা এও আশা করতে পারি না যে, তাঁর আল্লাহও আমাদের এ কাজের কোনো মূল্য দেবেন।

শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্য

তাহলে এখন সেই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইমাম কি রাজ্য ও সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন এবং এজন্যেই কি তিনি প্রাণোৎসর্গ করে গেছেন? ইমাম হুসাইন (রা)-র খান্দানের উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছুমাত্র ওয়াকিফহাল আছেন, তিনি কখনো এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারেন না যে, তাঁর মতো লোক ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব হাসিলের জন্যে কখনো মুসলমানদের মধ্যে খুনখারাবী করতে পারেন। যারা মনে করে, তাঁর খান্দান মুসলমানদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দাবীদার ছিল, কিছুক্ষণের জন্যে তাদের মতবাদ নির্ভুল বলে মেনে নিলেও হযরত আবু বাক্‌র (রা) থেকে হযরত আমীর মুআবিয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস একথা প্রমাণ করবে যে, কর্তৃত্ব লাভের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং খুন খারাবী করা কখনো তাঁদের নীতি ছিল না। কাজেই একথা মেনে নিতেই হবে যে, তৎকালে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-র দৃষ্টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাণশক্তি এবং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছিল এবং এর গতিরোধের জন্যে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাঁর নিকট অত্যধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি এজন্যে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াকেও তিনি শুধু বৈধই নয়, বরং অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন।

বিরাট পরিবর্তন

এই পরিবর্তন কি ছিল? বলাবাহুল্য জনসাধারণ তাদের দীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি। শাসকগোষ্ঠী এবং জনসাধারণ সবাই আল্লাহ, রসূল এবং কুরআনকে ঠিক সেইভাবেই মানতেন যেভাবে তাঁরা এর আগে মেনে আসছিলেন। দেশের আইন ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়নি। বনি উমাইয়ার শাসনামলে কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক সমস্ত ব্যাপারের ফয়সালা হচ্ছিল, যেমন তাদের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব থেকে হয়ে আসছিল। বরঞ্চ বলা যেতে পারে,

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে দুনিয়ার কোনো মুসলিম রাষ্ট্রেও ইসলামী আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অনেকে ইয়াযীদের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভঙ্গিতে পেশ করে থাকেন, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এ ভুল ধারণা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ইমাম যে পরিবর্তনের গতিরোধ করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তা শুধু এই ছিল যে, একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কর্তৃত্বে সমাসীন হয়েছিল। কিন্তু ইয়াযীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের যে নিকৃষ্টতম ধারণা পেশ করা যেতে পারে তার সবটুকু হুবহু মেনে নেয়ার পরও একথা স্বীকার্য নয় যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি নির্ভুল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে নিছক কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তির শাসন ক্ষমতা দখল এমন কোনো ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল না, যার ফলে ইমাম হুসাইন (রা)-র মতো বিচক্ষণ এবং শরীআতে গভীর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই এই ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সেই আসল পরিবর্তন বলা যেতে পারে না যে জন্যে ইমাম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। গভীরভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণের পর যে কথা আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ভাসিত হয় তা হল এইঃ ইয়াযীদের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠা এবং তারপর সিংহাসনে আরোহণের ফলে আসলে যে গলদের সূচনা হচ্ছিল, তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ফলাফল যদিও তখন পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়নি, তবুও কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি গাড়ীর দিক পরিবর্তন দেখেই একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এবার তার পথ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যে পথে এখন সে অগ্রসর হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। ইমাম এই দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেই গাড়ীকে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেবার ফয়সালা করেন। কথাটা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের দেখা উচিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিশেষত্ব কি ছিল? এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়াযীদের কর্তৃত্ব দখলের পর মুসলমানদের মধ্যে যে রাষ্টব্যবস্থার সূত্রপাত হলো তার ফলে বনু উমাইয়া এবং বনি আব্বাসের শাসনকালে কি বিশেষ জিনিসের প্রকাশ ঘটলো? এই তুলনামূলক আলোচনার পর আমরা একথা অবগত হব যে, গাড়ী পূর্বে কোন্ লাইনে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দিক পরিবর্তনের পর কোন্ লাইনে চলতে শুরু করেছে। এটাও আমরা বুঝতে পারবো যে, রসূলুল্লাহ (স), হযরত ফাতিমা (রা) ও হযরত আলী (রা)

যাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের উন্নত পরিবেশে যাঁর শিশুকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল, তিনি কেন এই দিক পরিবর্তনের মুখে পৌঁছেই এই নতুন লাইনে গাড়ীর অগ্রগতি রোধের জন্যে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কেনই বা তিনি এই তীব্র বেগবান গাড়ীর গতিরোধ করে তাকে স্পষ্ট ও নির্ভুল পথে পরিচালনার দরুন যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে তার পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফ থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলঃ সেখানে শুধু একথা মুখেই উচ্চারণ করা হতো না বরং আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া হতো এবং কর্মের সাহায্যে এই আকীদা ও বিশ্বাসের পূর্ণ প্রমাণ পেশ করা হতো যে, দেশের মালিক আল্লাহ। জনসাধারণ আল্লাহ্‌র প্রজা এবং এই প্রজাপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্র জনসাধারণের মালিক নয় এবং জনসাধারণও রাষ্ট্রের গোলাম নয়। রাষ্ট্রনায়কদের কাজ হলো সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং দাসত্বের শৃংখল গলায় ঝুলিয়ে নেয়া। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রজাদের উপর আল্লাহ্‌র আইন জারি করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াযীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন দখলের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে মানুষের কর্তৃত্ব ভিত্তিক যে রাজতন্ত্রের সূচনা হলো তাতে আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারণা কেবল মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। মানবীয় রাজতন্ত্রের চিরাচরিত আদর্শকেই সে কার্যত গ্রহণ করে নিয়েছিল। অর্থাৎ দেশ বাদশাহ ও শাহী খান্দানের এবং তারাই দেশবাসীর ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরূ সমস্ত কিছুর মালিক। এদেশে আল্লাহ্‌র আইন যদিও কখনো প্রচলিত হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে শুধু জনসাধারণের মধ্যে। বাদশাহ, তার খান্দান, আমীর-উমরাহ ও কর্মচারীরা বেশীর ভাগ এর আওতা বহির্ভূতই রয়ে গেছে।

উদ্দেশ্যের পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে তাঁরই পছন্দসই সৎবৃত্তিগুলোর প্রতিষ্ঠা প্রসার আর অসৎ বৃত্তিগুলোর পথরোধ এবং সাধন। কিন্তু মানবীয় কর্তৃত্ব ভিত্তিক রাজতন্ত্র এখতিয়ার করার পর রাজ্য জয়,

মানুষের উপর কর্তৃত্ব, কর আদায় এবং বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রইল না। বাদশাহদের মধ্যে কালেভদ্রে হয়তো কেউ আল্লাহ্র কলেমা বুলন্দ করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের ও তাঁদের সভাসদ আমীর–উমরাহ এবং অধীনস্থ শাসকমন্ডলীর সাহায্যে সৎ কাজের প্রসার খুব কম এবং অসৎ কাজের প্রসার খুব বেশী হয়েছে। সৎকাজের প্রতিষ্ঠা ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ এবং দীনের প্রচার ও ইসলামী উলুমের গবেষণা ও সংকলনের ব্যাপারে যারা কাজ করে গেছেন সরকারী সাহায্য তো দূরের কথা অধিকাংশ সময় তাঁরা রাষ্ট্রনায়কদের রোষাণলে পতিত হয়েছেন এবং সকল প্রকার বাধা–প্রতিকূলতা সত্বেও তাঁরা নিজেদের কাজ করে গেছেন। তবুও তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে রাষ্ট্র, শাসক সমাজ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা এবং নীতি–প্রকৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে নৈতিক অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইসলাম প্রচারের পথে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বনি উমাইয়াদের শাসন আমলে নও মুসলিমদের উপর জিয্য়া কর ধার্য এর জঘন্যতম প্রকাশ।

প্রাণশক্তির পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ছিল তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি। রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যেই হতো এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারী, বিচারপতি এবং সেনাপতিগণ এই প্রাণশক্তিতে ভরপুর হতেন। অতঃপর সমগ্র সমাজে তাঁরা এই প্রাণশক্তির সয়লাব প্রবাহিত করতেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের পথে কদম রাখার সাথে সাথেই মুসলমানদের রাষ্ট্র এবং শাসক সমাজে রোমের কাইসার ও ইরানের কিসরার রীতিনীতি ও চালচলন এখতিয়ার করলো। ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম ও নিপীড়ন, আল্লাহ ভীতির পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতা, চরিত্রহীনতা, গান–বাজনা ও বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হলো। শাসক সমাজের চরিত্র ও কার্যাবলীতে হারাম ও হালালের কোনো পার্থক্য রইলো না। রাজনীতির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েই চললো। আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে এই শাসক গোষ্ঠী আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের ভয় দেখাতে লাগলো এবং তাদের মধ্যে ঈমান ও বিবেককে জাগ্রত করার পরিবর্তে বখশিশের লোভ তাদের খরিদ করতে লেগে গেল।

এ তো ছিল ভাবধারা, নীতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তন। ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদী নীতির মধ্যেও এই পরিবর্তন সূচিত হলো এবং

শাসনতন্ত্রের যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাতটি ধারা ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই পরিবর্তিত হয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম ধারা

জনসাধারণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। এখানে কোনো ব্যক্তি স্বকীয় প্রচেষ্টায় কর্তৃত্ব হাসিল করে না। বরং জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে নিজেদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব সোপর্দ করে। আনুগত্য প্রকাশ যেন কর্তৃত্ব লাভের পরিণতি না হয়, বরং হয় তার কারণ। স্বকীয় প্রচেষ্টা অথবা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কেউ জনসাধারণের আনুগত্য হাসিল করতে পারে না। আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে তারা হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। জনগণের আনুগত্যের ভোট হাসিল না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে না। আবার জনগণের আস্থা লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর সে জবরদস্তি গদি দখল করে থাকতে পারে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকেই এই নীতি মোতাবেক কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। আমীরে মুআবিয়ার ব্যাপারে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। এজন্যে সাহাবী হওয়া সত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করা হয়নি।

কিন্তু অবশেষে ইয়াযীদের উত্তরাধিকারসূত্রে কর্তৃত্ব দখলের ফলে এ নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে শাহী তখত দখল করার যে সিলসিলা শুরু হয়, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা দ্বিতীয়বার নির্বাচনভিত্তিক খেলাফতের দিকে ফিরে যেতে পারেনি। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকরা মুসলমানদের স্বাধীন মতামত গ্রহণের পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করেছে। মুসলমানদের আনুগত্যের ভোট গ্রহণ করে শাসন ক্ষমতা দখল করার পরিবর্তে তারা শাসন ক্ষমতা দখল করে জোরপূর্বক মুসলমানদের আনুগত্যের ভোট হাসিল করেছে। আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে জনগণের স্বাধীন মতামতের আর কোনো অবকাশ ছিল না। শাসন–ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে আনুগত্যের ভোট হাসিল করা আর কোনো শর্তের মধ্যে গণ্য হতো না। শাসন–ক্ষমতা যার হাতে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিরত থাকার শক্তিই জনগণের ছিল না, তা সত্বেও যদি তারা আনুগত্য প্রকাশ না করতো, তাহলেও শাসন–ক্ষমতা দখলকারী গদিচ্যুত হতো না। আব্বাসী শাহানশাহ মানসূরের শাসন আমলে এই জবরদস্তি আনুগত্য গ্রহণের রীতিকে খতম করার জন্যে

ইমাম মালিক (রহ) যখন প্রচেষ্টা শুরু করেন, তখন বেত্রাঘাতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ জর্জরিত হয় এবং অবশেষে তাঁর কাঁধ থেকে একটি হাত উপড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় ধারা

এই শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিলঃ রাষ্ট্র পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং পরামর্শও করতে হবে তাদের সাথে যাদের বিদ্যা, তাকওয়া এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার মতো বুদ্ধিবৃত্তির উপর জনসাধারণ আস্থা রাখে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যারা শূরার (সংসদের) সদস্য ছিলেন, যদিও সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়নি, আধুনিক যুগের বিচারে তাঁদেরকে মনোনয়ন দান করা হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু তাঁরা ছিলেন জী হুজুরের দল অথবা খলীফার স্বার্থ সংরক্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন, তাই তাদেরকে পরামর্শদানকারী মনোনীত করা হয়েছিল, এরূপ ধারণার অবকাশ নাই। বরং পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে জাতির উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। খলীফাগণ তাদের মুখ থেকে হক কথা ছাড়া অন্য কিছুই আশা করতেন না। তাদের সম্পর্কে আশা ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেক ব্যাপারে ঈমানদারীর সাথে নিজেদের বিবেক ও জ্ঞান অনুযায়ী যথাসম্ভব নির্ভুল মতামত পেশ করবেন। কোনো ব্যক্তিও ধারণা করতে পারত না যে, রাষ্ট্রকে তাঁরা ভুল পথে পরিচালিত হতে দেবেন। সে যুগে যদি বর্তমান পদ্ধতিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত, তাহলে মুসলিম জনসাধারণ তাদেরকেই আস্থাভোট প্রদান করতেন।

কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মজলিসে শূরার এ পদ্ধতি পরিবর্তিত হলো। এখন বাদশাহ জুলুম-জবরদস্তি এবং সর্বময় কর্তৃত্বের বলে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে লাগলেন। শাহজাদা, তোষামোদকারী সভাসদ, প্রাদেশিক গভর্নর এবং সিপাহসালারগণ ছিলেন তাদের পরিষদের সদস্য। এই পরামর্শদাতাগণ এমন পর্যায়ের লোক ছিলেন যে, তাদের ব্যাপারে যদি জাতির মতামত গ্রহণ করা হতো, তাহলে একটি আস্থা ভোটের তুলনায় তারা লাভ করতেন হাজারটি অভিসম্পাতের ভোট। অন্যদিকে সমগ্র জাতি যেসব হকপরস্ত, সত্যবাদী, মহাজ্ঞানী এবং আল্লাহভীরু লোকের উপর আস্থা স্থাপন করেছিল, বাদশাহদের দৃষ্টিতে তাঁরা কোনো প্রকার আস্থা লাভের যোগ্যতা রাখতেন না। বরং তাঁরাই ছিলেন লাঞ্ছিত অথবা কমপক্ষে সন্দেহযুক্ত।

তৃতীয় ধারা

এর তৃতীয় ধারা ছিলঃ স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে জনসাধারণকে পূর্ণ সুযোগ দান। ইসলাম সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের প্রতিরোধকে শুধু প্রত্যেক মুসলমানের অধিকারই নয়, তার কর্তব্য বলেও গণ্য করেছে। ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ভুল পথ পরিক্রমা নির্ভর করতো জনগণের কন্ঠ ও বিবেকের স্বাধীনতার উপর, মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেকটি ক্রুটির বিরুদ্ধে তারা সমালোচনা করতে পারত এবং সত্য কথা প্রকাশ্যে বলতে পারত। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু জনগণের এই অধিকারই পুরাপুরি সংরক্ষিত ছিল না, বরং তারা এটিকে তাদের উপর অর্পিত এক মহান দায়িত্ব বলে মনে করতেন এবং এই অধিকার আদায় করে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা জনগণকে উৎসাহিতও করতেন। তাদের মজলিসে শূরার সদস্যগণই শুধু নয়, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই বলার, সমালোচনার এবং যে কোনো সময়ে খলীফার নিকট কৈফিয়ত তলব করার পূর্ণ আজাদী লাভ করেছিল। আর এই আজাদীর পূর্ণ ব্যরহারের কারণে তাদের কখনো হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়নি, ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি, বরং এজন্যে তারা হামেশা প্রশংসা ও বাহবা লাভ করেছে। জনগণের এই সমালোচনার আজাদী খলীফাদের দান ছিল না এবং এজন্যে তাঁরা জনগণকে তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকতে বলতেন না। ইসলামী শাসনতন্ত্রই তাদেরকে এ অধিকার দান করেছিল। আর খলীফাগণ এর মর্যাদা রক্ষা করা নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন। সৎকর্মের জন্যে এর ব্যবহার প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ-রসূলের নির্ধারিত ফরয ছিল এবং এই ফরয প্রতিপালনের জন্যে অনুকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাকে স্থায়ী রাখা খলীফাগণ নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন।

কিন্তু রাজতন্ত্রের জমানা শুরু হবার সাথে সাথেই মানুষের বিবেক অর্গলবদ্ধ করে দেয়া হল, কণ্ঠ দাবিয়ে দেয়া হলো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছল যে, মুখ খুললেই প্রশংসা করতে হবে, অন্যথায় নীরব থাকতে হবে। অথবা স্পষ্টবাদিতাই যার স্বভাব এবং এই স্বভাবকে পরিবর্তিত করতে যার বিবেক নারাজ, তাকে কয়েদ যন্ত্রণা ভোগ অথবা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে নৈরাশ্য, দুর্বলতা এবং সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তির প্রসার হতে লাগলো। বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে হক কথা জোরালো ভাষায় বলার মতো লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে

আসতে লাগলো। তোষামোদ ও চাটুকারিতার মূল্য বেড়ে গেলো এবং হকপরস্তি ও স্পষ্টবাদিতার মূল্য কমে গেলো। উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ঈমানদার মুক্তবুদ্ধির লোকেরা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, শাহী খান্দানগুলোর রাজত্বের স্থায়ীত্বের ব্যাপারে তাদের অন্তর আবেগশূন্য হয়ে গেলো। এক খান্দানকে অপসারিত করে যখন অন্য খান্দান শাহী তখত দখল করতো, তখন পূর্বোক্ত খান্দানের অনুকূলে তারা টু শব্দটিও করতো না। অতপর এক হতভাগ্য যখন পিছলিয়ে পড়তো, তখন তার গর্দানে জোরে এক পদাঘাত করে তারা তাকে আরো গভীর আবর্তে ঠেলে দিতো। কর্তৃত্বের হাত বদল হচ্ছিল, একটার পর একটা খান্দানের আগমন আর নির্গমন চলছিল। কিন্তু জনসাধারণ এই দৃশ্য শুধু অবলোকনই করছিল, দর্শকের স্থান থেকে তারা একটুও অগ্রসর হয়নি।

চতুর্থ ধারা

এই শাসনতন্ত্রের চতুর্থ ধারাটি ছিল তৃতীয় ধারাটির সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। তা হলো ঃ খলীফা এবং তাঁর রাষ্ট্রকে আল্লাহ ও জনসমাজ উভয়ের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। একদিকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির গভীর অনুভূতি খোলাফায়ে রাশেদীনের দিনের শান্তি এবং রাতের আরাম হারাম করে দিয়েছিল। অন্যদিকে জনসমাজের সম্মুখে জবাবদিহির ব্যাপারে বলা যায় যে, তাঁরা সব সময় সকল স্থানে নিজেদেরকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন। তাদের সরকারের এ নীতি ছিল না যে, কেবল মজলিসে শূরায় নোটিশ দিয়েই তবে তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, বরং প্রতিদিন পাঁচ বার নামাযের জামাআতে তাঁরা জনসাধারণের মুখোমুখি হতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমুআর নামাযে তাঁরা জনগণের সম্মুখে নিজেদের কথা বলতেন এবং তাদের কথা শুনতেন। তাঁরা কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই হাটে-বাজারে জনতার ভীড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের পথ পরিষ্কার করে দেবার জন্যে কোন পুলিশ বাহিনীও সংগে থাকতো না। তাঁদের গভর্নমেন্ট হাউসের (অর্থাৎ তাঁদের কাঁচা বাড়ী) দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল। যে কেউ তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে পারতো। যে কোন সময় যে কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিকট প্রশ্ন এবং সংগে সংগে তার জবাবও তলব করতে পারতো। এ জবাবদানের ব্যাপারটা মোটেই সীমিত ছিল না, সব সময় এবং প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে দেয়া হতো, কোনো প্রতিনিধির মারফতে নয়, সরাসরি সমগ্র

জাতির সম্মুখে। জনগণের সমর্থনে তাঁরা কর্তৃত্বের আসনে বসেছিলেন এবং জনগণই আবার তাঁদেরকে সে আসন থেকে অপসারিত করে অন্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারতো। এজন্যে সাধারণের মুখোমুখি হতে তাঁরা মোটেই ভয় পেতেন না এবং কর্তৃত্ব থেকে বেদখল হওয়া তাঁদের দৃষ্টিতে কোনো বিপর্যয়ের সূচনা বলে অনুমিত হতো না। তাই তাঁরা জবাবদিহি থকে নিষ্কৃতি লাভের কথা চিন্তাই করতেন না।

কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রচলনের সাথে সাথেই এই জবাবদানকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটলো। আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহির ধারণা হয়তো কথার মাধ্যমে ফুটে উঠতে পারে কিন্তু সমগ্র কর্মকান্ডের মধ্যে তার চিহ্ন খুব সামান্যই চোখে পড়তো। রইলো জনগণের সম্মুখে জবাবদান, বলা বাহুল্য কার এত বড় বুকের পাটা যে, তাদের কাছ থেকে জবাব তলব করতে পারে। তারা জাতির উপর বিজয় লাভ করেছিল। বিজিতদের সম্মুখে বিজয়ীদের নিকট থেকে কে জবাব তলব করতে পারে? তারা বল প্রয়োগ করে কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। তাদের শ্লোগান ছিলঃ যার কোমরে বল আছে সে আমাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিক। এ ধরনের লোকেরা কি কখনো জনগণের মুখোমুখি হয় এবং জনসাধারণই বা তাদের ধারে কাছে কেমন করে ঘেঁষতে পারে? তারা রহীম-করীমের সাথে মহল্লার মসজিদে এসে নামায পড়তো না, পড়তো তাদের শাহী মহলের সুরক্ষিত মসজিদ, অথবা বাইরে তাদের একান্ত নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষী সৈন্যদলের কঠোর প্রহরাধীনে। তারা যখন ঘোড়া বা হাতীর পিঠে চড়ে বাইরে বেরুতো, তখন তাদের সামনে পেছনে সশস্ত্র বাহিনী থাকতো এবং তাদের চলার পথ পূর্বাহ্নেই পরিষ্কার করে দেয়া হতো। জনসাধারণের সাথে কখনো তাদের মুখোমুখি হতো না।

পঞ্চম ধারা

ইসলামী শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ধারা ছিলঃ বায়তুল-মাল আল্লাহ্র সম্পত্তি এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে কোনো জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্র পথ ছাড়া অন্য পথে তা ব্যয়িত হওয়াও উচিত নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে এতীমের সম্পত্তিতে তার অভিভাবকের অধিকার যতোটুকু, বায়তুল-মালের সম্পত্তিতে খলীফার অধিকারও ঠিক ততোটুকু। "প্রয়োজন মিটাবার মতো ব্যক্তিগত উপার্জনের উপায় যার কাছে রয়েছে, এ সম্পত্তি থেকে বেতন গ্রহণ করতে

তাকে লজ্জিত হওয়া উচিত এবং যে প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত, তার ঠিক ততোটা বেতন গ্রহণ করা উচিত, যা প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মতে ন্যায়সংগত" (সূরা নিসাঃ ৬)। খলীফাকে বায়তুল-মালের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে এক এক পয়সার হিসাব দিতে হবে এবং জনসাধারণও তাঁর থেকে হিসাব তলব করার অধিকার রাখে। খোলাফায়ে রাশেদীন এ নীতিকেও পরিপূর্ণ দায়িত্ব এবং হকপরস্তির সাথে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁদের অর্থাগারে শরীআতের নির্ধারিত পন্থায় অর্থাগম হতো এবং তার নির্দেশিত পথেই তা ব্যয়িত হতো। তাদের মধ্যে যারা বিত্তবান ছিলেন তাঁরা এক পয়সাও পারিশ্রমিক না নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন, বরং জাতির জন্য নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আর বিনা বেতনে সার্বক্ষণিক রাষ্ট্র পরিচালনার সামর্থ যাদের ছিল না, তাঁরা এই দিবারাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে বেতন গ্রহণ করতেন, তার পরিমাণ এতোই স্বল্প ছিল যে, যে কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই তাকে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের চাইতে কম বলতেন। তাদের দুশমনরাও এই পরিমাণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলতে সাহস করতো না। এ ছাড়াও বায়তুল-মালের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় তাদের কাছ থেকে তলব করতে পারতো এবং তাঁরাও যে কোন ব্যক্তির নিকট জবাবদিহি করতে প্রস্তুত ছিলেন। এক বিরাট মজলিসে একজন সাধারণ লোকও তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে, বায়তুল মালে ইয়ামন থেকে যে চাদর এসেছে তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এতোখানি নয় যে, তা দিয়ে আপনি এতো লম্বা জামা তৈরী করতে পারেন, এই অতিরিক্ত কাপড় আপনি কোথায় পেলেন?

কিন্তু যখন খেলাফত রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করলো, তখন বায়তুল-মাল আর আল্লাহ ও মুসলমানদের অধিকারে রইলো না, তা হলো বাদশাহর সম্পত্তি। সম্ভাব্য সকল বৈধ ও অবৈধ উপায়ে তাতে অর্থাগম হতে লাগলো এবং বৈধ ও অবৈধ পথেই তা ব্যয়িত হতে থাকলো। তাদের কাছ থেকে এর হিসাব তলব করার সাহস কারোর ছিল না। সমগ্র দেশটাই ছিল যেন একটা লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি। আর একজন হরকরা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সর্বস্তরের কর্মচারী যে যার সুযোগ মতো তার মধ্যে হাত সাফাই করছিলো। এ ধারণাই তাদের মন থেকে উঠে গিয়েছিল যে, কর্তৃত্বলাভ এমন কোন পরোয়ানা নয় যার ফলে বেপরোয়া লুটতরাজ চালানো তাদের জন্যে হালাল

হয়ে যাবে। আর জনগণের সম্পত্তি মায়ের দুধ নয় যেন তাকে তারা বেমালুম হজম করতে থাকবে, এবং এ ব্যাপারে কারও সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবেনা।

ষষ্ঠ ধারা

ষষ্ঠ ধারা ছিল এই যে, দেশে আইনের (আল্লাহ ও রসূলের আইন) শাসন হবে। কারোর সত্তা আইনের উর্ধে থাকবে না। আইনের সীমা পেরিয়ে বাইরে এসে কাজ করার অধিকার কারোর থাকবে না। একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার উপর একই আইনের অবাধ রাজত্ব চলবে। ইনসাফের ব্যাপারে কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা হবে না। ইনসাফ করার ব্যাপারে আদালতগুলোকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এই নীতি অনুসৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নজীর পেশ করেছিলেন। বাদশাহর তুলনায় অনেক বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তাঁরা আল্লাহর আইনের শৃংখলমুক্ত হননি। তাদের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা আইনের সীমা পেরিয়ে কারোর উপকার করতে পারেনি এবং তাদের অসন্তুষ্টি আইনের বিরুদ্ধে কাউকে ক্ষতিগ্রস্তও করেনি। জনসাধারণের মধ্য থেকে কেউ যদি তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো, তাহলে একজন সাধারণ লোকের মতোই তাঁরা আদালতের শরণ নিতেন। তাদের বিরুদ্ধে কারোর কোনো অভিযোগ থাকলে কাযীর নিকট ফরিয়াদ করে তাদেরকে আদালতে হাযির করানো যেতো। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক গভর্নর ও সিপাহসালারগণকেও তাঁরা আইনের শৃংখলে আটকিয়ে রেখেছিলেন। আদালতের কাজে কাযীর উপর প্রভাব বিস্তার করার অধিকার কারোর ছিল না। আইনের গন্ডী পেরিয়ে বিচারমুক্ত হওয়ার ক্ষমতা কারোর ছিল না।

কিন্তু খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে পদার্পণ করার সাথে সাথেই এই নীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। অতপর শুধু বাদশাহ, শাহজাদা, আমীর-ওমরাহ, শাসনকর্তা ও সিপাহসালারই নয়, শাহী মহলের গোলাম-বাঁদীরা পর্যন্ত আইনের উর্ধে উঠে গেলো। জনগণের অর্থ-সম্পত্তি, ইজ্জত-আব্রু ও গর্দান পর্যন্ত তাদের জন্যে হালাল হয়ে গেলো। ইনসাফের তুলাদন্ড হলো দুটো। একটা দুর্বলের জন্যে, অন্যটা শক্তিমানের। আদালতের উপর শক্তি প্রয়োগ করা হলো। ন্যায় বিচারক কাযীদের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। এমনকি আল্লাহভীরু

ফকীহগণ কাযীর পদ গ্রহণ করার তুলনায় বেত্রাঘাত এবং কয়েদের শাস্তি বরণকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। জুলুম ও নির্যাতনের ক্রীড়নক হয়ে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করাকে তাঁরা পছন্দ করলেন না।

সপ্তম ধারা

ইসলামী শাসনতন্ত্রের সপ্তম ধারা ছিলঃ অধিকার এবং মর্যাদার দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা। প্রারম্ভিক ইসলামী রাষ্ট্রে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে দেশ, গোত্র, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য ছিল না। গোত্র এবং খান্দানের দিক দিয়ে কেউ কারোর চাইতে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদার অধিকারী ছিল না। আল্লাহ ও রসূল (স)–এর অনুগতদের অধিকার ও মর্যাদা ছিল সমান। একজন অন্য জনের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতেন শুধু চরিত্র, নৈতিকতা, যোগ্যতা ও জনসেবার কারণে।

কিন্তু খেলাফত যখন রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো, তখন সংকীর্ণ বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো সকল দিক থেকে। শাহী খান্দান এবং তাদের সমর্থকদের মর্যাদা সব চাইতে বৃদ্ধি পেলো। অন্যান্য খান্দানের তুলনায় তাদের খান্দান অধিকতর অধিকার ও মর্যাদা লাভ করলো। আরবী–আজমী বিদ্বেষ জাগ্রত হলো এবং স্বার্থপর আরবদের মধ্যে খান্দানে খান্দানে ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের বীজ উপ্ত হলো। এ জিনিসটা ইসলামী সমাজের বিপুল ক্ষতি সাধান করেছে। ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

শাহাদাতের সার্থকতা

ইসলামী খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করার ফলে এই পরিবর্তনগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ইয়াযীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভের ফলে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে, এ ঐতিহাসিক সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, পরিবর্তনের এই প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর অল্প দিনের ভেতরেই রাজতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থার মধ্যে উপরোল্লেখিত দুনীতিগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল। খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হওয়ার সূচনায় যদিও এ দুনীতিগুলো পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেনি, তবুও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই এর পরিণাম অনুভব করতে পারতেন। একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন ছিল না যে, এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম যে পরিবর্তন সাধন করেছিল

তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্যেই হযরত ইমাম হুসাইন (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ফয়সালা করলেন, একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার যে ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারে তার সবটুকু বিপদ হাসিমুখে গ্রহণ করেও তাঁকে এই পরিবর্তনের প্রতিরোধ করতে হবে। তার প্রচেষ্টার পরিণতি কারোর অজানা নেই। কিন্তু এই বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর বীরের মতো এর সমগ্র পরিণতিকে গ্রহণ করে নিয়ে ইমাম যে কথা প্রমাণ করে গেছেন তা এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিগুলো সংরক্ষণের জন্যে মুমিন ব্যক্তি যদি তার প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়, তার আত্মীয়–পরিজনকে কোরবানী করে, তবুও তার উদ্দেশ্যের তুলনায় এ বস্তু নেহাত কম মূল্যই রাখে। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোন মুমিনকেই প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। কেউ হয়তো তাচ্ছিল্যভরে একে নিছক একটা রাজনৈতিক কাজ বলতে পারে; কিন্তু হুসাইন ইবনে আলী (রা)–র দৃষ্টিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটি ছিল একটি নিছক দীনি কর্তব্য। তাই একাজে জীবন বাজি রাখাকে শাহাদাত মনে করেই তিনি জীবন দান করেছেন।

তরজমানুল কুরআন
জুলাই ১৯৬ খৃ.

পাশ্চাত্য জাতিসত্তার করুণ পরিণতি

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ-

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে" – (সূরা রূমঃ ৪১)।

যে বিপর্যয়ের মূল পদার্থ যুগ যুগ ধরে পরিপক্কতা লাভ করছিল অবশেষে তা পৃথিবীর বুকে বিদীর্ণ হয়েছে এবং তা জলে, স্থলে ও শূন্যলোকের সবকিছু নিজের ধ্বংসাত্মক পরিধির মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে। যেসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকের এবং পার্থিব জীবনোপকরণের প্রতি লোভাতুর গোষ্ঠীগুলোর হাতে বর্তমানে মানবজগতের লাগাম রয়েছে তাদের কৃতকর্ম অবশেষে আল্লাহ্র শাস্তির আকারে স্বয়ং তাদেরকেই শুধু পরিবেষ্টন করেনি, বরং এই পৃথিবীকেও এসে বেষ্টন করে নিয়েছে যারা আল্লাহ্র দাসত্ব পরিত্যাগ করে এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের দাসত্ব কবুল করেছে। এখন পৃথিবীর বুকে এমন সব কিছুই ঘটবে যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। জনপদ ধ্বংস হবে, উৎপাদন ও বংশধারা বিধ্বস্ত করা হবে। মানুষেই মানুষকে নেকড়ের চেয়েও নির্দয়ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে। শিশু, নারী, বৃদ্ধ এমনকি ব্যধিগ্রস্ত লোকেরা পর্যন্ত নিরাপত্তা পাবে না। মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজের শ্রম ও মেধা ব্যয় করে যা কিছু গড়েছে তা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। দুর্বল জাতিসমূহের জনগণকে পৃথিবীর প্রতিটি স্থান থেকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হবে এবং পাশ্চাত্য শয়তানদের কুপ্রবৃত্তি ও লালসার বেদীতে তাদেরকে ছাগল-ভেড়ার মত যবেহ করা হবে। দরিদ্র ও অসহায় জাতিসমূহের শ্রমলব্ধ উপার্জন বিভিন্ন পন্থায় শোষণ করে শেষ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে সেই অগ্নিকুণ্ডে

১. [প্রবন্ধটি মূলত একটি সম্পাদকীয়। তরজমানুল কুরআনের সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খৃ. সংখ্যায় প্রকাশার্থে প্রবন্ধকার তা রচনা করেছিলেন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদকীয়তে যেহেতু পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমালোচনা করা হয়েছিল, তাই তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার তা পত্রস্থ করার অনুমতি দেয়নি। অতএব তা তরজমানুল কুরআনের ফাইলে সংরক্ষিত ছিল এবং উনিশ বছর পরে প্রথম বারের মত তরজমানুল কুরআনের ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ খৃ. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়]।

নিক্ষেপ করা হবে যা জমীনের বুকে প্রভুত্বের মিথ্যা দাবীদাররা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত করেছে। মোটকথা যেসব খোদাদ্রোহী আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শয়তানের দাসত্বে নিমজ্জিত হয়েছে তাদেরকে নিজেদের অনুসরণীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে মানবজাতি যে অপরাধ করেছে আজ তার পূর্ণ শাস্তি ভোগের সময় উপনীত হয়েছে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ -

"তোমার প্রভু এরূপ নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীগণ সদাচরণশীল" (সূরা হূদঃ ১১৭)।

এই মারাত্মক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে মাত্র একুশ বছর হল, যা পূর্ণ চার বছর ধরে পৃথিবীকে উলটপালট করে রেখে দিয়েছিল। এক কোটি লোকের প্রাণহানী, তিন কোটি লোকের আহত হওয়া, দশ বিলিয়ন মূলধন পানির মত উরে যাওয়া, অনেক দেশ ও সরকারের বিধ্বস্ত হওয়া এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানবজাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক কঠিন রুগ্নাবস্থার সৃষ্টি হওয়া–এসবই সেই মারাত্মক বিপর্যয়ের পরিণতি পৃথিবী যাকে বিশ্বযুদ্ধ নামে স্মরণ করে। কিন্তু এতবড় ভয়ংকর দুর্ঘটনার পরও পাশ্চাত্যের আল্লাহর পরিচয়জ্ঞান বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চোখ খোলেনি এবং তারা মাত্র কয়েক বছর পর আরেকটি মারাত্মক বিপর্যয়ের পতাকা উত্তোলন করল। অথচ এখনও গত মহাযুদ্ধের হৃদয়বিদারক পরিণতি তাদের চোখের সামনেই বর্তমান। এই অবস্থা মূলত প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তর্চক্ষু সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে, তারা নিজেদের আত্মা শয়তানের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে এবং এখন তারা কোন জিনিস থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফয়সালা তাদের নিকৃষ্টতা ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে এবং তারা স্বয়ং নিজেদের হাতে এমনভাবে ধ্বংস হবে যে, তা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কাহিনী হয়ে থেকে যাবে।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

"আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে গ্রেফতার করেন তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক।" (সূরা হূদঃ ১০২)।

ইউরোপের প্রতিভাবান রাজনীতিবিদগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি এই যে, একদিকে তারা তো আভ্যন্তরীণভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং অপর দিকে যখন তাদের নিকৃষ্টতার ম্যাগজিন বিদীর্ণ হয় তখন তাদের প্রত্যেকে সংস্কার, সংশোধন ও শান্তিপ্রিয়তার দাবীদার, সত্য-ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক ও অত্যাচার-নির্যাতনের শত্রু হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং পৃথিবীবাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, আমি তো শুধুমাত্র সংশোধন ও কল্যাণই কামনা করি, কিন্তু আমার বিপক্ষে যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের দুধারি তরবারি রয়েছে। অতএব এগিয়ে আস এবং আমার সাহায্য কর। বাস্তবে এসবই একই থলির গোয়েন্দা। সবই অত্যাচার, নির্যাতন ও বিপর্যয়ের হোতা। তাদের প্রত্যেকের আঁচল নির্যাতিতের রক্তে রঞ্জিত। প্রত্যেকের কুৎসিৎ আমলনামা সেইসব অপরাধে পরিপূর্ণ যার জন্য তারা পরস্পরকে দোষারোপ করছে। কিন্তু এটা তাদের পুরাতন অভ্যাস। তারা তাদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নৈতিকতা, মানবতা, গণতন্ত্র ও দুর্বল জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের সম্পূর্ণ মিথ্যা দোহাই পেরে জগতবাসীকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে যাতে তাদের আধিপত্যবাদী শক্তির হাতে বন্দী নির্বোধ লোকেরা তাদের যুদ্ধকে সত্য-ন্যায়ের যুদ্ধ মনে করে তাদের নিকৃষ্ট লালসা চরিতার্থ করার পথে সাহায্যকারী হয় এবং যে অসংখ্য চাটুকার নিজেদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য চারতার্থে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত-তারা যাতে নিজেদেরকে একটি ন্যায্য উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্যকারী হিসাবে পেশ করতে পারে এবং বিজয়ী হতে পারে।

অনিষ্টকারিতার সাথে إنا نحن مصلحون (আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী)-এর দাবীসমূহের মুখোশ গত মহাযুদ্ধে পূর্ণরূপে উম্মোচিত হয়েছে। ১ম মহাযুদ্ধের ইতিহাস আজ কারো অজানা নয়। সকলের জানা আছে যে, একদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালী এবং অন্য পক্ষে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া কি উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছিল, কি উদ্দেশ্যে এই দুটি জোট পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল এবং অতপর অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ভাগবাটোয়ারার কি ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু কিছু মনে আছে কি যে, যুদ্ধের সূচনায় এবং যুদ্ধ চলাকালীন উভয় পক্ষ কতটা জোর গলায় দাবী করে জগতবাসীকে এই ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল যে, আমরা পৃথিবীবাসীকে জুলুম, নির্যাতন ও আধিপত্যের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য এবং দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য যুদ্ধ করছি?

অতপর যুদ্ধে যখন একপক্ষ জয়যুক্ত হল তখন সে কিভাবে স্বীয় ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করেছে? নিজের সত্যবাদিতা ও ন্যায়বাদিতার কি রকম উজ্জ্বল নিদর্শন পেশ করেছে? দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতার স্বাদ কিভাবে আস্বাদন করিয়েছে এবং নির্যাতিত মানবতার প্রতি ন্যায়–ইনসাফের অনুগ্রহ কিভাবে বর্ষণ করেছে? ভারত, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিসতীন, মিসর, স্মারনা, থ্রেস, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোর প্রতিটি বালুকণা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এখন এসব লোক আবার প্রতারণার সেই জামা পরিধান করে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। তারা বলে, এই যুদ্ধের ময়দানে আমরা কোন স্বার্থপরতার ভিত্তিতে নয়, বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও মুক্তির সাথে সম্পর্কিত মূলনীতির হেফাজতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক ন্যায়পরতা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। আমরা পৃথিবীতে এই মূলনীতি কায়েম করতে চাই যে, মানবধর্ম নিজেদের মতভেদের মীমাংসা বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির মাধ্যমে করবে, পাশবিক শক্তির মাধ্যমে নয়। আমাদের আকাংখা এই যে, মানবীয় বিষয়ে জংলী আইন যাতে কার্যকর না হতে পারে। অর্থাৎ এরূপ যেন না হতে পারে যে, সততা ও ন্যায়পরতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রত্যেক শক্তিধরের কথা শক্তিহীনকে মানতে হবে। আমরা যদি এই উন্নত উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ না করি তাহলে দুনিয়াতে ভদ্র, সভ্য ও সংস্কৃতিবান লোকদের জীবন অসহনীয় হয়ে পড়বে, মানবতার জন্য কোন স্বাধীনতাই বাকি থাকবে না এবং মানবীয় সভ্যতা–সংস্কৃতির নিরাপদ লালন ও প্রতিপালনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করছে তা সফলকাম হওয়ার অর্থ মানব সভ্যতার অপমৃত্যু। এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে অনিচ্ছায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে

আল্লাহ! আল্লাহ! জনাব আপনি ও আন্তর্জাতিক ন্যায়পরতা! আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ? মানবাত্মার এই স্বাধীনতা কোন্ ইতিহাস থেকে মিস্টার সাহেবের দৃষ্টিতে এতটা প্রিয় হয়ে গেল যে, এজন্য আপনি নিজের জানমাল পর্যন্ত কোরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন? আপনি কবে থেকে এই মূলনীতি মেনে নিয়েছেন যে, সভ্য মানুষ তার মতবিরোধের মীমাংসা পাশবিক শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির মাধ্যমে করবে? বন্য আইন আপনার কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে কবে রহিত হল এবং কবে সেই সৌভাগ্যময় ক্ষণটি এসেছে যে, দুর্বলদের সামনে জনাব সত্য–ন্যায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন?

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (النجم ٣٢)

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে'' (সূরা নাজমঃ ৩২)।

আপনার আমলনামার প্রতিটি পৃষ্ঠা আপনার সেইসব কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে যার মূলোৎপাটনের জন্য আজ আপনি ঘোষণা দিচ্ছেন। আপনার ব্যাপক আধিপত্য সাক্ষী যে, দুনিয়ায় জঙ্গী বিধানের প্রবর্তক সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে আপনিই। আপনার বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা একথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধকে নিজের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বেদীতে কোরবানী করার ব্যাপারে আপনি কখনও অনুতাপ করেননি এবং যেখানে আপনার পাশবিক শক্তির প্রয়োগ সম্ভব সেখানে আপনি কখনও এই মূলনীতি স্বীকার করেননি যে, সভ্য লোকদেরকে নিজেদের মতভেদের মীমাংসা বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে করা উচিৎ। অতীত ইতিহাসের কথা বাদ দিন। আজ এই সময় যখন আপনার মুখ থেকে এসব উন্নত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঘোষণা হচ্ছে তখন আপনার নিজের দ্বারাই ফিলিস্তীনে সেইসব উদ্দেশ্য পদদলিত হচ্ছে যার সহযোগিতা করার দাবী আপনি করছেন। এই নতুন ও পুরাতন কুৎসিৎ দাগগুলো আপনার আঁচলে রেখে আপনার নিরপরাধ হওয়ার দাবী অন্ধদের হয়ত ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু চক্ষুষ্মানেরা প্রতারিত হতে পারে না। এই বিশ্বাসঘাতকতা আর কতকাল চলবে?

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ -

"যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে–তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে কর না'' (সূরা আল–ইমরানঃ ১৮৮)।

এই যুদ্ধ যখন শুরু হয়–তার কারণসমূহ কারও অজানা নয়। যেদিন বিগত যুদ্ধ (১ম মহাযুদ্ধ) শেষ হয়েছিল সেদিনই এই ২য় বিশ্ব যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আজ যারা সততা, ন্যায়নীতি ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তারাই বিগত যুদ্ধে "জয়যুক্ত হয়েই পৃথিবীর বুকে বন্য আইন'' জারী করেছিল। তারা বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে

এমনভাবে ভাগবাটোয়ারা শুরু করে দিল যেভাবে ডাকাতদল লুন্ঠিত মাল নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে থাকে। তারা বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের মধ্যে ভেড়া-বকরীর ন্যায় বন্টন করে এবং তাদের আদান-প্রদান করে। যুদ্ধ চলাকালীন সময় তারা জোর গলায় যেসব দাবী করেছিল এখন তা সবই ভুলে গেছে এবং বিজিত জাতিসমূহের সাথে তারা ঠিক সেরূপ ব্যবহার করে, জংগলে কোন হিংস্র প্রাণী তার শিকারের সাথে যেরূপ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ সততা ও ন্যায়-ইনসাফের কোনরূপ পরোয়া না করে তারা শুধুমাত্র শক্তিবলে দুর্বলদেরকে অবনত মস্তকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করে। তারা জীবিত ও স্বাতন্ত্রবোধের অধিকারী জাতিসমূহের মাথায় ও বুকে এমন কষাঘাত করে এবং করতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তারা আক্রোশের উত্তেজনায় উম্মাদ হয়ে যায়। তারা নিজেদের মস্তিস্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তাদের উপর এক কঠিন বৈপ্লবিক ব্যাধি চেপে বসে। ঐ মারাত্মক ব্যাধির পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, একদিকে যেই তুর্কী জাতি পাঁচশত বছর পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সাথে গভীর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তারা এক কঠোর প্রকৃতির জাতীয়তাবাদী মতবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে এবং আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসেনি। অপরদিকে সেই মহান জার্মান জাতি যারা বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের পতাকাবাহী এবং যাদের বৈজ্ঞানিক অবদান এই যুগের ইতিহাসে সর্বাধিক দীপ্তিমান তারা কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জাতিপূজার মারাত্মক উম্মাদনার শিকার হয় এবং তারা নিজদেরকে এমন এক জাহিলী জীবনদর্শন ও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট সোপর্দ করে যা সাধারণ অবস্থায় পৃথিবীর কোন সভ্য, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জাতি গ্রহণ করতে পারে না।

জার্মানীতে নাৎসীবাদের উত্থান এবং তার উপর আধিপত্যবাদী ও স্বৈরাচারী এবং যুদ্ধাংদেহী ও বিশ্ববিজয়ী ভূতের প্রভাবের সরাসরি ফল হচ্ছে সেইসব লোকের সীমাতিরিক্ত লালসা-বাসনা যারা আজ দাবী করছে, আমরা আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা, এবং জংলী আইনের বিলোপ সাধান করে মূল্যবোধ ও সভ্যতার বিধান কার্যকর করার জন্য অগ্রসর হয়েছি। এই হচ্ছে (بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ যা মানুষের হাত উপার্জন করেছে) আয়াতের ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা এখন আগুন ও রক্ত দিয়ে লেখা হচ্ছে।

এখনও এই দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, তারা নিজেদের লালসা ও কামনা-বাসনার পরিণতি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং তা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে এখন তারা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি কায়েমের জন্য যুদ্ধ করছে। অন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি তো কয়েক বছর ধরে তাদের চোখের সামনেই পদদলিত হচ্ছে। চীন, আবিসিনিয়া, আরবেনিয়া, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া, স্পেন, মেমেল প্রতিটি দেশ তাদের নিষ্পেষণের রক্তে রঞ্জিত। তারপরও উল্লেখিত দেশসমূহের কোথাও ন্যায়বাদিতা ও মানব সভ্যতার সাহায্যকারী শিরা-উপশিরা কেন সঞ্জীবিত হল না? মানুষ কি শুধু পোল্যাণ্ডেই বসবাস করে যে, কেবলমাত্র তাদেরকেই জংলী আইন থেকে উদ্ধারের প্রয়োজন পড়ল এবং কোটি কোটি চৈনিক, আবিসিনীয়, আলবেনীয়, চেক প্রভৃতি জাতি ছিল না যে, তাদের উপর বন্য আইন ঠান্ডা মাথায় কার্যকর হতে দেয়া হল?

পরিষ্কারভাবে কেন বলছেন না যে, আসল ব্যাপার হচ্ছে মহাসাগরের অপর পারে আধিপত্য বিস্তার করা এবং মূলত বিপদ হচ্ছে এই যে, পোল্যান্ড দখল করার পর জার্মানী প্রথমে তার হাত থেকে ১ম মহাযুদ্ধাকালীন সময়ে ছিনিয়ে নেয়া উপনিবেশগুলো দাবী করবে, অতপর পৃথিবীর বিশাল জনবসতিতে যেখানে এখনো নিজের প্রতিপত্তির ঢাক বাজছে এই উদীয়মান শক্তি আপনার প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করবে। অতএব সে এদিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই দোর গোরায় আপনি তার পথরোধ করতে চাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই, মানবতার নিরাপত্তা ও সহযোগিতা তার উদ্দেশ্য নয় যার উপর পূর্ব থেকেই জংলী বিধান বলবৎ হয়েছে এবং দেড় যুগ ধরে তা চলছে।

যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য যখন তাই তখন দুনিয়া যদি এই যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করে যে, একদিকে রয়েছে সত্য এবং অন্যদিকে রয়েছে বাতিল তবে সে বড়ই নির্বোধ বনে যাবে। বাস্তবে উভয় দিকেই রয়েছে বাতিল আর বাতিল। উভয় পক্ষের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্য ও ন্যায়নীতির লেশ মাত্রও নেই। উভয় পক্ষ স্ব-স্ব হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধ করছে। একদল চাচ্ছে যে, যাদের উপর আমি বন্য আইন কার্যকর করেছি এখন অপর কেউ যেন তার উপর এই আইন প্রয়োগের সুযোগ না পায়। দ্বিতীয় পক্ষ চাচ্ছে যে, এই আইন যেখানে আগে থেকেই বলবৎ আছে সেখানে আরেকবার তা বলবৎ হোক। এই অবস্থায় ধোঁকায় নিমজ্জিত কোন ব্যক্তি যদি কোন এক পক্ষকে

সৎপন্থী মনে করে তবে আল্লাহ যেন তার বুদ্ধিবিবেকের প্রতি করুণা করেন। আর ধোঁকায় নিমজ্জিত কোন ব্যক্তি যদি বাস্তব ঘটনা জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও নিজের নাপাক উদ্দেশ্যের উপর সত্যপ্রীতির চোখ ধাঁধানো পর্দা ছেড়ে দেয় তবে আল্লাহ তার পর্দা উন্মোচন করুন।

এই আজব দুনিয়ায় এর চেয়ে আজব ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, দেড় যুগ ধরে যেখানে বর্বর আইন বলবৎ রয়েছে এবং যেসব লোকের সাথে বুদ্ধি ও যুক্তি–প্রমাণের পরিবর্তে সর্বদা পাশবিক শক্তির জোরে বিরোধসমূহের মীমাংসা করা হচ্ছে–সেখানে ঠিক সেই লোকদেরই বলা হচ্ছেঃ আমরা এই বর্বর আইন ও পাশবিক কর্মপন্থার বিলোপ সাধন করতে যাচ্ছি, এসো আমাদের সাহায্য কর। যেসব লোক স্বয়ং মানবীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং শক্তির রাজত্বের কাছে পরাভূত তাদের ডেকে বলা হচ্ছে–মানবীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য এবং "জোর যার মুল্লুক তার" রাজত্বের কোরবানী কর। আবার তাদেরকে নির্বোধ সাজিয়ে বলা হচ্ছেঃ "এই উন্নত পর্যায়ের নীতিমালা (যার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি) হিন্দুস্তানের চেয়ে দুনিয়ার আর কোথাও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না, এবং হিন্দুস্তানের চেয়ে অধিক কেউ তার সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়নি এবং আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, এই সময় যখন এমন সবকিছু বিপদের আশংকার মধ্যে রয়েছে যা মানব সভ্যতার জন্য খুবই মূল্যবান, হিন্দুস্তান তখন জোর যার মুল্লুক তার রাজত্বের বিপরীতে মানবীয় স্বাধীনতার সাহায্যের জন্য নিজের শক্তি ব্যয় করবে এবং এই মর্যাদাপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করবে যা দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গ ও ঐতিহাসিক সভ্যতার মধ্যে সে লাভ করেছে।"

কত সুন্দর বাণী! এর প্রতিটি শব্দ "নৈতিক প্রগলভতার" কারুকার্যময় দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হওয়ার যোগ্য!

ঠিক যে সময় হিন্দুস্তানকে এই পয়গাম দেয়া হচ্ছে ভারতের কমান্ডার ইন চীফ সাহেব চিটফিল্ড রিপোর্টের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, হিন্দুস্তানের সীমানা একদিকে মালয় ও সিংগাপুর, অন্যদিকে মিসর, এডেন ও পারস্য উপসাগর। এসব রাজ্য যদি ভারতের বন্ধুদের মালিকানায় থাকে তবে বুঝে নাও যে, এই দেশের বুকের উপর দুই দিক থেকে পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষার এই দৃষ্টিভংগী যে, এক দেশের প্রাকৃতিক সীমারেখা থেকে কয়েক হাজার মাইল সামনে তার রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক সীমা নির্ধারণ করা হবে এবং এসম্পর্কে নিশ্চিত করার জন্য বলা হবে যে, এ সীমারেখা এই দেশের বন্ধুদের কব্জায় থাকবে, হয় সরাসরি তা কব্জা করা হবে অথবা তাদের সরকারকে নিজ প্রভাবাধীনে আনতে হবে– এটাই হচ্ছে স্বৈরাচার ও আধিপত্যের প্রাণ, এটাই হচ্ছে বিষের পুটলি, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের ভিত্তি। এর দ্বারা সেইসব স্বার্থ ও কার্যক্রম শেষ হওয়ার কোন ধারা সৃষ্টি হতে পারে না যার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজ সীমানা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে, এমনকি গোটা পৃথিবী যতক্ষণ পর্যন্ত তার 'মিত্রদের'' হাতে দেখতে না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ যেসব এলাকা সে নিজের সীমান্ত বলে দাবী করে তার প্রতিরক্ষার জন্য হাজার হাজার মাইল সামনে এক নতুন সীমান্ত নির্ধারিত হয় এবং সে আবার নিজের হেফাজতের দাবী করে যার জন্য পুনরায় সীমান্তরেখা আবার হাজার হাজার মাইল সামনে চলে যায়।

এই আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভংগী সেই সময়ও এসব লোকের মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছিল যখন তারা পৃথিবীবাসীকে নিশ্চয়তা প্রদান করছিল যে, আমরা এক যুদ্ধাংদেহী মানবশত্রুর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে যাচ্ছি। অতপর এই বিষয়ে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকতে পারে যে, তাদের ও তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে নৈতিক দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। মানবতার জন্য উভয়ের মধ্যে এক দলকে বেছে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। উভয়ের দৃষ্টিভংগী এবং মূলনীতি এক, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক এবং কর্মপন্থাও এক। অতএব শেষ পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

যেসব লোকের নিজস্ব কোন মূলনীতি নেই, বরং অবস্থাভেদে ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবসা করে তাদের পথ তো অন্ধকারে রয়েছে এবং তারা সেই রাস্তায় হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে চলবে। কিন্তু মুসলমানদের রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। আর মুসলমান হওয়ার অর্থই হচ্ছেঃ সে নিজের জীবনের জন্য একই নীতি, একই ব্যবস্থা, একই আইন অনুসরণ করে। পৃথিবীতে যাই হোক না কেন–মুসলমানদের কাজ হচ্ছে নিজের মূলনীতির অনুসরণ। তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ ঐসব লোকের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া যারা ইসলামের নীতিমালা থেকে বিচ্যুত। একটি মৌলিক ও নীতিগত কথা যা

কুরআন মজীদ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা এই যে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন"– (সূরা তওবাঃ ১১১)।

অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথেই আল্লাহ্র হাতে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন সে নিজের জানমালের মালিক নয় যে, যেখানে ইচ্ছা এই বিক্রিত জিনিস পুনরায় বিক্রি করবে অথবা তা ধ্বংস করবে। তার জানমাল খোদার মালিকানাধীন এবং সে তাঁর পক্ষ থেকে এর আমানতদার। আল্লাহ্র পথে তাঁর নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী এই আমানতকে কোরবানী করে দেয়া তো তার নৈতিক দায়িত্ব। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের যে লেনদেন সে পূর্বে করেছে তার দাবী এই যে, এই পণ্য আজ যে ক্রেতার সম্পদ তাতে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হবে। কিন্তু সে যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট তা বিক্রি করে তবে সে যেন বিক্রিত দ্রব্য পুনরায় বিক্রি করছে যা চরম অন্যায়। আর যদি নিজ ইচ্ছামত তা কোথাও ধ্বংস করে তবে সে আত্মসাতের অপরাধে অপরাধী।

মুসলমানগণ আল্লাহ্র সাথে যে পণ্য বিনিময় করেছে এবং যে বিনিময়ের কারণে তারা মুসলমান হয়েছে তার আলোকে মুসলমানের দায়িত্ব এই যে, জীবন দেয়া ও জীবন নেয়ার বেলায় সে খোদার বিধানের আনুগত্য করবে। আর আল্লাহ্র বিধান এই যে–

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"তোমরা প্রাণ হত্যার অপরাধ কর না যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন– যথার্থ কারণ ব্যতীত" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩২)।

ঈমানদার সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাই কুরআন মজীদে এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ـ

'যারা আল্লাহ্র হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণ ধ্বংস করে না–"

(ফুরকানঃ ৬৮)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'প্রাণ' বলতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ প্রাণও বুঝায় এবং অপরাপর লোকের প্রাণও। অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে না নিজের জান দেবে, না অপর কারো জান হরণ করবে।

পুনরায় "যথার্থ কারণ"-এর ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়"- (সূরা বাকারাঃ ১৯৩)।

অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো বন্দেগী ও আনুগত্য করা এবং অপর কারো আইন কার্যকর থাকা-এসবই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত এবং এই ফিতনার মূলোৎপাটন করা সেই যথার্থ কারণ যার জন্য মুসলমানকে মানব প্রাণের মত সম্মানিত ও মূল্যবান বস্তু ধ্বংস করার মত কাজ করতে হবে। কেননা পৃতিবীতে ফিতনা ও বিশৃংখলা বিরাজিত থাকা হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট।

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিতনা হত্যার তুলনায়ও গুরুতর"- (সূরা বাকারাঃ ১৯১)।

এই অর্থই কুরআন মজীদে অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

"যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে" (সূরা নিসাঃ ৭৬)।

এ হচ্ছে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য। মুসলমানগণ আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করবে। অর্থাৎ আল্লাহর সেই বিধান মানব জীবনের উপর রাজত্ব করবে যা তিনি নবীগণের মাধ্যমে মানবীয় আচার- ব্যবহারে ন্যায় ইনসাফ কায়েম করার জন্য প্রেরণ করেন। পক্ষান্তরে কাফেরের কাজ হচ্ছে- সে তাগূত অর্থাৎ বিদ্রোহ, জুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি এবং বৈধ সীমা লংঘনকারীদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ করছে। হাদীসে এসেছে ঃ

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله -

"এক ব্যক্তি মহানবী (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলঃ এক ব্যক্তি যুদ্ধলব্দ মাল অর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এবং আরেক ব্যক্তি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে কার যুদ্ধ আল্লাহ্র পথে? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে–ই আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে।"

অপর হাদীসে এসেছেঃ

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ما القتال فى سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا و يقاتل حمية؟ فرفع اليه راسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله-

"এক ব্যক্তি মহানবী (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র পথের যুদ্ধ কোনটি? কারণ আমাদের মধ্যে কতেকে প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে যুদ্ধ করে এবং কতেকে জাতীয় আবেগে যুদ্ধ করে। মহানবী (স) মাথা উত্তোলন করে বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য যুদ্ধ করে এবং কতিপয় লোক অপর লোকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধ করে– তাদের সম্পর্কে রসূলে খোদা (স) বলেনঃ

يجئ الرجل اخذا بيد الرجل فيقول ان هذا قتلنى فيقول الله لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول انها ليست لفلان فيبوء باثمه -

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে আল্লাহ্‌র নিকট আরজ করবে– সে আমাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করবেনঃ তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ? সে বলবে, অমুক ব্যক্তির সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী তো সে ছিল না। অতপর নিহত ব্যক্তির পাপগুলো হত্যাকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"

এসব শিক্ষাই পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। যা কিছু হচ্ছে– ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এসবই ফিতনা, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা। মুসলমানরা যদি যুদ্ধ করতে পারে তবে এই ফিতনাকে সামগ্রিকভাবে মূল্যোৎপাটিত করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার জন্যই লড়তে পারে। কোন দিক থেকে ফিতনাফাসাদে অংশগ্রহণ করা এবং কুফরের পতাকাতলে কুফরী মতবাদ প্রচারের জন্য সংগ্রাম করা মুসলমানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি তদ্রুপ করতে চায় তার জন্য এটাই উত্তম যে, সে মুসলিম নামটি পরিবর্তন করে প্রকাশ্যে তাদের সাথে মিলিত হোক যার প্রচার সে করতে চায়।

তরজমানুল কুরআন
জুমাদাল উলা, ১৩৭৬ হি./ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ খৃ.।

মুসলিম জাহানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি

সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে হজ্জের বিশ্ব সম্মেলনে আজ আমি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক সত্যানুসারী মুমিনদের সম্বোধন করার এবং সত্যাশ্রয়ী মুমিনদের বিশেষ করে তাদের শিক্ষিত যুব সমাজের আসল কর্তব্য বিবৃত করার সুযোগ পেয়েছি। আমি এই মহামূল্যবান সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। এই ধরনের সুযোগ হয়তো আমার জীবনে আর নাও পেতে পারি–এ কথা মনে রেখে আমি হৃদয় উজার করে আমার সমস্ত বক্তব্য আপনাদের সামনে রেখে যেতে চাই। এর ফলে বর্তমান অবস্থার সঠিক চিত্র আপনাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এ অবস্থা সৃষ্টির যথার্থ কারণ আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন এবং এর সংশোধনের জন্য আমার মতে যথার্থ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে যেসব কর্মকৌশল ও উপায়–উপকরণ অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন তা আপনারা অবলম্বন করতে পারবেন। কাজেই যারা উপস্থিত আছেন তারা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌছাবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

ইসলামী বিশ্বের দুটি অংশ

সর্বপ্রথম এ সত্যটি অনুধাবন করতে হবে যে, বর্তমান ইসলামী বিশ্ব দুটি বড় বড় অংশে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এর একটি অংশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং সেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে সংখ্যাগুরুদের হাতে। আর দ্বিতীয় অংশটিতে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আসনেও তারাই সমাসীন। এ দুটি অংশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় অংশটিই বেশী গুরুত্বের অধিকারী। মিল্লাতে ইসলামিয়ার ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করছে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির গৃহীত দৃষ্টিভংগী ও পদক্ষেপের উপর। অবশ্যি প্রথম অংশটির গুরুত্বও কম নয়। প্রথম অংশটিও নিজের জায়গায় বিপুল গুরুত্বের অধিকারী। কারণ দুনিয়ার সব অংশে ও সব অঞ্চলে একটি জীবন–দর্শন; আকীদা–বিশ্বাস ও মতাদর্শের পূর্ব থেকেই সামান্য সংখ্যক নয়, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অনুসারী থাকা ঐ মতাদর্শ ও

মক্কা মুআযযমার মসজিদে দেহলবীতে ১৩৮২ হিজরীর ১৬ যিলহজ্জ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) আরবী ভাষায় এ বক্তৃতাটি প্রদান করেন। এ মজলিসে বিশেষ করে আরব দেশগুলোর যুব সমাজের বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল।

আকীদা-বিশ্বাসের ধারক ও বাহকদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু উল্লেখিত মতাদর্শটি যদি তার নিজের ঘরেই পরাজয় বরণ করে, তাহলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা তার এই অনুসারীরা, যারা আগে থেকেই ছিল সর্বত্র পরাজিত, এরপর আর নিজেদের জায়গায় বেশীক্ষণ টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। তাই এ কথাটি এখন একটা নির্জলা সত্যে পরিণত হয়েছে যে, আপাত দৃষ্টিতে বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে মরক্কো-নাইজেরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপরই ইসলামী দুনিয়ার ভবিষ্যত নির্ভর করছে, বাইরের কার্যকারণ দেখে আমরা যা কিছু আন্দাজ অনুমান করতে পারি না। আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমাত যদি তেমন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেয় তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তিনি চাইলে পাষাণের বুক চিরে ঝরণাধারা প্রবাহিত করতে পারেন। তার একটি মাত্র ইশারায় বিশাল মরুভূমি সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হতে পারে।

স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা

ইসলামী বিশ্বের ভবিষ্যত মুসলিম দেশগুলোর উপর নির্ভর করছে- এ সিদ্ধান্তটির উপর ভিত্তি করে এখন মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং তাদের সেই অবস্থার কারণগুলো বিশ্লেষণ করা যাক।

আপনারা জানেন, সুদীর্ঘকাল চিন্তার স্থবিরতা, বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা, অবনতি, নৈতিক অবক্ষয়, বস্তুগত পশ্চাদপদতার মধ্যে অবস্থান করার পর অধিকাংশ মুসলিম দেশ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল। ঈসায়ী আঠারো শতক থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়েছিল এবং বর্তমান শতকের সূচনা পর্বেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এ সময় মাত্র হাতে গোনা দু-চারটি মুসলিম দেশ সরাসরি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক গোলামী থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিল। কিন্তু অনবরত পরাজয় বরণ করার কারণে তাদের অবস্থা পরাধীন দেশগুলোর চাইতেও খারাপ হয়ে পড়েছিল। আর যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল অন্যদের চাইতে এই তথাকথিত স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর ভীতি ও পরাজিত মনোভাব অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ফসল

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের সবচাইতে ধ্বংসকর যে ফসলটি আমরা লাভ করেছি সেটি হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয় ও নৈতিক

বিকৃতি। এই সাম্রাজ্যবাদীরা যদি আমাদের ধন-সম্পদ লুট করে আমাদের ফতুর করে দিত এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আমাদের বংশ ধ্বংস করে দিত, তাহলেও বুঝি আমাদের ততোটা সর্বনাশ হতো না, যতোটা তারা নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিক বিষ ছড়িয়ে আমাদের সর্বনাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। যেসব মুসলিম দেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, সেসব দেশে তারা সবাই একটি সম্মিলিত নীতির মাধ্যমে আমাদের স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা খতম করে দিয়েছে। আর যেখানে পুরোপুরি খতম করতে পারেনি সেখানে অন্তত ঐ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীনে শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য সমাজ জীবনে কোন কর্মক্ষেত্র না রাখার ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে তারা বিজিত জাতিগুলির নিজেদের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা হিসেবে কায়েম রাখতে দেয়নি। এটাও ছিল তাদের নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। বরং এর পরিবর্তে তারা বিজয়ী ও শাসক জাতির ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করে এবং তাকেই সরকারী ভাষা গণ্য করে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয় নির্বিশেষে সকল পাশ্চাত্য বিজয়ী জাতি একযোগে এ নীতি অবলম্বন করে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়, যারা একদিকে ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইসলামী আকীদা পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখ এবং অন্যদিকে তাদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-ভাবধারা ও দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়ে উঠে। অতঃপর এই শ্রেণীর পর অনবরত এমন সব শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকে যারা ইসলাম থেকে আরো বেশী দূরে সরে যায় এবং পাশ্চাত্য জীবন দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনেক বেশী ডুবে যেতে থাকে। নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলা তাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর এবং বিজয়ী শাসকদের ভাষায় কথা বলা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়। পশ্চিমা শাসক সমাজ খৃষ্টবাদের ব্যাপারে যতই গোঁড়ামির পরিচয় দিক না কেন আমাদের এই ফিরিংগী পরস্ত গোলামদের নিজেদের মুসলমানিত্বের জন্য লজ্জাবোধ জেগে উঠে। এজন্যে তারা সগর্বে নিজেদের ইসলামদ্রোহিতার ঘোষণা দেয়। পাশ্চাত্য শাসকরা তাদের সাবেকী আমলের বস্তাপচা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যতই সম্মান প্রদর্শন করুক না কেন, আমাদের এই গোলাম শ্রেণী নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করাকেই নিজেদের মর্যাদা লাভের উপায় মনে করতে থাকে। পশ্চিমা

শাসকরা দীর্ঘকাল মুসলিম দেশে অবস্থান করার পরও কোনো দিন মুসলমানদের লেবাস-পোশাক ও জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন করেনি। কিন্তু এই গোলামের দল নিজেদের দেশে অবস্থান করেও ঐ বিজয়ী শাসকদের লেবাস-পোশাক, তাদের সামাজিক পদ্ধতি, তাদের পানাহারের রীতিনীতি, তাদের সাংস্কৃতিক রীতি-পদ্ধতি এমনকি তাদের উঠাবসা, চলাফেরা ও নড়াচড়া করার প্রত্যেকটি কায়দা-কানুন নকল করতে থাকে এবং এর মোকাবিলায় নিজের জাতির প্রত্যেকটি জিনিসই তাদের কাছে তুচ্ছ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এরপর পশ্চিমা শাসকদের অনুকরণে এরা বস্তুবাদিতা, নাস্তিক্যবাদ, জাহিলিয়াত পরস্তি, জাতীয়তাবাদ, চারিত্রিক নৈরাজ্য এবং নৈতিক চরিত্রহীনতার বিষ আকণ্ঠ পান করে বসে। তাদের মন-মগজে এ কথা বসে যায় যে, পশ্চিম থেকে যা কিছু আসে তা পুরোপুরি সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়াই হচ্ছে প্রগতি এবং তাকে গ্রহণ না করা রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদপদতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের স্থায়ী নীতি হিসাবে এটা স্বীকৃত হয়েছিল যে, যারা তাদের রঙে যত বেশী রঞ্জিত হবে এবং ইসলামী প্রভাব থেকে যত বেশী মুক্ত হবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের ততো বেশী উন্নত মর্যাদা দান করা হবে। এই নীতির অনিবার্য ফল স্বরূপ দেশের শাসন কর্তৃত্বের উচ্চতম আসন তাদেরই দখলে চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান সামরিক ও বেসামরিক পদে এরাই নিযুক্ত হয়। রাজনীতিতে এরাই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন লাভ করে। এরাই হয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর নেতা। এরাই পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে প্রবেশ করে। মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক জীবনে এরাই ছেয়ে যায়।

এরপর মুসলিম দেশগুলোয় যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হতে থাকে তখন সেগুলোর নেতৃত্বও অনিবার্যভাবে এইসব লোকের হাতে এসে পড়ে। কারণ এরাই শাসকদের ভাষায় কথা বলতে পারতো। এরাই তাদের মেজাজ-স্বভাব-প্রকৃতি জানতো আর এরাই ছিল তাদের সবচেয়ে কাছের লোক। অনুরূপভাবে যখন এই দেশগুলো আজাদি লাভ করতে থাকে, আজাদি লাভের পর কর্তৃত্বও এদেরই হাতে চলে আসে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের খেলাফত এরাই লাভ করে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের আওতাধীনে এরাই লাভ করেছিল রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি। এরাই পরিচালনা করেছিল বেসামরিক সরকার এবং সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বেও এরাই ছিল আসীন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শুরু থেকে শেষ এবং আজাদির সূচনাকাল পর্যন্তকার ইতিহাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক দৃষ্টির সামনে রাখা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। কেননা এগুলো বাদ দিয়ে বর্তমান অবস্থার যথার্থ চিত্র অনুধাবন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

এক, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে কোন এক স্থানেও সাধারণ মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি। নিসন্দেহে তারা জাহিলিয়াতের প্রসার ঘটিয়েছে, মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেক চারিত্রিক বিকৃতিরও জন্ম দিয়েছে এবং ইসলামী আইন-কানুনের পরিবর্তে নিজেদের আইন জারি করে মুসলমানদের অমুসলিমের জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও দুনিয়ার কোন দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী একটি জনগোষ্ঠী হিসাবে তাদের প্রভাবাধীনে বসবাস করেও ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হতে পারেনি। বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে সাধারণ মুসলমানরা ঠিক তেমনি ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গেছে যেমনি এর আগে ছিল। তারা হয়তো ইসলামকে জানে না কিন্তু তাকে মেনে চলে, তার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত এবং ইসলাম ছাড়া আর কোন কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয়। তাদের নৈতিক চরিত্র মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়ে গেছে এবং তাদের আচার-আচরণ-অভ্যাস একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এরপরেও তাদের মূল্যমান ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়নি এবং তাদের মানদণ্ডসমূহ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রয়ে গেছে। তারা সূদ, যেনা ও মদ্যপানে আসক্ত হতে পারে এবং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফিরিংগী সভ্যতার পূজারী ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একজনও এমন পাওয়া যাবে না যে ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করে না। তারা নাচ, গান ও অন্যান্য নৈতিকতা বিগর্হিত কাজের মজা ত্যাগ করতে হয়তো পারছে না কিন্তু ক্ষুদ্র একটি পাশ্চাত্য পূজারী দল ছাড়া সাধারণ মুসলমানরা কোনক্রমেই একে যথার্থ সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য আইনের আওতায় জীবন যাপন করছে তারা কয়েক পুরুষ কিন্তু এ আইনটি যথার্থ সত্য এবং ইসলামের আইন বাসি হয়ে গেছে- এরূপ ধারণা তাদের মগজে ঢুকানো আজো কোনোক্রমেই সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্যবাদী ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু শ্রেণীটি যতই পশ্চিমা আইনের প্রতি আস্থাশীল থাকুক না কেন সাধারণ

মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ চিরকালের ন্যায় আজও একমাত্র ইসলামের আইনকেই সত্য বলে মনে করে এবং তার প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তন চায়।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, উলামায়ে দীন সর্বত্র জনগণের নিকটে অবস্থান করছেন। কারণ তারা জনগণের ভাষায় কথা বলেন এবং জনগণের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে। তাছাড়া দীর্ঘকাল থেকে পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন থাকার কারণে মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার এবং শাসন কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে কোনো দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচলনা করার যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলেছেন। এ কারণে কোন একটি মুসলিম দেশেও তারা আজাদি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। কোথাও আজাদি লাভের পর শাসন কর্তৃত্বে তাদের শামিল করা হয়নি। আমাদের সামাজিক জীবনাগনে দীর্ঘকাল থেকে তারা কেবল এমন এক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন যাকে মোটরের ব্রেকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যবাদী শ্রেণী হচ্ছে ড্রাইভার আর এই উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন গাড়ির ব্রেক। এই ব্রেক গাড়ির গতির দ্রুততাকে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিহত করে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো কোনো দেশে এই ব্রেক ভেঙে গেছে এবং গাড়ি অতি দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অবশ্য গাড়ির পরিচালকরা এই সুধারণা করে চলছে যে, তাদের গাড়ি উপরের দিকে উঠছে।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে, দুনিয়ার যেখানেই আজাদি আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্যবাদী লোকেরা আসীন থাকলেও কোথাও ধর্মীয় আবেদন ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের নাড়া দেয়া যায়নি এবং তাদের ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করাও সম্ভব হয়নি। সকল দেশেই ইসলামের নামে তাদের জনগণকে আহবান করতে হয়েছে। সব জায়গায় আল্লাহ, রসূল ও কুরআনের নামে তাদের আবেদন করতে হয়েছে। সর্বত্রই আজাদি আন্দোলনকে তাদের ইসলাম ও কুফরের লড়াই গণ্য করতে হয়েছে। এসব ছাড়া কোথাও নিজেদের জাতিকে তারা নিজেদের পেছনে এনে দাঁড় করাতে পারেনি। এখন বিশ্ব ইতিহাসের সবচাইতে বড় ও নজীরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বত্র আজাদি হাসিলের পরপরই এই জাতীয় নেতারা নিজেদের সমস্ত ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের প্রথম শিকার হয়েছে সেই ইসলাম যার সাহায্যে তারা আজাদির লড়াইয়ে জয়লাভ করেছিল।

চতুর্থ ও সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কথাটি হচ্ছে এই যে, এইসব লোকের নেতৃত্বে মুসলিম দেশগুলো কেবলমাত্র রাজনৈতিক আজাদি লাভ করেছে। পূর্বের গোলামী ও বর্তমানের আজাদির মধ্যে তফাত কেবল এতটুকুই যে, পূর্বে শাসন কর্তৃত্ব ছিল বাইরের লোকদের হাতে আর বর্তমানে তা চলে এসেছে ঘরের লোকদের হাতে। কিন্তু যে ধরনের মনমানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা যেসব মতাদর্শ ও নীতি নিয়মের সাহায্যে পূর্বে শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছিল সেই ধরনের মানসিকতার অধিকারী লোকেরা সেই একই ধরনের মতাদর্শের সহায়তায় এখনো শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে– এ দৃষ্টিতে দেখলে কোনো পার্থক্যই হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তা এখনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত রয়েছে, তাদের প্রবর্তিত আইন এখনো প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের নির্ধারিত পথে পরবর্তী আইন প্রণয়নের কাজও চলছে। বরং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো মুসলমানদের ব্যক্তি সংক্রান্ত আইনের (Personal Law) হস্তক্ষেপ করার সাহস করেনি, কিন্তু স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় আজ তা করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্পর্কিত যেসব মতবাদ ও আদর্শ দিয়ে গেছে তার মধ্যে তাদের চাইতেও বেশী করে ডুবিয়ে দেবার এবং ঐ মতাদর্শগুলো অনুযায়ী জাতীয় জীবনকে বিকৃত করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী মতবাদ ছাড়া সমাজ জীবনের অন্য কোনো নকশা তারা কল্পনাই করতে পারে না। ঐ নকশা অনুযায়ী তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে। এ কারণেই বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছে। তাদের মন মস্তিষ্কে নাস্তিক্যবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যেখানেই তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম সেখানেই মুসলিম যুব কিশোর সমাজকে এতদূর নষ্ট করে ফেলেছে যার ফলে তারা আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি বিদ্রুপ বাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করেছে। ধর্মহীনতার মধ্যে তারা নিজেরা ডুবে গেছে এবং তাদের নেতৃত্ব সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে দীন ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে চলছে। সত্য বলতে কি এরা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যতই দুশমন হোক না কেন–পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে তাদের কাছে বেশী প্রিয়। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যেকটা কাজের প্রশংসায় এরা পঞ্চমুখ। তাদের প্রত্যেকটা কথাকে এরা সত্যের মানদন্ড মনে করে। এরা তাদের প্রত্যেকটা কাজের অনুকরণ করে। তাদের ও এদের মধ্যে শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, তারা হচ্ছে

মুজতাহিদ আর এরা হচ্ছে নিছক অন্ধ মুকাল্লিদ তথা অন্ধ অনুসরণকারী। তাদের বাঁধানো পথ থেকে এক ইঞ্চি সরে গিয়ে নতুন কোনো পথ তৈরী করার ক্ষমতা এদের নেই।

এই চারটি সুস্পষ্ট সত্যের ভিত্তিতে এখন দুনিয়ার স্বাধীন মুসলিম জাতিগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বর্তমানের সমগ্র পরিস্থিতি আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। কারণ সর্বত্র তারা নিজেদের জাতির বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের জাতিরা ইসলামের দিকে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু এরা জোরপূর্বক তাদের পাশ্চাত্যবাদীতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে কোথাও মুসলিম জাতির হৃদয় নিজ সরকারের সহযোগী নয়। সরকার তখনই মজবুত হয় যখন সরকার পরিচালনাকারীদের হাত এবং জাতির হৃদয় পরিপূর্ণ ঐক্যের ভিত্তিতে একযোগে জাতীয় বিনির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। বিপরিতপক্ষে যেখানে হৃদয় ও হাত পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকে সেখানে পারস্পরিক যুদ্ধে সর্বশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতির পথে এক ইঞ্চিও অগ্রগতি হয় না।

শাসক ও জনতার সংঘাতের পরিণাম

এই পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মুসলিম দেশগুলোয় একের পর এক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। পাশ্চাত্যবাদী ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু শ্রেণীটি, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের খেলাফত লাভ করেছে, তারা একথা ভালভাবেই জানে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি জনগণের ভোটের উপর নির্ভর করে, তাহলে দেশের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাতে থাকতে পারবে না, বরং দ্রুত হোক বা ধীরে ধীরে তা অনিবার্যভাবে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে এমন সব লোকদের হাতে যারা জনগণের আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাংখা ও ঈমান-আকীদা অনুযায়ী দেশ চালাতে সক্ষম। তাই কোথাও তারা গণতন্ত্রকে সাফল্যের সাথে টিকে থাকতে দিচ্ছে না এবং সর্বত্র একনায়কত্ববাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। তবে ধোঁকা দেবার জন্য তারা একনায়কত্ববাদে গণতন্ত্রের নামাংকিত করেছে।

শুরুতে কিছু দিন নেতৃত্ব এই দলের রাজনৈতিক নেতাদের হাতে থাকে এবং বেসামরিক কর্মচারীরা মুসলিম দেশগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে মুসলিম দেশগুলোর

সেনাবাহিনীতে শীঘ্রই এ অনুভূতি জন্মলাভ করে যে, একনায়কত্ব তো আসলে তাদের শক্তির ওপরই নির্ভর করছে। এ অনুভূতি সামরিক অফিসারদের অতি দ্রুত রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনে এবং তারা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের আসন উলটিয়ে দিয়ে নিজেদের একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে শুরু করে। এখন মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের সেনাবাহিনী একটি আপদে পরিণত হয়েছে। বাইরের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করা এখন আর তাদের কাজ নয়। বরং এখন তাদের কাজ হচ্ছে নিজেদের দেশের লোকদের জয় করা এবং জনগণ নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের হাতে যে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল তার সাহায্যে তাদের নিজেদের গোলামে পরিণত করা। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোর ভাগ্যের ফয়সালা পার্লামেন্টে নয়, সেনাবাহিনীর ব্যারাকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আবার এই সৈন্যরাও কোনো একটি নেতৃত্বের উপর একমত নয়। বরং প্রত্যেক সামরিক অফিসার নতুন কোন চক্রান্ত করে অন্যদের হত্যা করে নিজে তার জায়গায় ক্ষমতা দখলের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তাদের প্রত্যেকেই আসার সময় বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে আসে এবং আত্মসাতকারী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিদায় নেয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বেশীর ভাগ মুসলিম জাতি এখন নিছক দর্শকের ভূমিকায় অবস্থান করছে। তাদের বিষয়াবলী চালাবার ব্যাপারে এখন আর তাদের মতামত ও সন্তোষ-অসন্তোষের কোনো তোয়াক্কা নেই। তাদের অজান্তেই অন্ধকারে বিপ্লবের মালমসল্লা তৈরী হয়ে যায় এবং কোনো একদিন হঠাৎ তাদের মাথার ওপর সেগুলো ঢেলে দেয়া হয়। তবে একটি ব্যাপারে এইসব পরস্পর সংঘর্ষরত বিপ্লবী নেতারা একমত এবং সেটি হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য থেকে যে-ই সামনে আসে সে-ই পূর্ববর্তীর ন্যায় পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব এবং ধর্মহীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ধারক-বাহক হয়।

আশার আলো

এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি সত্য আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। একটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এই ধর্মহীন ও অশ্লীলতার ধারক-বাহকদের পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিয়েছেন এবং তারা একজন অন্য জনের শিকড় কাটছে। খোদা না খাস্তা তারা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ভয়াবহ বিপদ দেখা দিত। কিন্তু তাদের পথপ্রদর্শক হচ্ছে শয়তান। আর শয়তানের চাল হয় সব সময় দুর্বল। এই সংগে দ্বিতীয় যে

গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি আমি দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, মুসলিম মিল্লাতের হৃদয় সর্বত্র সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়ে গেছে। তারা ঐসব তথাকথিত বিপ্লবী নেতাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সৎ ব্যক্তিদের কোনো একটি দল যদি চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলমান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা সম্পন হয়-তাহলে পরিশেষে তারাই বিজয়ী হবে এবং মুসলিম জাতিসমূহ এই বেদীন ও ফাসেক নেতৃত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে-এর পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

কাজের আসল সুযোগ ও কাজের পদ্ধতি

এ সময় কাজের আসল সুযোগ রয়েছে তাদের যারা একদিকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অন্যদিকে নিজেদের দিলে আল্লাহ, রসূল, কুরআন ও আখেরাতের প্রতি ঈমান সংরক্ষিত রেখেছেন। প্রাচীন পদ্ধতিতে দীনী শিক্ষা লাভকারী লোকেরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এবং ইলমে দীনের ব্যাপারে তাদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী হতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নেতৃত্ব দান এবং কার্য পরিচালনার জন্য যে ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন তা তাদের নেই। এ যোগ্যতাগুলো বর্তমানে কেবলমাত্র প্রথমোক্ত দলটির মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই বর্তমানে এ দলটির অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করার অধিক প্রয়োজন রয়েছে। তাদের প্রতি আমার পরামর্শ নিম্নরূপঃ

একঃ ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান লাভ

তাদের ইসলামের নির্ভুল ও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। এভাবে তাদের অন্তর যেমন মুসলমান তেমনি মস্তিষ্কও মুসলমান হয়ে যাবে এবং সামষ্টিক বিষয়াদি ইসলামের মূলনীতি ও বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করার যোগ্যতা তারা অর্জন করবে।

দুইঃ নিজেদের নৈতিক সংশোধন

তাদের নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। এভাবে তাদের নৈতিক জীবনধারা কার্যত সেই ইসলামের অনুগামী হবে যাকে তারা আকীদাগতভাবে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। মনে রাখবেন, কথা ও কাজের বৈপরীত্য মানুষের মধ্যে মোনাফেকী প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং বাইরের জগতে তার প্রতি আস্থা খতম হয়ে যায়। আপনার সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে আন্তরিকতা, সততা ও সত্যানুসারিতার উপর। আর যে ব্যক্তি বলে

একটা এবং করে অন্যটা সে কখনো আন্তরিক হতে পারে না এবং তাকে আন্তরিক বলে মেনে নেয়াও যেতে পারে না। আপনার নিজের জীবনে বৈপরীত্য থাকলে অন্যরা আপনাকে বিশ্বাস করবে না এবং আপনার নিজের দিলেও নিজের উপর সুদৃঢ় আস্থা সৃষ্টি হতে পারবে না। তাই ইসলামী দাওয়াতের কাজে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশঃ যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন যে, ইসলাম এর এই হুকুম দিয়েছে সেগুলো করে যান আর যেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন যে, ইসলাম এগুলো নিষেধ করেছে সেগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

তিনঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের সমালোচনা

তাদের মস্তিষ্কের সমস্ত যোগ্যতা এবং সমগ্র লেখনী ও বাকশক্তিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সমালোচনায় নিয়োজিত করা উচিত। জাহিলিয়াতের এই মূর্তিটিকে, যাকে আজ সারা দুনিয়া পূজা করছে, ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া উচিৎ। এর মোকাবিলায় এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি, মৌল বিষয়াদি ও জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের ব্যাখ্যা প্রদান ও সেগুলি পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যাতে নতুন বংশধরদের মনে সেগুলির নির্ভুলতার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং তাদের মনে এই আস্থার সৃষ্টি হয় যে, আধুনিক যুগে একটি জাতি ঐ আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও আইন-কানুন গ্রহণ করে কেবল উন্নতিই করতে সক্ষম তাই নয়, বরং অন্যের চাইতে অগ্রসর হতেও পুরোপুরি সক্ষম। এ কাজটি যত নির্ভুল পদ্ধতিতে এবং যত ব্যাপক পর্যায়ে হতে থাকবে ততই ইসলামী দাওয়াতের জন্য আপনারা সৈনিক দল লাভ করতে থাকবেন। জীবনের সব বিভাগ থেকে সৈনিকরা বের হয়ে আসতে থাকবে। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এ কাজটির সিলসিলা জারী থাকা উচিত। তাহলে একটি দেশের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করার মতো বিপুল সংখ্যক লোক গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। এ ধারাবাহিক কাজটি ক্রমান্বয়ে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কোনো ইসলামী বিপ্লব সাধনের আশা করতে পারেন না। আর যদি কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে এই বিপ্লব সাধিত হয়ে যায় তবে তা মজবুত ও স্থিতিশীল হতে পারবেনা।

চারঃ সংগঠন

ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে যত লোক প্রভাবিত হতে থাকবে তাদের সংগঠিত হতে হবে। তাদের কোনো ঢিলেঢালা সংগঠন হলে চলবে না। মজবুত আইন, বিধিবিধান, নিয়ম- শৃংখলা ও আনুগত্য ব্যবস্থা ছাড়া নিছক একদল সমমনা লোকের বিক্ষিপ্ত গ্রুপ সংগ্রহ করলে তেমন কোনো শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না।

পাঁচঃ সাধারণ দাওয়াত

এ উদ্দেশ্যে যারা কাজ করবেন তাদের দাওয়াত সম্প্রসারণ করতে হবে জনগণের মধ্যে, যাতে সাধারণ মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়, তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে এবং ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এই সংগে তাদের জনগণের নৈতিক সংশোধনের জন্যও চেষ্টা করতে হবে। ফাসেক নেতৃত্বের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে যে বেদীনী, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সয়লাব বয়ে চলছে তার প্রতিরোধের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা উচিত। আসলে একটি জাতি ফাসেক হয়ে যাওয়ার পর কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে জীবন যাপন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ফাসেকী যতই বাড়বে তাদের সমাজে ইসলামী জীবন বিধান প্রচলন ততই কঠিন হয়ে পড়বে। মিথ্যুক, আত্মসাতকারী, ঠগ ও অসৎ চরিত্রের লোকেরা কুফরী জীবন ব্যবস্থার জন্য যত বেশী উপযোগী, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য ঠিক ততই অনুপযোগী।

ছয়ঃ ধৈর্য ও প্রজ্ঞা

তাদের অধৈর্য হয়ে কাঁচা ভিত্তির উপর কোনো ইসলামী বিপ্লব করার চেষ্টা না করা উচিত। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য বড়ই ধৈর্যের প্রয়োজন। হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে যাচাই পরখ করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর প্রথম পদক্ষেপের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করার পূর্বে এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, প্রথম পদক্ষেপটি থেকে যে ফল লাভ করা হয়েছিল তা পুরোপুরি স্থিতিশীল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়া করে অগ্রযাত্রা করা হলে তা লাভের পরিবর্তে ক্ষতি ও বিপদ ডেকে আনবে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফাসেক নেতৃত্বের সাথে শরীক হয়ে আশা করা হয় হয়তো এভাবে মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌছে যাবার পথ সহজ হবে, নিজেদের

উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু উপকৃত হওয়া যাবে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, এ ধরনের লোভের ফল ভালো হতে পারে না। কারণ প্রশাসন ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে আসলে তারা নিজেদের নীতি অনুযায়ী সবকিছু চালায় এবং তাদের সাথে যারা থাকে তাদের প্রতি পদক্ষেপে ওদের সাথে আপোশ করতে হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা ওদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

সাত : সশস্ত্র ও গোপন আন্দোলন থেকে দূরে থাকা

এই প্রসংগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হচ্ছে, গোপন আন্দোলন পরিচালনা ও সশস্ত্র বিপ্লব করার প্রচেষ্টা চালানো থেকে দূরে থাকুন। এটিও আসলে অধৈর্য ও তাড়াহুড়ারই রকমফের মাত্র এবং ফলাফলের দিক থেকে অন্য অবস্থাগুলোর তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। একটি সঠিক বিপ্লব সব সময় গণআন্দোলনের মাধ্যমে সাধিত হয়। প্রকাশ্যে সাধারণভাবে দাওয়াতের কাজ করুন। ব্যাপকভাবে মানুষের মন ও চিন্তাধারার সংশোধন করুন। মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করুন। চারিত্রিক অস্ত্রের সাহায্যে মানুষের হৃদয় জয় করুন। এসব কাজ করতে গিয়ে যত রকম বিপদ-মুসীবত আসে সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করুন। এভাবে ক্রমান্বয়ে যে বিপ্লব সংঘটিত হবে তা এমনি শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে যে, বিরোধী শক্তির ফাঁপা বিরোধিতার তুফান তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। তাড়াহুড়া করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে কোনো বিপ্লব করে ফেললেও যে পথে তা আসবে সে পথেই তাকে নিশ্চিহ্নও করা যাবে।

ইসলামী দাওয়াতের কাজে যারা লিপ্ত আছেন তাদের জন্য এই কয়েকটি কথা আমি উপদেশ হিসেবে পেশ করলাম। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে পথ দেখান এবং তাঁর সত্য দ্বীনের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঠিক পথে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবার সুযোগ আমাদের দান করেন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

(তরজমানুল কুরআন)

সমাপ্ত